শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্‌লার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ

আবদুল কাদের

(১)

ভক্তি ও প্রেমের সাধনায় পৃথিবীতে এই স্বল্প পরিসর বাঙ্‌লার স্থান নিতান্ত অল্প নহে। জ্ঞান ও সভ্যতার মাপ কাঠিতে এই প্রদেশখানির মূল্য বিশ্ব-মানবের কাছে কতখানি নির্দ্ধারিত হইবে জানিনা,—কিন্তু মানব-প্রেমের ও ভগবদ্ প্রেমের আত্ম সমাহিত সাধনায় ইহা যে অনেকটা উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যাইতে পারে। এই ভূখণ্ডখানিতে যুগে যুগে ধর্ম্মমতের পর ধর্ম্ম মত, প্রবর্ত্তকের পর প্রবর্ত্তক, ভক্তমণ্ডলীর পর ভক্তমণ্ডলীর আবির্ভাব ঘটিয়া ইহার অধিবাসীবৃন্দের সুকুমার চিত্তকে প্রেম ও ভক্তির জীয়ান-রসে আপ্লুত ও চির-উর্ব্বর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

ঋগ্বেদের জন্মের কাল হইতে ভগবদ্ধর্ম্ম নানা ভাবে নানা দিক দিয়া অতীতের ভারতবাসীদের জীবনে যে ভাবে নানা কৃষ্টির উৎভব করিতেছিল, তাহারই প্রভাব হেলিয়ডরস, গুপ্ত রাজন্তবর্গ এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের রামানুজ কবীরের জীবনের মধ্য দিয়া এদেশে এক অভিনব ফলোৎপাদনে সক্ষম হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তর্গঠন ও সাধন-রূপ অনেকখানি ভগবদ্ ধর্ম্ম হইতে নেওয়া। বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট শাখা সহজযান। গুরুর উপদেশ গ্রহণ, পঞ্চকামের উপভোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সহজানন্দলাভ, এই সকলের ভিতর দিয়া বোধিপ্রাপ্তির যে পথ তাহাই সহজ-ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্ত প্রভু আপনার জীবনের অসামান্ত প্রেম ও ভক্তির আবেগে বাঙ্‌লায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে নব ধারার প্রবর্ত্তন করেন, তাহার বিকাশে সহজ-ধর্ম্ম ও পারস্তের সুফী-ধর্ম্মের (?) যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ভগবদ্ধর্ম্ম, সহজ-ধর্ম্ম ও সুফী-ধর্ম্ম, এই তিন ধারার সম্মিলনে বাঙ্‌লায় যে প্রেম ও ভক্তির বন্যা আসে, তাহার প্লাবনে দেশের সমস্ত অধিবাসীর চিত্ত ভাসিয়া যায়। তাহাতে কত কবি, কত ভক্ত, কত সাধকের যে আবির্ভাব ঘটে, কত রূপ ও ভঙ্গীতে বাঙালী চিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইহার অপরূপ বিকাশ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

লীলা-ধর্ম্ম সকল দেশের সকল কালের সকল জাতীর

দ্বৈতবাদীর মানুষের জন্ত সত্য। কাহারও জীবনে সেই ধর্ম্ম শুভ্র সুনির্ম্মল হইয়া একান্ত ভাবে বিরাট পুরুষের দিকে উচ্ছ্বাসিত হইয়া ওঠে, কাহারও জীবনে তাহা দয়িত বা দয়িতার অন্তস্থ হইয়া অনন্তের অন্তরের উপলব্ধিতে বিকশিত হয়। বিভিন্ন মানুষের আত্মার ধর্ম্মে ইহা বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন ভাবে প্রকট। এই লীলা-ধর্ম্মে ভক্তি, ভাব, প্রেম ও রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত আশ্রয় দুইটাই গ্রহণের পক্ষে উত্তম। বস্তুতঃ প্রেম ও রস চিরক্ষুধার্ত্ত ও চির বিলাসী মানব-আত্মার আহার ও সম্ভোগ স্বরূপ। তন্মধ্যে রস নায়ক নায়িকার বিশেষ ভোগের সামগ্রী। স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দ্বিবিধ রূপ ভেদে এই রস বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে উপভোগ্য। বাঙ্‌লা দেশ—বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। এই দেশের কোলের নর নারীগণের জীবনে পরকীয়া রসের প্রভাবই বিশেষ ভাবে ঘটিয়াছে। সহজ-সাধনে এই পরকীয়া রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস রূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার সম্প্রদায় ভুক্ত স্ত্রী পুরুষেরা প্রেম ও রস নামক দুইটী উত্তম আশ্রয়ের অধীন হইয়াই আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধিকা বা তাহাদের অনুগত সখা বা সখি জ্ঞান করিয়া বৃন্দাবন-লীলার অনুরূপ বহুবিধ রাস-লীলার অনুকরণ করিয়া থাকিতেন। এই রস-লীলার অভিব্যক্তি সকল বাঙালী জীবনের প্রকাশেই স্থান লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলী—তাহাও বিশেষ ভাবে এই সহজিয়া মনোবৃত্তির সৃষ্টি। বাঙ্‌লার এত লোক-সঙ্গীত, এত ভাবের ধারা, তাহাদের সকল বিভাগেই সেই রস মাধুর্য্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।—বাঙালীর এই রসানুভূতির ওপর শ্রীচৈতন্যের হরি-সঙ্কীর্ত্তন, ইস্‌লামের অন্তর্গত নক্‌লে বন্দিয়া ও চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের গান'বাদ্যসহকারে সম্পাদিত অনুষ্ঠান আদি সেই সহজ-রস-চর্চ্চার বৃত্তিকে অধিকতররূপ বিকাশের পথে যথেষ্ট সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, ভক্তিসূত্রে ও সহজ-ধর্ম্মে ভক্তি ও প্রেম ধর্ম্মের যে সুবিমল আভায ও আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাই সহস্র ধারায় ওবিভঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া বাঙ্‌লার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে পরিপূর্ণ প্রকারে ধন্য করিয়াছে। বাঙ্গালী চিত্তের শ্রীরাধিকা যেন মানব-প্রাণের চিরন্তন বেদনার বিরহী প্রতিমূর্ত্তি, বিরাট পুরুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সেই পুঞ্জীভূত বেদনা যেন সকলের চিত্ত ব্যাপিয়া এক কলোচ্ছ্বাস তুলিয়াছে,—কীর্ত্তনে, কবিগানে, সহেলায়, বারাষ্যায়, ভাটীগানে, খাটুগানে, বন্ধের-গানে, রাখালীতে, মুর্শীদ্যাগানে তাহার প্রকাশ যেন কোনো মতেই সমাপ্ত হইতে চাহিতেছে না। এই দেশের চিত্তের সঙ্গে যেন এই লীলা-ধর্ম্মের একটা সুনিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেন বৈষ্ণব-ধর্ম্মই এই পরিবেষ্টন ঘেরা দেশটির জীবনের ও অন্তরের স্বতঃ-পূর্ণ ও বিকাশের যোগ্য সহায়।

এই দেশের গাঢ় শ্যামলতা, নদী-বহুলতা ও পারিপার্শ্বিকতা ইহার কোলের মানুষের সাধারণ বৃত্তিগুলিকে এমন সুকোমল করিয়া রাখিয়াছে যে, ইহাদের হৃদয়ের স্বভাব বিকশিত প্রেমের তুলনা মরুস্থানের খর্জ্জুর-বাগে, পার্ব্বত্য-প্রদেশের নীলা-নিকুঞ্জে বা উত্তরের হাওয়া লাগা—তুষারের দেশে মিলেনা। বিশেষতঃ ইহার মাটীর নিবিড় সংস্পর্শে যে সম্প্রদায় নিত্য কাটাইয়া থাকে, উহার শ্যামলতার জন্য যাহাদের অন্তরে গাঢ় মমত্ব বোধ জাগিয়াছে, সেই সকল চাষীর সুকুমার মনোবৃত্তি মুক্ত বাতাসে, বালুচরের দৃশ্যে, নির্ম্মুক্ত মাঠে আলো ছায়ার লীলায়, সন্ধ্যা প্রভাতে জমির উপর স্তরে স্তরে গাঢ় স্বপ্নের ধীর আবির্ভাব ও তিরোভাবে, শিশির-সিক্ত মটর বা সরিষার ফুলের মনোহারিত্বে—পরিপূর্ণরূপ বিকশিত হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘ দিন সবুজ পাতায় পরিবৃত থাকিয়া থাকিয়া ইহাদের চিত্ত চির শ্যামল, সুশুভ্র ভাব ও রস-বিলাসের বিচিত্র আবাস ভূমি। এই সম্প্রদায় নিষ্কলুষ রস-ভোগী চিত্তের যোগ্য অধিকারী; ইহাদের অন্তরকার প্রেম সুনির্ম্মল ও সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া এক আনন্দ-ধর্ম্মের সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রেমের ও ভক্তির যে প্রকাশ ইহাদের জীবনে সম্ভব হইয়াছে, তাহা তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের জল মাটীর কল্যাণেই হইয়াছে। এ দেশের তরুণ তরুণী চিত্তের যে প্রণয় স্ফুরণ, অভিসার আর মিলন, তাহার ভঙ্গী বৈষ্ণবের রস-লীলাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। নিম্নে একটী "জল ভরণে"র উল্লেখ দ্বারা এই মন্তব্যটী সুস্পষ্ট করিতেছি।

রাখাল বালক নিতি তার মানসীকে দেখিয়া দেখিয়া শুধু

পথে চলিয়া যায়; একদিন দুঃসাহস করিয়া দৈবাৎ মনের পুঞ্জীভূত গোপন বেদনার আভাষ দিয়া বলিয়া যায়,—

"সন্ধ্যে বেলা জলে যেও তুমি।
সুন্দরী গো, কলসী ভরিয়া দিব আমি॥"

তরুণী তাহার এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনেকটা বুঝিয়া লয়, রাখালের জন্যও অপর পক্ষে তাহার অন্তরে যে প্রণয়ের সঞ্চার ঘটিয়াছে, তাহারই আবেগে সে ঘাটে ছদ্ম জল-ভরণে অভিসারে যায়। রাখাল কথা তুলিয়া তখন শুধায়:—

"জল ভর সুন্দরী গো জলে দেছ ঢেউ।
আঁখি তুল্যা কওনা কথা, সঙ্গে নাই মোর কেউ॥"

কন্যা উত্তর করে:—

"তুমি যে ভিন্ন পুরুষ, আমি ভিন্ন নারী।
কেমনে কহিবাম্ কথা, লজ্জায় সে মরি॥"

রাখাল বলে:—

"কোথায় তোমার পিতা মাতা, কোথায় তোমার ঘর।
পরিচয় কহ লো কন্যা, মাগি যে উত্তর॥"

কন্যা বলে:—

"নাহি আমার পিতা মাতা, নাহি আমার ভাই।
সোঁতের শ্যাওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়াই॥"

রাখাল বলে:—

"পরমা সুন্দরী কন্যা, প্রথমা যৌবন।
যে জনে দিয়াছ মালা, সে জন কেমন॥"

উত্তরে রাখাল জানিতে পায় যে, কন্যা অবিবাহিতা; কহে:—

"কি কব দুক্ষের কথা, কহিতে ভয় বাসি।
এমন সময় বিয়া নহিল—যৈবন হৈল বাসি।"

কন্যাও বাদানুবাদে জানিতে পায় যে রাখালও কুমার, আজিও অবিবাহিত। তখন পাল্টাইয়া বলে:—

"কঠিন তোমার পিতা মাতা, কঠিন তোর ও-হিয়া।
এমন বয়সের কালে নাহি দিল বিয়া॥"

রসিক রাখাল বলিয়া ফেলে:—

"কঠিন আমার পিতা মাতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মতন নারী পাইলে করতাম তবে বিয়া॥

কন্যা কহে:—

"লজ্জা নাই, নিলাজ কুমার, লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা তুইরে, জলে ডুব্যা মর॥"

রসিক রাখাল কহে:—

"কোথায় পাব কলসী, কন্যা, কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহিনা গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি॥"

নর নারীর এই ধারা, অভিসার আর প্রেমালাপ—এই বৈষ্ণব পদাবলীর দেশের জীবনের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ। গেঁয়ো রাখালের ব্যর্থ প্রেমের কত কাহিনী কত শত রাখালীতে যে নিবিড় বেদনায় রূপ গ্রহণ করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গো-চারণের মাঠে রাখালের বাঁশীতে যে গান আজিও যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করা বিরহী রাধার কথা স্মৃতি-পটে জাগাইয়া দেয়, কোন্ সুদূর দেশ হইতে যেন এক কান্নার ছবি সুরে সুরে মনের দুয়ারে ভাসিয়া আসে। বাঙ্‌লার রাখাল কৃষ্ণেরই মত মাঠে বাঁশী বাজাইয়া ধবলী চরাইয়া সখা রাখালদের সহিত তাঁহার আপন রাইয়ের গোপন কথা অন্য মনে কোন দিন বলিয়া যায়। সখা রাখালরা তাহার নিভৃত ব্যথার ভাগী হয়, ব্যথার অনুভূতি দিয়া তাহাকে ব্যথার রাজা করিয়া মাঠের রাজাসনে অভিসিক্ত করে,—কত আয়োজন চলে সেই রাইয়ের মিলনের জন্য। শ্রীহট্টের ও পূর্ব্ব মৈমনসিংহের বিভিন্ন হট্টে আজও রাখাল রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হয়; তাহাদের ইতিবৃত্ত কথায় কেচ্ছায়, পালা-গানে নানাভাবে রূপ লাভ করিয়া আশে পাশের কৃষানদের মুখে আজিও শুনিতে পাওয়া যায়।

"তুমি হও গহিনা গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি" এই রসের আবেদন বাঙালী কৃষাণের জীবনে যেমন সত্য সত্য ঘটিয়াছে, বাঙ্‌লার পল্লী-কাব্যও তেমনি তার অভিসার-চিত্র ও রসের বাদানুবাদকে সত্য সত্য লইয়া পালা-গানে গাজী-গানে ও কেচ্ছার নায়ক নায়িকাদের প্রেমালাপে, নিখুঁত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই কবিদের গীতি-কাব্য সৃষ্টি, স্বর্গীয় প্রেমের উপাদানে গঠিত নহে; বাস্তবের ওপর একান্ত ভাবে দাঁড় করাইয়াই তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকাদের ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য্য ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থন হইয়াছেন। নিতান্ত অনুভূতি দিয়া তাঁহারা কৃষাণের গোপন বেদনা অনুভব করিয়াছেন, আর আপনার কবি-মনের অপূর্ব রস বোধ দিয়া সেই বেদনাকে মূর্ত্ত করিয়াছেন পল্লীর গীতি-সাহিত্যে। নিছক আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাঁহারা কাব্য সৃষ্টিতে লাগিয়াছিলেন, সক্ষমও হইয়াছিলেন। আজ নিরক্ষর

পল্লী কবিদের রচিত গীতি-নাট্য ও পালা-গান সমূহ বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এই কারণে যে, সেই গানে মানুষের অন্তরের চিরন্তনী বেদনায় অপূর্ব্ব প্রকাশ আছে—সেই মানুষ এবং সেই প্রকাশের ভঙ্গী যত নিম্নস্তরেরই হোক্ না কেন! এই গান যে শুধু বাঙলী চাষীর জন্য সত্য তাহা নয়, জীবনের নিগূঢ় বেদনার ওপর ভিত্তি করিয়া ইহা এমনি অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে বিশ্বের যে কোনো স্থানের যে কোনো মানুষ ইহার নিবিড় রসস্বাদনে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হইতে পারে, এবং এই পারাটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক; এই খানেই মানুষের সাথে মানুষের ঐক্য।

(২)

পল্লী-বাঙালীর ভক্তি ও প্রেমের সাধনার গান-কীর্ত্তণ, কবি-গান, বাউল-গান, মারফতী-গান, ও মুর্শীদি-গান। এই সকল গানে বৈষ্ণবের লীলাবাদের এক আশ্চর্য্য প্রভাব ও প্রকাশ রহিয়াছে, তাহা সহজিয়া-সাধন-প্রভাবান্বিত বাঙালী চিত্তের। গৌরচন্দ্রিকা-বিহীন কীর্ত্তন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও পালা করিয়া গীত হইত; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই ললিত মধুর রস-সুবলিত কীর্ত্তন-গানের বান ডাকে, সেই বানে নদীয়ার সুরধুনী-ধারা বৃন্দাবণের কালিন্দী-ধারায় ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া যায়; মায়ুর, ধান্‌শী, ধড়া, দশকুশী, ছুটুকী প্রমুখ বহু রাগ-রাগিনীতে গীত হইয়া ধর্ম্মতত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত এক হইয়া বহিয়া চলে। কীর্ত্তন—মাতামাতির গান, সরল বাঙালী চিত্তের ভক্তি-মত্ততার পরিচয় এই গানের অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সহজিয়াদের রাস-লীলানুসরণের রীতি কিছুটা কবি-গানে ফুটিয়া আছে। কবি-গানে রাধা-কৃষ্ণ ছাড়া রাম সীতার কথা বিজয়া ও তার আগমনী প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। কবি-গানের প্রথম দিকে 'ঝুমুর' গাওয়া হয়। কৃষ্ণ-লীলা ও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ঘটিত কালিয়দমন যাত্রার অঙ্গ বিশেষের নাম ঝুমুর; এই ঝুমুর—মান, কলঙ্ক-ভঞ্জন, প্রভৃতি গানে সমৃদ্ধ। কবি-গান সাধারণতঃ ভবাণী-বিষয়, সখি-সংবাদ, লহর ও খেউর, এই কয় সাধারণ অংশে বিভক্ত। "আগম" ভবাণী বিষয়ের এবং বৃন্দাবণ-লীলা, মাথুর-লীলা, সখি-সংবাদের অন্তর্গত গান। লহর গান-শ্লেষাত্মক গান, এবং খেউর উৎকট ও অশ্লিলরসের গান। সন্ধ্যা হইতে এই কবি গানের প্রারম্ভ হইয়া সকালে "বোল-গানে" ইহার সমাপ্তি হয়। উক্ত বোল-গানে—আগম, গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, সখি-সংবাদ, জল-ভরণ ইত্যাদি গানও গাওয়ার প্রথা বিদ্যমান আছে। পালার সমাপ্তির সময় কবি-ওয়ালারা বোল গানে তাহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর ও চাপান মুখামুখি হইয়া গাহিয়া থাকে, এই খানেই একদল অন্য দলকে গানে ও ওস্তাদিতে পরাস্ত করিতে প্রয়াস পায়। কোথাও কোথাও এই বোল-গানগুলি বৈশাখ মাসে নাম কীর্ত্তণের সময় ডাক নাম রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোল-গানে কবিওয়ালারা শ্রীদামা সুদামা, কখনো বা ধবলী শাঙলি হইয়া প্রতিবাদ করিয়া থাকে। এই গানে দশকুশী, ছোট ইত্যাদি তালের কতকটা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটী বোল গানের ধুয়া যথাঃ—

"কাল অঙ্গে ধুলা কে দিল বাপধন।
কেন কেঁদে এলি বনমালী মলিন তোমার চাঁদ বদন॥"

কবি-গানগুলিতে ভাষার অনেকটা সৌষ্ঠব চিরকালই পরিলক্ষিত হয়। পরিমার্জ্জিত বা অনেকটা গ্রাম্যতা বর্জ্জিত, সকলের সহজে বোধগম্য ভাষার দিক দিয়া কবি গানের পাশে দাঁড়াইতে পারে বাউলের গান। কবিগান ও বাউলের গান, উভয়েই কবিতা কম, তবে বাউলের গানের তত্বের জন্ম মানব মনের বেদনা হইতে; কবি গানের ভাণ্ডারে আছে শুধু ফাঁকা কথার বেশাতি। বাউল—বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, যোগী, ইহাদের গান—নামপন্থী তান্ত্রিক সাধকের গান। নাথ-সহজিয়ার পর-পুরুষ ইহারা ত্যাগে নহে, ভোগে যে সহজানন্দ লাভ,—ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। সহজিয়া মতে সিদ্ধ বা অবধুত যাহারা, তাহারাই বাউল। সহজ মানুষ বা সাঁইকে চিনাই ইহাদের সকল সাধনার লক্ষ্য। এই গানের সম্প্রদায়ে হিন্দু (?) মুসলমান (?) উভয় ধর্ম্মের লোকই মিশ্রভাবে আছেন। অনেক স্থানে এমনতর পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে একজন মুসলমান বাউল ফকারের হাজার হাজার হিন্দু শিষ্য বিরাজ করিতেছেন, আবার কোথাও বা একজন হিন্দু বাউল সাধকের শত শত মুসলমান ভক্ত রহিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত পন্থী সাধকদের শিষ্যদের ধর্ম্ম মত বা জাতিভেদ নির্ণয় সুসাধ্য ব্যাপার নহে। মুসলমানদের আগমনের পর বিশেষ করিয়া এদেশের সহজ সিদ্ধ বৌদ্ধরাই দলে দলে ইস্‌লাম ধর্ম্মে অন্তর্ভুক্ত হয়েন; তাহারা কিন্তু জীবনে ইস্‌লামকে

মোটেই গ্রহণ করে নাই, ইস্‌লামের পবিত্রতা ও নৈতিকতা ইহাদের জীবনে মোটেই সুনিয়ন্ত্রন আনিয়া দিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে বাউলের দলের সৃষ্টি বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত নাথ-মার্গের লোকেরাই করিয়াছিল। উক্ত নাথ-মার্গের যাহারা ইস্‌লামে দীক্ষা নিয়াছিল, তাহারা সজীব বলিয়া অভিহিত হইত। ইহাদের সাধারণ নাম বাউল। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর সহজ সিদ্ধ যাহারা নেড়ানেড়ির দলের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারাই সাজিয়াছিল পরবর্ত্তী কালে বাউল শিষ্য। ফকিরী-গানে ও বাউল-গানে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নাই; কেবল মাত্র বাউলরা তাহাদের আরাধ্যকে বলে নিরঞ্জন বা সাঁই, আর ফকিররা বলে আল্লা-নিরঞ্জন বা সাঁই-আল্লা। ইহারা অত্যন্ত উদার পন্থী; কোনো প্রকার ভেদাভেদ ইহাদের জীবনে বা আচারে নাই। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব সমস্ত বাঙ্‌লাতেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; আজিও এই গানের দল জীবন্ত ভাবেই বাঁচিয়া আছে। আদিনাথ, মীণনাথ ও দীননাথ এই তিন নাথের ভজন গাহিয়া একতারা, খঞ্জনী বা গুবগুবাগুবের সাহচর্য্যে ইহারা গান আরম্ভ করে। গাঁজা বা সিদ্ধি ইহাদের সাধনার সহায়ক, এই সিদ্ধির আস্বাদ লাভ করে—বলিয়া ইহারা সিদ্ধী পুরুষ বা সিদ্ধাই খেতাব লাভ করে। নিম্নে একটী বাউল গানের উলেখ করিতেছি :—

"সব তালা সৃজন করলো বিধি।
কোন তালাতে বিরাজ করে গো আমার সাঁই-দরদী॥
কেবা আলেক লতা
কেবা যোগায় কথা,
কোন তালাতে আলেপ আসন ধইরাছে।
কোন্ তালাতে মনা
কোন্ তালা তার থানা
কোন্ তালাতে আলেপ আসন ধইরাছে।
হামেশা হুজুরে কেবা বিরাজ করে, সন্ধ্যা হৈলে কেবা লাগায় বাতি।
কোথায় মনি কোঠা রয়েছে আটা, কোন্ তালাতে মুর্শীদ করে গতাগতি॥

গোসাঞ আওল চান্দে (১) বলে—
প্রেমের সাগর জলে
সে যে প্রেম-স্বরূপে ভাসে নিরবধি॥"

বাউল-গান—তত্ত্বের গান; "নিঃসম্বলে ভবের হাটে বেলা-শেষে পার-ঘাটে কাঁদবে বসে"—ধরণের ভাবের কথাই এই গানে সমধিক পাওয়া যায়। এই গানের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কথাকে রূপক করিয়া গাওয়া হয়। দেহই মানুষের সব, এই দেহেই সকল কিছুর সন্ধান মিলিবে, অতএব এই দেহেরই সাধনা কর; মূলতঃ এই আদর্শের নানা ভাবের নানা তত্ত্ব-কথার মধ্য দিয়া, দেহের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা দ্বারা দেহস্থিত অরূপের সন্ধানে এই গান নিয়োজিত হয়। বাউলের গানের রূপকের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় মুসলমানী মারফতী গানের। সেই গানে দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত রূপক বিশিষ্ট তত্ত্বকথার অবতারণা আছে, তাহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা বর্ত্তমান যুগের অসামান্য তত্ত্বজ্ঞানীরও সহজ সাধ্য কর্ম্ম নহে। এই মারফতী গানের অনুরূপ রহিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের মহাজন পদাবলীতে এবং পূর্ব্বরূপ আছে বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহায় ও গানে। বৌদ্ধদের যে সম্প্রদায় বঙ্গাল প্রভৃতি রাগিনীতে জন-সমাজে প্রচার গাহিয়া বেড়াইত, তাহাদের ইস্‌লাম দীক্ষতেরাই এই গানের প্রচারে অধিকতর সহায়তা করিয়াছিল। পশ্চিমাগত সুফী ও মুসলমান আউলিয়াগণ এ দেশের চিত্তের সম্মুখে যে তত্ত্ব-ভাণ্ডার খুলিয়া দেন, তাহারই সম্পদে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এই মারফতী গান। এই গান—বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, মুসলমান, যোগীর গান; বাউল-গানের উদ্ভবে ইস্‌লামের কোনো প্রভাবের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু মারফতী গানের সৃষ্টি ইস্‌লামের সংঘাতে সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমানে বাউল-গান, মারফতী-গান বলিয়া তত্ত্বের গানে কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাহার কারণ—পরবর্ত্তীকালে ইহারা আদর্শের ঐক্যতা-গুণে এদেশের মাটীর প্রভাবে পরিয়া এক হইয়া যায়। এই দুই গানেই এখন বৌদ্ধের শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ, বৈষ্ণবের লীলা-বাদ ও অবতার-বাদ, সুফীর পীরবাদ স্থান গ্রহণ করিয়া

(১) আওল চান্দ কর্ত্তাভজা দলের প্রবর্ত্তক। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের মত জ্ঞান করিয়া থাকে।

আছে। মারফতী-পন্থীও এখন বাউল-ফকীরের মতন একতারা বাজাইয়া গায়,—

"প্রাণ মন কাড়িয়া গো নিল,প্রাণ-বন্ধে ফিরিয়া না চায়।
সখি গো, কৃষ্ণ-কাঙালিনী লোকে কানাকানি যথা তথা
শুনতে পাই॥
মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে আমি কৃষ্ণ-দোষী হইয়া বেড়াই॥
সখিগো, যদি পাইতাম বন্ধের মন
ছাড়িয়া যাইতাম গহীন বন,
তবে কি আর বন্ধের লাগি পাইতাম এত ব্যথায়॥
সখিগো, নিদয় নিঠুরের মন
দাসীর প্রতি নাই স্মরণ,
আমি মিছা দোষে করি হায় গো হায়।
আমার কৃষ্ণ-চোরা আপন দেশে নিজ বাঁশী বাজায়॥"—

এখানকার এই বৈষ্ণবীর রস-মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ধ্যান-পরায়না শ্রীরাধিকার যে বিরহিনী মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বাস্তবজগতের কোনো মানব-প্রেয়সীর কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া এই জড় জগতের বহু উর্দ্ধে আধ্যাত্মিকতার এক পরম সাম্রাজ্যে লইয়া যায়। এই রাধিকা মানব-আত্মার রূপক। তাহার অনুগতা সখিবৃন্দ সাধনার নিম্ন মার্গস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবত্মা। অনেক গ্রাম্য গানে নিজেকে রাইয়ের সখি স্বরূপে সম্বোধন দৃষ্ট হয়,—আধ্যাত্মিক সাধনায় যোগ্য মত অগ্রসর হইলে এই সখি-কল্পনার ভাব ক্রমে ক্রমে মহাভাবময়ী রাধিকার কল্পনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার রূপক, তিনিও বিরহী; মানবত্মার মধুর মিলনের লাগিয়া তার চিত্ত ও চির উতরোল। সখা সুদমা শ্রীদামাকে বারংবার তিনি তাঁহার রাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আকুলিত হইয়া উঠেন। পল্লী-বাঙলার যেই সাধনার গানে এই প্রেম-লীলা, তত্ত্বের নয়, আনন্দময় কাব্য-সৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় নিয়া রূপ লাভ করিয়া আছে—তাহা মুর্শীদ্যা গান। বাউল-কবি যেখানে আক্ষেপের সুরে গাহিতেছেন,—"ভাঙা ঘর চামরার ছানি, তাই পাইয়া মন ভুইল্যা রৈলে; একদিন মন ডাক্‌লে না তারে স্মরণ ক'রে";—সেইখানে মুর্শীদ-দলের প্রতিনিধি অশ্রুর জলে আর্দ্র হইয়া কান্নার সুরে কহিতেছেন,—"আইস রাখি হিয়ার মাঝারে রে, আইস রে পরাণের বন্ধু!" মুর্শীদ্যা গান বাঙালী কৃষাণের একান্ত আপনার সাধনার গান। ইহা কান্নার গান। এই গানের সাধনা—প্রেমের বা কান্নার সাধনা, অন্তরের পরম বেদনার উপর ইহার বেদী। এই গানের সাধক—মানুষ-ভজক সহজিয়া, মানুষ-পূজাই তাহার সর্ব্বস্ব। মানুষ ভজনার মধ্য দিয়াই সে তাহার উদ্ধ-দেবতাকে পাইতে চায়। চাষীরা তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত শ্রীরাধিকার চির বিরহ-বাণী শুনিয়াছে, ক্রন্দসীর ক্রন্দনে, দূরাগত বাঁশীর পূরবীতে; আর উন্মুখ উতলা হইয়া ছুটিয়াছে বিরহ-বন্ধন মোচনে। আরাধ্য মানবীকে পাইতে যাইয়া সেই পরম পুরুষের পদতল তাহারা গানের সুরে সুরে কখনো বা স্পর্শ করিয়া যাইতে পারিয়াছে, কখনো বা সেই পদ-শতদলের শীতল স্পর্শানুভব লাভ করিয়াছে চিত্তের সুগোপন ব্যথার বেদীতে। পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক মিলনে তাহাদের অন্তরের শ্রীরাধিকা আত্মবিস্মৃত সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে, আবার অদর্শনে উন্মত্তের মতো ক্রন্দনোচ্ছাস তুলিয়াছে। কৃষাণের তপস্বী আত্মা যেন সেই বিরাট পুরুষে বিলীন হইতে চাহেনা,—সহজ পথে পৃথিবীর আকাঙ্খিতের সহিত শুধু মিলন-বিরহের লীলা করিয়াই যেন বারংবার সেই শাশ্বত কালের অমর-লোকের বিশ্ব আরাধ্যের আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাহে। এ যেন বৈষ্ণব-কবির নিজে একেবারে চিনি হইয়া না যাইয়া, বরঞ্চ বারে বারে সহজতম উপায়ে চিনি খাইবার সুরসিক প্রবৃত্তি। কৃষকের আত্মার এই বৃত্তির পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির সহায়তা করিয়াছে—সমসাময়িক কালের মুর্শীদি দলের লোকেরা। পীর বা মুর্শীদ হয়ত আনমনে গান কখন বাঁধিয়া গাহিয়া গিয়াছেন, ভক্তেরা তাহাকে, মজ্‌লীশ করিয়া সারিন্দা হাতে মাতিয়া গাহিয়া তার রসের উপলব্ধি করিয়াছে। কৃষাণেরা তাহাদের চির ক্ষুধার্ত্ত চিত্তের আহার্য্য তাহাতে পাইয়াছে। জঁলাল শাহ ফকীর গান গাহিয়া গিয়াছেন;—

…"সই গো সই, আমার নবগঞ্জের হাটখানি কালা করলো খালি
গো সই, বন্ধে করলো খালি।
আমি হস্তে তুল্যা মাথায় লইলাম শ্যাম-কলঙ্কের ডালি
গো সই, শ্যাম-কলঙ্কের ডালি॥"…

কৃষাণ ইহা তাহার মানব প্রেয়সীর বা মানব-গুরুর উদ্দেশে গাহিয়া গাহিয়া আপনার অশ্রু-সিক্ত চিত্তে

পরমার্থের চিন্তামৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছে, ধন্য হইয়াছে।

(৩)

সাধনার গান ব্যতিরেকে বাঙালী কৃষাণের রস-ভোগের যে গানে লীলাবাদ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে, যেখানে সুফী বা বৌদ্ধ-তত্ত্বের কোনো দৌরাত্ম্য নাই, তাহা বারাষ্যা, বন্ধের-গান, ঘাটু-গান প্রভৃতি। বারাষ্যা বা বারমাস্যা গানের শব্দ ও ভাব বিন্যাস কোনো কোনো ঘাটুর গানেও দৃষ্ট হয়; বারমাস্যারও বিভিন্ন পদ বা পালা এবং সুর বিন্যাস আছে। একটী বারাষের কিয়দংশ, যথা :—

"বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়।
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ রাখন' না যায়॥
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রণা দেখে অন্তর জ্বালায়।
হিয়ের অনল ওঠে জ্বলিয়ে সদায়॥"…

রাধার বারাষের এই বিকাশ-ভঙ্গী গ্রামের গাজীর গীতের গর্ভাঙ্ক বিশেষে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। বারাষ্যা গুলিতে অনেক ঘর-করণার কথা আছে। ঘাটু-গানের অন্তর্ভুক্ত "বন্ধের-গান" বলিয়া গানের যে এক পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতেও বাস্তব ঘর-সংসারের অনেক কথা পাওয়া যায়। বন্ধের-গানের সহিত ঘাটু-গানের পার্থক্য এই যে, ঘাটু-গান পারমার্থিক জগতের, আর বন্ধের-গান বাস্তব জগতের। এই দুই গানের নায়িকার চিত্তই যথেষ্ট সবল, তিনি কোলাহল-ময় বাস্তব জগতে টিকিয়া থাকিয়া প্রেম করিবার যোগ্য, পদাবলী-সাহিত্যের দুর্ব্বল-চিত্ত রাধার মতন প্রেমাবেগে লুটাইয়া পড়েন না। একটী বন্ধের-গানের উল্লেখ নিম্নে করিতেছি ;—

"নিরালে বসিয়া বন্ধু আমার প্রাণ দেখিতে চায়
ও বন্ধু, আয় ও আয়॥
বন্ধুও, এবার না আসিলে বন্ধু আইবা কোন্ দিন,
এমন দুর্লভ যৈবন গেলে নি আর পায়।
ও বন্ধু, আয় ও আয়॥
বন্ধুও, তোমার পন্থে চায়্যা বন্ধু আক্ষের কাজল নাই,
তোমার ও-সোনার রূপ না দেখে পরাণ যায়।
ও বন্ধু, আয় ও আয়॥"—

পালা ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র ভাবে যে সমস্ত ঘাটু-গান রাখাল-ছেলেদের মুখে সচরাচর শোনা যায়, সেই সকলের ভাব ও ভঙ্গী অনেকটা বন্ধের-গানের ও কিছুটা কবি-গানের মতন, তাহাদের সুর-বিন্যাস অবশ্য ভিন্ন। কবি-গানের—

"ঐ বাজিছে সঙ্কেতে শ্যামের বাঁশরী!
শ্যামের মনোমোহন বেশ করলো পিয়ারী॥"…

ধরনের কথা ছোট খাটো ঘাটুর-গীতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই ঘাটু-গান নিরক্ষর গ্রাম্য মুসলমান চাষীর দ্বারা রচিত ও গীত; এই জন্য এই গানের ভাষা একেবারে গেঁয়ো, ভাব-সম্পদ ও এত মূল্যবাণ নহে। কিন্তু ইহার গৌরবের সামগ্রী ইহার অপূর্ব্ব সুর-সম্পদ। রাধাকৃষ্ণের রস লীলা যে মুসলমান চাষীর জীবনে কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ঘাটু-গানের ভিতর দিয়া তার সুকুমার বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত্তি বিকাশে। রাধাকৃষ্ণকে তাহারা পর্য্যাপ্ত করিয়া জীবনে গ্রহণ করিয়াছে, লীলা-মাধুর্য্য সুবলিত সঙ্গীতের সহায়তায় তাহারা সেই সত্যের প্রতিচ্ছায়া সকলের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছে। এই গান তাহাদের বিলাসের গান। এই খানে তাহারা তাহাদের রস-তৃষ্ণার্ত্ত ও বেদনার চিত্তকে নির্ম্মুক্ত নগ্ন করিয়া ধরিয়াছে, কোনো প্রকার নীতির বাঁধনকে স্বীকার করে নাই।—বৈষ্ণবের সাধনায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ প্রকার ভাবের সমাবেশ আছে, মধুর ভাবই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব, উক্ত গানে এই ভাব-পরায়ণতা যথেষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হইয়া আছে; তবে পদাবলী-সাহিত্যের কমনীয়তার স্থানে ইহাতে সুফী-চিত্তের আধ্যাত্মিক সবলতা ও আগুণ (Fire) আছে। এই গান ব্রাহ্মণবেড়ীয়া, শ্রীহট্ট, বিশেষ করিয়া কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বিস্তর পাওয়া যায়। পূর্ব্ব মৈমনসিংহের মুসলমান চাষীর জীবনে কেন যে লীলা-ধর্ম্ম এমন সুনিবিড় হইয়া রূপ গ্রহণ করিল—তাহার পশ্চাতে কিছু ঐতিহাসিকতা রহিয়াছে। পরিবেষ্টনও এর জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

ঘাটু-গান অর্থে বিভিন্ন ঘাট বা সোপান বিশিষ্ট গান। ঘাট হইতে ঘাটু শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহাতে হুওম, কওম ইত্যাদি নানা প্রকার সোপান আছে। ঘাটুর পালা-গানকে গীতি-নাট্য অভিহিত করা যাইতে পারে। কয়েক অঙ্কে এই নাটকের সমাপ্তি; শেষ অঙ্কে শুধু খেয়াল-গান গাওয়া হয়। পল্লীগ্রামে সন্ধ্যা হইতে এই গানের আরম্ভ হয়।

ঘাটুর ছেলে রমণীর বসন ও ভূষণে সজ্জিত হইয়া কখনো রাধা, কখনো কৃষ্ণ সাজিয়া গান করে। এই গানের সময় সাধারণতঃ ঘাটুর সঙ্গীরা সকলে মিলিয়া গাহিয়া থাকে। রাধা কৃষ্ণের জীবনের একটী দিনের ঘটনায় ক্রমঃ সমাবেশ লইয়া এই গানের ক্রমঃবিকাশ ও পরিনতি।—একদিন রাধা জল ভরণে গিয়া পথে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিলেন, তাঁহার অন্তরে এক দর্শনেই প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি সারা দিনের প্রত্যেক কর্ম্মে উতলা থাকিয়া, বনের বাঁশী শুনিয়া নিশিথে স্বপ্ন দেখিয়া, প্রভাতে ফুল তুলিয়া, বিরহে ঝুরিয়া ঝুরিয়া কৃষ্ণে কৃষ্ণেই এক জল-ভরণ হইতে অন্য জল-ভরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণ, ঘাটের পথে রাধাকে দেখিয়া উতলা হইয়া উঠিলেন,—রাধাকে জলের ঘাটে প্রেম-সম্ভাষণ জানাইলেন। এই খানেই পালার শেষ হইল। এই গানে মিলনের কোনো অঙ্ক নাই, একটানা বিরহের কান্নাতেই ইহা ভরপুর।—গ্রামের কৃষাণেরা যে ভাবে ইহার বিভিন্ন 'ঘাট' গুলি পরে পরে গাহিয়া যায়, আমি তাহা বিস্তৃত বিবৃত করিতেছি। বলিয়া রাখি যে ঘাটু-গানের পালা অসংখ্য, এক এক পল্লীতে এক এক পালা রাধা-কৃষ্ণ মিলনের বিভিন্ন ঘটনা-ধারা নিয়া গীত হয়; ইহাদের একের ধারার সহিত অন্যের আবশ্যকতঃ কোনো সামঞ্জস্য নাই তবে ইহাদের মূল-কথা প্রায় একই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—

"ফাল্গুন-মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে—"

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

সলীল-সলিল-লাস্যে অপরূপ রূপ বিভঙ্গিয়া,
লঙ্ঘিয়া লঙ্ঘিয়া
কঠিণ বাধার পুঞ্জ। সুবঙ্কিম নৃত্যচ্ছন্দে মরি!
কোন্ নীল-সাগরের অভিসারে চলেছ সুন্দরি!
কল্লোল-শিঞ্জিনী ওঠে ঝণ' রণি কৌতুকে চপল,
উপলে উপলে খালি করতালি হাসি খল খল।
ওলো নৃত্য পটিয়সি! আজি মম মুগ্ধ আঁখিতারা
পান করিয়াছে তব অভিনব লীলানৃত্য-ধারা।

তীরে গন্ধসার-তরু নোয়াইয়া পত্র-ঘণ-শির
কী কহে মর্ম্মর সুরে থরথরি' কাঁপিয়া অধীর!
শুক্লা-চতুর্দ্দশী শশী গিরি শীর্ষে রচে কোন্ বাণী,
বিস্ময়-বিমুগ্ধ চখে রহে চাহি নিস্তব্ধ—বনানী।

যৌবন-উচ্ছলা। তোর বক্ষে মূর্চ্ছি' পড়ে যবে চাঁদ,—
জ্যোৎস্নার জোয়ার আসি ভেঙে দেয় স্বর্গ-মর্ত্ত্য-বাঁধ।
গলিত রজত ধারা ফেনায়ে ফেনায়ে ছুটে' চলে,
সহস্র-হীরক চূর্ণ ঝলসিয়া ওঠে পলে পলে।

রৌদ্র ও মেঘের লীলা অনামা ফুলের গন্ধ সনে,
শৈলে শৈলে দিবা-স্বপ্ন সারাদিন রচিছে নির্জ্জনে!
ধ্যান মৌন অচলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিখরে শিখরে,
তোমার উল্লাস-গীত প্রতিধ্বনি গম্ভীরে ঠিকরে'!
রুদ্ধ-গিরিগুহা টুটি' উৎস রূপে পাষাণে'র প্রাণ
শিলায় শিলায় মুগ্ধ-আবর্ত্তনে অমৃতায়মান।
সুচির যৌবন-স্বপ্ন অঙ্গে তব লো তম্বি নটিনি!
শাশ্বত বসন্ত মর্ম্মে—সিন্ধু অভিসারিকা তটিনি!

গিল্‌টি

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গেরস্থ ঘরে ছোট খাটো ব্যাপার এমন ঘটেই থাকে। সংসার করতে গেলে এত সব খুঁটিনাটির দিকে নজর দিলে কি আর শান্তি থাকে!

তোমরা যেন কী বাছা, তিন ঘর ভাড়াটে রয়েছে পাশে, ঘরের বউয়ের নিন্দে শাঁখ বাজিয়ে না বললে আর তোমাদের চলে না!

ছাদ থেকে গলা বাড়িয়ে যিনি হক্ কথা শোনালেন তিনিও ভাড়াটে। অনেকদিনের পুরোনো এবং মুরুব্বিয়ানার জোরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

নীচে তখনও চেঁচামেচির বিরাম নেই। একজনকে কেন্দ্র করে' কতকগুলি মেয়ে পুরুষের বিকৃত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের অজস্র বর্ষণ চলছিল।

ননদের গলার আওয়াজটাই বেশি চড়ে। বললে—নিন্দে শুনে-শুনে ত' বউয়ের তিন অঙ্গ ক্ষয়ে' গেল! তা বলে ঘরের বউ চুরি করে খাবে গা? তুমি কি বল পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা বললে—তাই কি আর বলি বাছা? তা বলিনে। ছোট মেয়ে, সারাদিন চরকির মতন ঘোরে, মুখে জলটুকু নেই; না বলে মিছরি এক ডেলা যদি গালে দিয়েই থাকে তাতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ—

গরগর করে ননদ বলে উঠলো—পোকা পড়বে, মুখ খসে' যাবে। চুরি করে' যে খায় তার, ওকলতি যে করে তারও।—রাগের মুখে বাকি কথাটাও তুললে না। বললে—রাঙা মূলো! রূপের অংখারে পা পড়ে না,—রূপ কি আর থাকবে গা?

ছাদের আলসে থেকে সরে' যাবার সময় পাঁচুর মা বলে গেল—ননদের চোখে ভাজের রূপ চক্ষুশূল, এ বাছা চিরকেলে কথা!

ননদ আবার চেঁচিয়ে উঠলো—আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে; বলে, পর লাগে না পরে, নিজের চরকায় তুমি তেল দাও গে। আমাদের ছাগল আমরা ন্যাজে কাটবো—তুমি যাও।

বাঁ দিকে কাঠের আয়তনের ফুটো দিয়ে আর একটি তরুণী এতক্ষণ এদের কলহ শুনছিল—ছাগলের নাম শুনেই সে খিল্‌খিল্ করে' হেসে লুটোপুটি খেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। মেয়েটি আইন কলেজের একটি ছাত্রের স্ত্রী—নব্য বিবাহিতা। স্বামী-স্ত্রীতে দুটি ঘর ভাড়া করে' আছে। যুবকটি আইনও পড়ে—অধ্যাপনাও করে।

তা রূপের অহঙ্কার থাকলে বেমানান হত না। বছর বাইশ বয়েসের বউটি এতক্ষণ সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এই জঘন্য কলহ শুনছিল। জঘন্য বটে কিন্তু মিথ্যা নয়। হাতের মুঠায় আধখানা মিছরির খণ্ড তখনও রয়েছে। ক্রোধান্বিত তীব্র দৃষ্টিতে সে নিঃশব্দে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখখানি যেন ঠিক উদয়াস্তের সোনালি মেঘ। যেমনি ভাসা-ভাসা, তেমনি আরক্ত।

সিঁড়ি দিয়ে ননদ উঠছিল। বললে—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

বউ বললে—খুসী! তোমার কি?

আ মর! মুখ দেখো রাক্কুসির। বলি মাছ কুট্‌তে হবে না?

বউ নেমে যাচ্ছিল—খপ্ করে তার গায়ের আঁচলটা ধরে প্রবীনা ননদ বললে—বল্ তোকে বল্‌তেই হবে, চুরি করে খেয়েছিস কিনা বল্।

আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে মিছরির ডেলাটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বউ বলে গেল—খেয়েছি বেশ করেছি, তোমার বরের পয়সায় ত খাইনি।

আবহাওয়াটাই মন্দ। দিন রাত এই অন্ধকার খুপ্‌রিতে থাকা। বাইরের আলো-হাওয়ার চলাচল নেই। এর ওপর নিন্দা কলহ ও কুসংস্কারের গ্লানিতে অবরুদ্ধ বাতাস মাঝে মাঝে পঙ্কিল হয়ে ওঠে।

অতি বৃদ্ধা শাশুড়ী চোখে দেখতে পায় না—কিন্তু কাণ দুটো ভারি তীক্ষ্ণ। মুখখানা আবার তীক্ষ্ণতর। বলে—মরুক্, অমন বউ নিপাত যাক্—হে ভগমান!

কিন্তু বউয়ের সেবা নৈলে তার দিন চলা ভার!

ভাই-বোন দুজনেই পঞ্চাশের কোঠায়। দুজনেই এক জাতের। বোন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—দেখলে দাদা, তোমার একরত্তি বউয়ের রকম দেখলে?

দাদা বলে—হলো কি কাত্যায়নী?

কাত্যায়নী বলে—বিধবা পেয়ে বীণা-বৌ যখন তখন আমায় খোঁটা দেয়। এমন করলে কোথায় যাই বল ত?

আরক্ত চোখে চেয়ে দাদা বলে—মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে হারামজাদির মুখখানা ভেঙে দিতে পারিস নে? মার খোর অনেকদিন মা খেয়ে ভারি তেল হয়েছে—বুঝলি কাতু?

কাত্যায়নী বলে—কি জানি দাদা, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ—

গলা উঁচিয়ে দাদা বলে—তা বলে আমি কাউকে রেয়াৎ করিনে। ভাল মানষের মতন থাকো—বাপের ঠাকুর। নৈলে আমি

তারপর যা বলে তা অন্তত সহোদর বোনের কাছে স্ত্রীর সম্বন্ধে বলা চলে না।

জাত-কারবারি। তিসি আর সরষে পিষে তেল বার করে। সারা জীবন জেনেছে শুধু পেষণ। মানুষকে নিষ্পেষণ করতেও তার এতটুকু বাধে না। তা ছাড়া লোককে টাকা ধার দিয়ে সুদও খাটায়।—তেজারতি!

প্রথম পক্ষের তিনটে ছেলে-মেয়ে। একটা ছেলে দুশ্চরিত্র, আর একটা থিয়েটার করে' বেড়ায়। মেয়েটা আজও বেঁচে আছে বটে কিন্তু তার ইতিহাস বলতে গেলে লজ্জায় অপমানে কণ্টকিত হ'তে হয়।

তা হোক। এতে বাপের কোনো দুঃখ নেই। বলে-যাক্ গে যাক্, বয়ে' গেল! খাওয়াবো কদ্দিন? চরে—

বয়ে' থাক গে যেখানে খুসি! বাপ বলে' ত আর মাথা বিক্রী করিনি?

কথা শুনে অবাক হওয়া বীণার অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রতিদিনের ছোটখাটো নীচতা, শাঠ্য, অন্যায়, স্বার্থপরতা, কুশ্রী হীনতা একেবারে যেন তার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে মন-মস্তিষ্ক পঙ্গু করে ফেলেছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটিও তথৈবচ। কি একটা ভয়ানক কারণে ক্রোধমত্ত স্বামী সেদিন ঘরের মধ্যে গর্জ্জন করছিল। কাত্যায়নী কাছে বসে' বিনিয়ে বিনিয়ে এতক্ষণ কি বলছিল কে জানে। কেষ্টকান্ত—স্বামীর নাম—গলা বাড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে হুঙ্কার করে' বললে—ডাক্ দেখি, গুখেগর বেটিকে ডাক্ একবার, ওপরে আসতে বল্,—বাপের নাম যদি ওর না ভুলিয়ে দিই ত আমার নাম…হারামজাদি ভাইবোনের নামে এমনি করে'—ছি ছি…

কিন্তু ডাকতে হল না। পায়ের শব্দ করতে করতে বীণা ওপরেই উঠে আসছিলো। কিন্তু উঁকি মেরে তাকে দেখেই কি একটা কাজের ছুতো করে' কাত্যায়নী চট্ করে ঘরের বার হয়ে এল। বললে—যাই, এখনও আহ্নিক করা হয়নি।

সিঁড়ির সঙ্কীর্ণ পথে পরস্পরের গা ঘেঁষা হতেই বীণা বললে—ভা'য়ের কাণে এতক্ষণ আমার নামে বুঝি বীজমন্তর দেয়া হচ্ছিল?

কট্‌মট্ করে' তার দিকে একবার তাকিয়ে কাত্যায়নী নীচে নেমে গেল।

কেষ্টকান্তর গর্জ্জন একটু কমলেও বিষ মরেনি। ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্য দিকে চেয়ে বীণা বললে—কেন ডাকা হচ্ছে শুনি?

ঘাড় ফিরিয়ে কেষ্টকান্ত তার আপাদমস্তক একবার ভাল করে' দেখলে। পরে বললে—কেন জানো না?

না।

কিন্তু তার এই ঘাড় দুলিয়ে 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। ঘট্‌লো কেষ্টকান্তর মুখে চোখে। মুখের সেই কদর্য্য ভঙ্গী আর চাহনির রুক্ষ কর্কশতার পরিবর্ত্তে যেন একটা লুব্ধ ও আবিষ্ট দৃষ্টি ফুটে উঠলো। বীণার পরিপূর্ণ ও নিটোল দেহখানির প্রতি অলক্ষ্যে আর একবার দেখে নিয়ে সে বললে—আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে বুঝি তোমার ঘেন্না হয়?

বীণা কোনো দিনই এসব কথার উত্তর দেয় না। একটুখানি গলা নামিয়ে একটু হেসে কেষ্টকান্ত বললে—তুমি আমার কাছে এলেই তোমার ওপর আমার সব রাগ পড়ে' যায়।—কাতুর সঙ্গে রোজ রোজ এমন ঝগড়া হয় কেন?

জানিনা ক'। এসব শোনবার সময় আমার নেই।

কথা বলতে গিয়েও মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে যেন তরঙ্গ খেলে যায়। যাবার পথটা একটুখানি আড়াল করে দাঁড়িয়ে কেষ্টকান্ত বললে—রাগলেই তোমাকে যেন বেশি ভাল দেখায়—কেন বল ত?

বলতে বলতেই জানোয়ারের মত ক্ষুধাতুর দাঁত প্রকাশ করে' সে হাসতে লাগলো। কিন্তু তার এই জঘন্য তোষামোদের অর্থ বীণার অপরিচিত নয়। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে সে বেরিয়ে আসছিল—

ওকি, ছাড়ো—ঢঙ্ করবার সময় এ নয়।—আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বন্ধুত্বটা এক পক্ষ থেকেই যেন-জমে ওঠে বেশি—এবং ছাদে না উঠলে আর দেখাশুনোই হয় না। ঘুলঘুলির ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে চিত্রা বলে—একদিকে চেয়ে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকো কেন ভাই?

বীণা তার মুখের দিকে চায় কিন্তু কোন উত্তর দেয় না। সারা দিনের বোঝা বয়ে অবকাশের সময়টিতে বন্ধুত্বে আর রুচি থাকে না। একটুখানি ক্লান্ত হাসি হাসবার চেষ্টা করে' বলে—এমনি।

চিত্রার পরণে একখানি নতুন সৌখিন সাড়ী। গায়ে জরির কাজ করা গরদের ব্লাউস। কাণে হীরের দুল দুটো এই অবেলার আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। হাতে হাল-ফ্যাসানের দুগাছি চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি। মুখের ওপর লাল রোদের আভা খেলছে।—সমবয়সী।

চিত্রা বলে—সবই শুনতে পাই, এমন শ্বশুরবাড়ী কোথাও দেখিনি।

কিন্তু সবটাই যে শ্বশুরবাড়ীর দোষ নয়—এ কথাও চিত্রা জানে। এ মেয়েটি যে চুরি করে, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা বলে, গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করে—এ সমস্ত চিত্রার অবিদিত নয়। কিন্তু সমবয়সের বন্ধুত্ব কোনো বাধার অপেক্ষা রাখে না। বলে—দোষ সকলেরই আছে কিন্তু তাই বলে—না ভাই, আমার কিছু বলা উচিত নয়।

বন-হরিণীর মত চিত্রা একদিকে ছুটে পালায়।

তার সেই লীলায়িত গতিভঙ্গীর দিকে চুপ করে চেয়ে বীণা কি ভাবে কে জানে! মেয়েটি প্রতি কথায় যেন একটি সুগন্ধের আভাস দিয়ে যায়। তার সেই সুসজ্জিত ঘরখানির দিকে বীণা তাকিয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে কয়েকখানি সুদৃশ্য ছবি, দুটি মেহগ্‌নি কাঠের ঝক্‌ঝকে দেরাজ, প্রসাধনের টেবিল সংলগ্ন বড় একখানি আয়না, বিছানাগুলি ধবধবে পরিস্কার,—সুশৃঙ্খল অন্যান্য কতকগুলি গৃহসজ্জা যেন সুনিবিড় মমতার মত ঘরখানিকে ঘিরে আছে। দুইটি জীবনের ছন্দকে আশ্রয় করে একটি অপূর্ব্ব ভাব-ব্যঞ্জনা ঘরখানির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছে। কাঙালের মত সেইদিকে চেয়ে চেয়ে কোন্ এক সময় তার চোখ দুটো যেন হিংসায় জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। বুকের ভেতর থেকে যেন একটা প্রচণ্ড আত্ম-দাহী অকারণ দীর্ঘশ্বাস সুকঠিন জ্বালা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

দিনের আলো তখন আর থাকে না। চিত্রার যুবক স্বামিটি সাড়াশব্দ করে' ওপরে উঠে আসে। সুন্দর যুবকটির চোখেমুখে যেমন তারুণ্য, তেমনি যৌবনের পুলকোচ্ছাস। অকারণে হো হো করে হাসে, প্রচুর কথাবার্ত্তা বলে, নিজেই হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে লোককে গান শোনায়, অপর্য্যাপ্ত আহার করে, অপরিসীম পরিশ্রম করতে পারে এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করে না।

এমন ভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় ভেবে বীণা চলে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু যেতে পারে না। দাঁড়িয়ে তাকে থাকতেই হয়। দেখে—সারাদিন বাদে স্বামিটি ফিরে এসে চিত্রাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে, তার দেহ এবং রূপসজ্জার প্রতি চেয়ে বেশ সরস প্রশংসা করে, দেয়ালে টাঙানো কোন্ এক বিদেশী শিল্পীর একখানি চিত্রের সঙ্গে চিত্রার তুলনা করে' তাকে রাগায়, প্রতিদিনের মত বেড়াতে যাবার লোভ দেখিয়ে স্ত্রীর কাছে আবার একটু তিরস্কারও শুনে নেয়।

ছোটখাট বস্তু, কিন্তু সব জড়িয়ে এ যে কত বড় তার হয় ত সীমা নেই। বেঁচে থাকার আকণ্ঠ তৃষ্ণায় যেন বীণার গলা বুজে আসে।

খানিক পরে স্বামিটি বাইরে যায়—মুখ-হাত ধুয়ে আসে। চিত্রা খাবার এনে সযত্নে খাওয়ায়। পরে বারান্দার ধারে বসে প্রতিদিনের মতই অবসান দিনের পাণ্ডুর আভাসের দিকে চেয়ে চেয়ে দুটিতে কি যেন প্রার্থনা করে। দুজনের মুখেই স্তবগানের মৃদুগুঞ্জন শোনা যায়।

আকাশে তখন প্রথম সন্ধ্যা-তারাটি ঝক্‌ঝক্ করে।

এতক্ষণে বীণার সেই ঈর্ষা জর্জ্জর দুটি চোখে হু হু করে জল এসে পড়ে। অন্ধদৃষ্টিতে হাতড়াতে হাতড়াতে তখন সে নীচে নেমে আসে।

আসে বটে কিন্তু ভাল লাগে না। গোধূলি মলিন মুমূর্ষু আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে ওদের ঐ প্রার্থনা কার কাছে চলেছে! কিন্তু তার এই চিন্তারই ফাঁকে ফাঁকে যুবকটির উচ্চ হাসি আর অসংলগ্ন কথাগুলি ধারালো কাঁটার মত তার ভেতরে গিয়ে বিঁধতে থাকে।

দোকান থেকে দুপুর বেলা ফিরে এসে কেষ্টকান্ত হিসাব নিকাশ দেখছিল। দিনে-রাতে বারকয়েক তহবিল না মিলিয়ে দেখলে তার ঘুম হয় না। জমা খরচের খাতার সঙ্গে তহবিলের সামঞ্জস্য না দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার সব গোলমাল হয়ে গেল।

পাশের ঘরে বসে কাত্যায়নী তখন তার সখের বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের সেবায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ভায়ের অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ শুনে বলে উঠলো—কি হলো কি দাদা?

দাদা বললে—শিগগির আয়—সর্ব্বনাশ।

কাত্যায়নী ছুটে এসে দেখলে, উন্মাদ হয়ে যেতে কেষ্টকান্তর আর বিলম্ব নেই। পরণের কাপড় চোপড়ের অবস্থার দিকে আর চেয়ে থাকা চলে না। বিকৃত কণ্ঠে কেষ্টকান্ত বললে—তবিল চুরি হয়ে গেছে কাত্তু, কে করলে?

ওঃ—এই কথা! আমি বলি কি না কি।

কে করলে?

কে করলে? তুমি কি ন্যাকা?—পরে ঠোঁট উলটে একটু হেসে কাত্যায়নী পুনরায় বললে—বোধহয় আমিই করেছি দাদা।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কেষ্টকান্ত এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' থেকে বললে—কিন্তু বৌ ত' কোনদিন টাকা চুরি করে নি কাতু?

মুখ ঝামটা দিয়ে অকস্মাৎ কাত্যায়নী বলে উঠলো—তবে আমিই করেছি, এই ত তোমার বিশ্বাস? তা আমায় জেলে দিও?—ফরফর করে' সে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাড়ীতে সেদিন একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কেষ্টকান্ত বললে—সত্যি বলছিস কাতু, বৌ নিয়েছে?

কাত্যায়নী বললে—আর কি শিব ছুঁয়ে বলবো দাদা? মরণ হলেই বাঁচি।

ততক্ষণে কেষ্টকান্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। বীণা তখন অকর্ম্মণ্য শাশুড়ীর মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দিচ্ছিল। আর কোনো কথা নয়—কেষ্টকান্ত এসেই তার চুলের মুঠি ধরে হিচ্ড়ে দাঁড় করিয়ে বললে—ওপরে আয়।

কেন, কি—আঃ ছাড়ো লাগছে—বাবারে—

স্বামী ততক্ষণে টান্তে টান্তে ওপরে তুলে এনেছে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললে—টাকা চুরি করেছিস কেন?

বাঘের মত তখন কেষ্টকান্তর চোখ দুটো জলছে।

অবাক হয়ে বীণা বললে—টাকা? আমি নিয়েছি? সে কি?

ঠাস্ করে গালে একটা চড় মেরে কেষ্টকান্ত বললে—আবার মিথ্যে কথা? হারামজাদি—ছেনাল! টাকা বার করে' দে নৈলে খুন করবো।

এক চড়েতেই চোখে জল এসেছিল। বীণা বললে—মাইরি আমি নিইনি, তোমার দিব্যি করে' বলছি, আমি কোনোদিন—

আবার চড়। চড়ের পর চাপড়। তদুপরি কিল এবং পুরুষোচিত ঘুঁসি। বীণা চীৎকার করে' উঠলো।

কিন্তু বাইশ বছরের যুবতীকে কাবু করতে হলে…হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে! সেই আদিম কাল থেকে পুরুষের কাছে নারী জাতি যে সম্মান-চিহ্ন পেয়ে আসছে—পদাঘাত! পদাঘাতের পরেই পতন। কিন্তু মূর্চ্ছা নয়! চীৎকার করবার শক্তিও আর নেই—পেটে যে ব্যথা ধরেছে।

তা ধরুক—গলার আওয়াজ এখনও আছে। মাটীতে লুটিয়ে পড়ে' অবরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বললে—বড্ড লেগেছে, উঃ—আর না, তোমার দিব্যি করে বলছি আমি চুরি করিনি,—এই তোমার পা ছুঁয়ে—হাত বাড়িয়ে সে কেষ্টকান্তর একটা পা জড়িয়ে ধরে আবার বললে—নিলে এতক্ষণ আমি ফেরৎ দিতাম…সত্যি বলছি তোমাকে—।

দরজা ঠেলে সবেগে কাত্যায়নীর প্রবেশ। বললে—নিসনি? এত মার খেয়ে আবার মিথ্যেকথা? ছেলে যদি তোর থাকতো তবে তার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করাতাম। টাকা নিয়ে ভায়ের হাত দিয়ে তুই বাপের বাড়ী পাঠাস নি? চল্ দেখি আমার বানেশ্বর ছুঁয়ে বলবি?

চল। আস্তে আস্তে বীণা উঠে এ ঘরে এল। ক্লান্ত হয়ে কেষ্টকান্ত তখন দরজার কাছে বসে পড়েছে।

সিংহাসনের ওপর থেকে শিবলিঙ্গটি হঠাৎ হাতে করে' তুলে এনে বীণা সজল চোখে বললে—নিইনি নিইনি,—চুরি আমি করিনি—হল?

তারপর শিবটি যথাস্থানে রেখে ননদের দিকে একবার চেয়ে কি যেন বলতে গেল কিন্তু অশ্রুতে তার চোখ দুটি তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

ভাই বোনেই যেন এতক্ষণ মূর্চ্ছা গিয়েছিল। ঘোর কাটবার পর কাত্যায়নী বললে—কালকেই আমায় দেওরের কাছে পাঠিয়ে দিও দাদা।

দাদা শুধু বললে—এতদিন যাবো যাবো কচ্ছিলে, এবার সত্যিই যেও ভাই।

চিত্রা সবই শুন্তে পেয়েছিল। পাছে মুখোমুখি হলে

বীণা লজ্জিত হয়—এজন্যে সুমুখে আসতে সে নিজেই লজ্জা বোধ কচ্ছিল।

ছাদের পাঁচিলের কাছেই বীণা দাঁড়িয়েছিল। চিত্রাকে ডেকে বললে—শোনো না! দুতিনদিন দেখিনি যে?

কাছে এসে ওপাশে দাঁড়িয়ে চিত্রা বললে—ওঁর ছুটি ছিল কি না, তাই জন্যে ভাই সময় পাই না।

ও। আচ্ছা, একটা কথা তোমায় বলছিলাম।

একটু হেসে চিত্রা বললে—বল না ভাই?

বীণা বললে—সেদিন তুমি চমৎকার সাড়ীখানি পরেছিলে। ব্লাউসটিও তেমনি। তোমার কাণের ওই দুল দুটোর অনেক দাম—না?

চিত্রা বললে—খুব বেশি নয়।

আচ্ছা যে এসেন্স্‌টা মেখেছিলে সেটা গোলাপের বোধ হয়, না রজনীগন্ধার? ভাল পাউডার আর পমেটমও তুমি মাখো—না?

চিত্রা কি একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রসিকতা করা উচিত হবে না ভেবে চুপ করে গেল।

তাই বলছিলাম—বুঝলে? আচ্ছা, ওইগুলো আমায় আনিয়ে দিতে পারো ভাই?

কি?

ওই রকম সাড়ী, ব্লাউস আর দুল। আর সেদিন মুখে তুমি যা যা মেখেছিলে! এই নাও ভাই, তোমার স্বামী যেন দয়া করে' এনে দেন্।—বলেই সেই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে খানকয়েক টাকার নোট চিত্রার হাতে গুঁজে দিয়েই বীণা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। এমন ভাবে হাঁপাচ্ছিল যেন সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে।

পরদিন ঠিক সেই সময়টিতে দুজনে আবার দেখা। চিত্রা একটু হেসে বললে—তোমার ফর্দ্দ মতই সবগুলি এসেছে ভাই, কিছুই ত্রুটি হয়নি।—বলে খবরের কাগজের একটা বাঁধা মোড়ক সে বীণার হাতে তুলে দিলে।

চিত্রার স্বামীটি বোধহয় বেরোচ্ছিল, হঠাৎ চোখোচোখি হতেই মৃদু হেসে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে বললে—এবার থেকে যখন যা দরকার হবে বলে পাঠাবেন, এনে দেবো।

চিত্রা বললে—আর কি! এবার থেকে তাহলে—বলে হাসতে হাসতে সে ছুটে পালালো।

মোড়কটা হাতে নিয়ে বীণাও নীচে নেমে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে' আলোটা জ্বেলে মোড়কটা খুলে দেখতে দেখতে সে চমকে উঠলো। সাড়ীটার একটা ভাঁজের মধ্যে সেই নোট কখানা আবার ফিরে এসেছে।

একথা কাউকে বলবার নয়। ফেরৎ দেওয়ার পথটুকু ধরে কত বড় অনুগ্রহ যে আজ এসেছে তার আর সীমা নেই। দয়াও যেমন নির্দ্দয়তাও তেমনি। ঘৃণা ও করুণা, অবহেলা ও যত্ন যেন এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। মনে পড়ে গেল যুবকটির সস্নেহ মৃদু হাসি, চোখ দুটির সরলতা, কথা বলবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী,—সমস্ত মিলে তার জর্জ্জরিত বুকের মধ্যে ধারালো ছুরির মত কাটতে লাগলো। তার ভদ্রতা, মহত্ব এবং বিনয় যেন অপাত্রে পড়ে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।—রাগে এবং ঘৃণায় সে বসে বসে কাঁপতে লাগলো। শয়তান যেমন ভগবানকে ঘৃণা করে।

রাতের বেলা পাশে শুয়ে কেষ্টকান্ত বললে—কেন খামোকা চোখের জল ফেলছ?

হঠাৎ বীণার মাথায় যেন ভূত চেপে গেল। চোখ মুছে উঠে বসে বললে—কেন তা তুমি কি জানবে? কোন্ খবরটা রাখো শুনি?

কি হল কি?

কিছুই না। আমাকে লোকে যদি অপমান করে তাতে তোমার আর কি!

অপমান? কে করলে? কাতু ত চলে গেছে!

কাতু ছাড়া কি পৃথিবীতে অপমান করবার লোক নেই?

কেষ্টকান্তও উঠে বসলো। বললে—তবে?

বীণা একটুখানি চুপ করে রইলো। পরে বললে—ও যে ভাল লোক নয় এ আমি আগে থেকেই জানি।

কে?

ওই যে ওই মেয়েটার বর। বদ্‌মাইস লোক। একলা ছাদে গিছলাম, অত এদিক ওদিক দেখিনি। ও এসে ওদিক থেকে কি সব বলতে লাগলো, ছুটে পালিয়ে এলাম তাই—

কেষ্টকান্ত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে বললে—কিন্তু ওকে ভালো ছেলে বলেই ত জানি।

তবে আমিই মন্দ—এই ত? তা বেশ, আর যদি কোনদিন কোনো কথা বলি তাহলে—

পরদিন প্রাতঃকালেই উঠে সকল কাজের আগে কেষ্টকান্ত বাইরে গেল। গম্ভীর ভাবে ছোকরাটীকে ডেকে বললে—তোমাকে একটি কথা বলছিলাম, সুরেন ভায়া।

সুরেন বললে—বেশ ত বলুন না?

গলা পরিষ্কার করে কেষ্টকান্ত বললে—দু' একদিনের মধ্যে আমার ভাই পো এখানে আসছে, তা তুমি যদি ভায়া—

বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে বুঝি?

হেঁ হেঁ, বুদ্ধিমান ছেলে,—বুঝতে পেরেছ দেখছি।

সুরেন হেসে বললে—বুঝতে পেরেছি অনেক দিন আগেই। বেশ, তাই যাবো। যদিও এত তাড়াতাড়ি না গেলে আপনি কিছুই করতে পারেন না।

কালকেই যাবে কি ভায়া? না পরশু?

সুরেন আবার হাসলে। বললে—না কাল নয়, ওবেলায় যাবো। এর পর রাত্রিবাসও আর করবো না। আমি সত্যিই একটু বুদ্ধিমান—বুঝলেন দাদা?

কিছু মনে করো না ভায়া, নিতান্ত দায়ে পড়েই—মাথা হেঁট করে কেষ্টকান্ত ভেতরে গেল।

যাবার সময় চিত্রা একবার দেখা করতে চাইলে—হল না। হয়ত বলতো—তোমার কুৎসিত জীবন সুন্দর হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

স্বামীটি হয়ত বলতো—আপনার সতীত্বের পায়ে প্রণাম জানাচ্ছি।

কিন্তু ওদের চলে যাবার পরও বীণা তেমনি ছাদে বসে রইলো। বসেও রইলো এক অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে! যেমন ভঙ্গীতে ওরা বারান্দায় বসে প্রার্থনা করতো, স্তবগান করতো, এবং হয়ত বা নিজেদের অপরাধও স্বীকার করতো—।

কিন্তু প্রার্থনা যে নেবে সে কি ওই বিবর্ণ ব্যথাতুর সন্ধ্যা, পাণ্ডুর মেঘমালা—না ভিতর-বাহিরের এই অপরিসীম জনহীন শূন্যতা!

চোখের জলে বীণার বুক পর্য্যন্ত তখন ভিজে গেছে।—

—০—

পত্রলেখা

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

নহ দেবী, নহ দাসী, নাহি ছিলে বধূ,
নাহি ছিলে প্রণয়িনী; ছিলে তুমি শুধু,
পুরুষের সহচরী,—অয়ি উপেক্ষিতা!
সুন্দর-জগত তলে। হওনি কুণ্ঠিতা,
চন্দ্রাপীড় মত্ত যবে কাদম্বরী সনে
প্রণয়-মহোৎসবে; জ্বাল নাই মনে
লেলিহান্ ঈর্ষ্যা-বহ্নি! উভয়েরে আনি
মরম-মন্দিরে তুমি পূজিয়াছ জানি,
ভালবাসা-প্রীতি-স্রকে। প্রাণখানি তব,
মনে হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী, স্বর্গে অভিনব
শাশ্বত মঙ্গল শান্ত। জীবনের ব্রত,
চন্দ্রাপীড়-সেবা তব। শুকতারা মত
অদৃশ্য কখন হলে' লভি রবি-রেখা;
কবির শ্রদ্ধার মাল্য লহ পত্রলেখা।

ময়ূর পুচ্ছের নূতন কাহিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

গাড়ীতে ভীষণ ভিড় ছিল। গার্ডের গাড়ীর পর থেকে ইঞ্জিনের আগে পর্য্যন্ত সমস্ত গাড়ীগুলায় চেষ্টা করিলাম—কোনখানে খোট্টার পাল দাঁতমুখ খিঁচাইয়া রুখিয়া আসিল, কোনখানে কাবুলীওয়ালা দরজার হাতল ধরিয়া উল্টা দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল, কোনখানে বাঙ্গালীবাবু ইংরাজী ও বাঙলায় রেলওয়ে আইন কানুন সম্বন্ধে একটু শিক্ষা দিয়া বিদায় করিল...

ইউরোপিয়ান থার্ডে যায়গা ছিল।—মাত্র একটি পাদ্রী ও গৌয়ারগোবিন্দ গোছের তাহার একটা ক্রিশ্চান কাফ্রী সহকারী বসিয়াছিল। আমি দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাদ্রীটা ধর্ম্ম বিষয়ে বেশ হিসাবী বলিয়া বোধ হইল, কারণ নিজে কিছু বলিল না, শুধু কাফ্রীটাকে টিপিয়া দিল—"He must not come,—see to it" অর্থাৎ দেখো যেন না ঢোকে। কাফ্রীটাকেও ষোল আনা পাপের ভাগী হইতে হইল না, কারণ সে তাড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি 'হ্বান ত্যাগেন' তাহাকে বাঁচাইয়া দিলাম।

ইণ্টারক্লাশ ওয়েটিংরুমে গিয়া ব্যাগটা খুলিলাম। জ্যেঠামহাশয় মাপ দিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য চাঁদ্নি থেকে একটা পুরা সুট কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলাম-মায় টুপী নেক্‌টাই সমেত। আমার যাহা পরা ছিল সে সব তো রহিলই তদুপরি সেইগুলা চড়াইলাম। পেণ্টুলুনটা বুক পর্য্যন্ত তুলিয়া বাঁধিলাম এবং নীচে-গোছের কাছে তিন চার পাট করিয়া মুড়িয়া দিলাম। টুপীটা মাথায় না দিয়া সাহেবী কায়দায় বগলদাবা করিলাম—সে এক বীরভদ্দর সোলার টুপী—পরিলে একপ্রকার পুরুষ-ঘোমটা হইয়া পড়িত, পথ চলিবার উপায় থাকিত না; একটা দেশী গেরো দিয়া নেক্‌টাইটা বাঁধিলাম, কোটটার আস্তিন ভিতর দিকে কনুই পর্য্যন্ত তুলিয়া মুড়িয়া দিলাম—ওদিকে হাঁটু পর্য্যন্ত লটকাইয়া রহিল ...

একটা কাপড়ের পুঁটলিতে পুরোহিতদর্পণ, সত্যনারায়ণ-কথা, সরলচণ্ডী, মনসা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি মিলিয়া প্রায় ৬০ কাপি বই এবং একরাশ বাঁধান অ-বাঁধান ঠাকুর দেবতার ছবি বাঁধা ছিল,—গ্রামের ফরমাস। সেই বোঝাটা একটা কুলির মাথায় দিয়া একেবারে ইউরোপিয়ান থার্ডের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং টুপীটা কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া, দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। কাফ্রীটা আমায় স্বজাতি মনে করিয়া সম্ভাষণ করিতে যাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল; সন্দিগ্ধভাবে খানিকটা উত্তেজনার সহিতই বলিল—"তুমি না এই আসিয়াছিলে?—জোচ্চোর!"

সেকেণ্ড বেল বাজিতেছিল; আমি কুলির মাথা হইতে বইয়ের পুঁটলিটা নামাইতে নামাইতে সংক্ষেপে বলিলাম—"নেটিব ক্রিশ্চান—নেশানেল ড্রেস্" ...

"স'রে দাঁড়াও, র‍্যাক্কিনের বড় সাহেব আসচেন"—বলিতে বলিতে তিন চারজন বখাটে বাঙ্গালী ছোকরা আমার সামনে ভিড় সরাইতে সরাইতে আসিয়াছিল। টুপি নাড়িয়া ইংরাজিতে বলিলাম—"তোমাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, বন্ধুসব; মনে রেখ, এখন বিদায়!"

তাহারাও কতকটা অপ্রতিভ হইয়া গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল, কাফ্রীটাও বোধহয় আমি দলে ভারি আছি ভাবিয়া আর তখন কিছু বলিল না। শুধু নরখাদকের মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পাদ্রীটাও মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছিল। ইহাদের গতিক দেখিয়া আমি আর দরজার নিকট হইতে নড়িলাম না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া বাক্সের উপর পুঁটলিটা অস্বস্তির সহিত নানাভাবে গুছাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং ইহারা কিরূপ ব্যবহার করিলে আমি কি উপায় অবলম্বন করিব মনে মনে তাহারই একটা খসড়া করিতে লাগিলাম।

পাদ্রীসাহেব কাফ্রী সাহেবটাকে হুকুম করিল—"জিজ্ঞাসা করত, ওকি ইউরোপিয়ান ?"—হুকুম করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও উত্তর না দিয়া কাফ্রীটার মুখ দিয়াই প্রশ্নটা শুনিবার অপেক্ষায় রহিলাম। সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"Dont you hear, you fool, are you a European ?" অর্থাৎ কথাটা কানে ঢোকেনি, মুর্খ তুমি কি ইউরোপিয়ান ?

বলিলাম—"yes, just as much as you are" (হ্যাঁ ঠিক তোমারই মত)—বলিয়া মাথার কাছে গাড়ী থামাইবার শিকলটা বাগাইয়া ধরিলাম—ব্যাটা উঠিয়াছে, কি টানিয়া—দিব--

সাহেবটা একটু হাঁসিল এবং তাহাতে কাফ্রীটা অপ্রতিভ হইয়া একটু কাশিল—একবার জানালার বাহিরে চাহিল, একবার গাড়ীর ছাদের পানে চাহিল এবং অবশেষে কোনখানে চাহিলে বেশ সপ্রতিভ দেখাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিজের নেকটাইটা খুলিয়া আবার বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সাহেব বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় আমায় সুধাইল—"টুমি বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাট আছ ?"

হঠাৎ বাঙ্গলা শুনিয়া প্রথমটা চকিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু প্রশ্নটার প্রয়োজন প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গলা ভাষা 'জ্ঞাট' হইব না কি রকম! তাহার পর বুঝিতে পারিলাম, সাহেব যে নিজে বাঙ্গলা জানেন এ কথা নমুনা দিয়া আমায় বিদিত করা হইল। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইংরাজী বাঙ্গলা মিশাইয়া উত্তর করিলাম—"পবিত্র যীশুক্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করা অবধি প্রাণপণে এই অপবিত্র ভাষাটা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি—এখনও সম্পূর্ণ সমর্থ হই নাই।...আপনি তো চমৎকার বাঙ্গলা জানেন দেখিতেছি; একেবারে প্রাণে গিয়ে লাগে। কোন বাঙ্গালীকে এমন বাঙ্গলা বলিতে শুনি নাই।"—বলিয়া চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া অন্তরের প্রশংসা জানাইলাম। শেষের কথাটা একেবারে মিথ্যা বলা হয় নাই, এইটুকুই সান্ত্বনা রহিল।

সাহেব যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। বলিল—"না, আমি কিঞ্চিটও বাঙ্গলা জ্ঞাট নহি। ইহা হয় সত্য যে বাঙ্গলা হিডেনডিগের অপাবিট্র ভাষা ছিল, কিন্তু ইহাটে বাইবেল অনুবাডিট হওয়া অবাড ইহা পবিট্র হইয়া গিয়াছে। টুমি ইহাকে স্বচ্ছণ্ডে মনে রাখিটে পার,—ভুলিবার প্রয়োজন নাই।...ডাড়াইয়া কেন, এখানে এস"—বলিয়া সামনের জায়গা হইতে টুপিটা উঠাইয়া লইল।

সাহেবের মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। কাফ্রীটার নেক্-টাই বাঁধা হইয়া গিয়াছিল, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপ্রসাদ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল। বুঝিলাম ব্যাটা নিজের ভাষায় গাল দিতেছে—আমাকেও এবং পাদ্রীটাকেও।

সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। গাড়ী গাঁক্ গাঁক্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; সাহেবের গলার আওয়াজ টবর্গ-সঙ্কুল যুদ্ধ বাঙ্গলা ঘাড়ে করিয়া তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিল। সাধারণের সুবিধার জন্য ভাষাটাকে এখানে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া লিখিয়া দিলাম—সাহেব প্রথমে একটু বাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি মিছামিছি পোষাক বদলাইয়া আসিয়াছ, না সত্য সত্য নেটিভ ক্রিশ্চান আছ ?"

আমি বলিলাম—"সত্য সত্যই আমি নেটিভ ক্রিশ্চান ব'লে মিছে-পোষাকটা বদলে এসেছি, ধর্ম্মাবতার।"

সাহেব ঠোঁট দু'টা চাপিয়া গোঁফ দাড়ি একত্র করিয়া সন্দিগ্ধভাবে একটু মাথা নাড়িল। আবার বলিল—"কি জন্য ?"

"তোমাদের কাছে অপবিত্র পোষাক প'রে আসতে লজ্জা ক'রতে লাগল।"

"হু, অপবিট্র পোষাক পরিধান করিয়াছিলে কেন ?"

"না হ'লে হিদেনরা তাদের গাড়ীতে ঢুকতে দেয় না; গরীব মানুষ থার্ড ক্লাশে ভিন্ন যেতে পারি না।"

"এ গাড়ীতে আসলেই হইত, ক্রিশ্চান গবর্ণমেন্ট তোমাকে আশ্রয়দান করিত।"

"এটা ইউরোপিয়ান গাড়ী, সাহেব—সব সময় ঢুকতে দেয় না। দয়ার অবতার তুমি ছিলে বলেই আসতে সাহস ক'রলাম।"

সাহেব হাঁসিল। অবতারে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু

বুঝিলাম এ-ক্ষেত্রে ফল হইয়াছে। আমি কালক্ষেপ না করিয়া আরও কতকগুলো ঐ-গোছের কথা জুড়িয়া দিলাম;—সাহেবের জোরার রোখ্‌টা কাটিয়া গেল, প্রসন্ন ভাবে বলিল—"তুমি প্রকৃত ক্রিশ্চান আছ। তোমার হৃদয়ে আলোক আছে,—কতদিন হইতে হইয়াছ?"

"এই অল্পদিন থেকে।"

"তোমার পিতামাতা সকলেই পবিত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন?"

মনে মনে তাঁহাদের প্রণিপাত করিয়া এবং পাদ্রীর মুণ্ডপাত করিয়া বলিলাম—"না ধর্ম্মাবতার; বরং আমি আলোকে এসেছি পর্য্যন্ত, তাঁরা সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের গাল না দিয়ে জল খান না।"

সাহেব হাঁসিতে লাগিল, বলিল—"কি বলেন?—'হে মাতা কালী, জোড়া পাঁঠা দিব, সাহেবদিগকে মারিয়া ফেল'—হাঃ হাঃ হাঃ—তাহার পর তোমাদের—তাহাদের কালীর সহিত আমাদের পবিত্র ভুতের ঘোরতর যুদ্ধ হয়—কালী হারিয়া যায়—তাহারা ম্যালেরিয়ায় মরিয়া যায়—ভুত হয়; আমরা সুখে রাজত্ব করিতে থাকি। তাঁহাদের দেবতারা চিরকালই হারিয়া যায়—ইহাকে বিজ্ঞানে বলে—"Survival of the Fittest"

আমি।—"ঠিক কথা সাহেব, বাঙলা দেশটা দেখলে তোমার কথায় আর সন্দেহ থাকে না। এমন ভুতের ওপর রাজত্ব ক'রতে কোন জাতই পারে নি। দিন দিন পবিত্র ভুতের আশীর্ব্বাদে তোমাদের প্রজাও হু হু করে বেড়েই যাচ্ছে।"

সাহেব।—হাঃ হাঃ হাঃ, তবুও তোমাদের দেশের লোক আমাদের ধর্ম্মকে চিনিতে পারে না; তুমি কি করিয়া চিনিলে?"

আমি।—"খুব বেশী মাথা ঘামাতে হয় নি; এক আঁচড়েই চেনা গিয়েছে। তারপর অসভ্য জামা কাপড়গুলো ছেড়ে, এই সুসভ্য সেজে বেরিয়ে এসেছি"—বলিয়া নিজের নূতন শ্রীতে সাহেবের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একবার

সাহেব হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'বস', 'বস'; জামাগুলা একটু ঢিলা হুচে। কে দান করিয়াছে?"

আমি।—"যে পাদ্রী সাহেবের কাছে ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড হোয়েছি তিনিই দিয়েছেন; মস্ত বড় দানী ব্যক্তি। তাঁর সবই এই রকম বড় বড় দান।"

সাহেব।—"দেখ, আমাদের ধর্ম্মে কত দয়া আছে। আমিও তোমায় ক্রিশ্চান জানতে পেরে কেমন এই বিলিতি কামরায় আশ্রয় দিয়াছি। হিন্দুদের পুরোহিত হইলে দিত?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া ফেলিলাম—"রাধামাধব"—সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা শুধরাইয়া লইয়া বলিলাম—"কখনই না"

কেন যে "কখনই না" তাহা আর সাহেবকে খুলিয়া বলিলাম না। কার্ড লাগান ইউরোপিয়ান থার্ডে পুরুত ঠাকুরের বসিবার জন্য টানিতেছেন কল্পনা করিয়া মনে মনে হাঁসিতে লাগিলাম।

সাহেব।—"আমরা আমাদের মেষ সকলকে এইরূপ ভাবে রক্ষা করি। বাহিরের শত্রু তাহার কিছুই করিতে পারে না।"

আমি।—"তাদের রক্ষা করবার জন্যেই বুঝি ওই ডালকুত্তাটা পুষে রেখেছেন, ধর্ম্মাবতার?"—বলিয়া কাফ্রীটার দিকে দেখাইয়া দিলাম, ও যাহাতে আবার চটিয়া না যায় সেইজন্য বলিলাম—"যদি ভুল ব'লে থাকি যীশুর নামে ক্ষমা ক'রবেন। আমি নূতন মানুষ আপনাদের কায়দা কানুন বেশী কিছু জানি না। তবে শেখবার ইচ্ছাটা প্রবল;—সেইজন্যেই সন্দেহ হ'লেই মিটিয়ে নিচ্ছি।"

সাহেব আমার অজ্ঞতায় হাসিয়া বলিল—"না, না, ও লোকটা কাফ্রী, অত্যন্ত রাগী আছে। আমার বাঙালী সহায়কটি অসুখে পতিত হইয়াছে, তাই ওকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। সে-লোকটা পবিত্রহৃদয়—খুব বক্তৃতা দিতে পারে এবং হিন্দুদের দেবদেবীকে খুব গালী দিতে পারে।... আজ আমারই বাঙলায় বক্তৃতা দিতে হইবে..."

আমি জিজ্ঞাসানেত্রে চাহিয়া রহিলাম, সাহেব বলিল—"আমরা পবিত্রপুরে রথের মেলায় যাইতেছি—পথভ্রষ্ট আমাদের আলোক দেখাইবার জন্য।"

বুঝিলাম—আর কিছু নয়, ইহারা মেলায় গিয়া আমাদের ঠাকুরদেবতাদের গালমন্দ দিয়া, আমাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টায় চলিয়াছে;—কোন্ না দুই একটাকে পথভ্রষ্ট করিয়াই লইবে।...মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। প্রতি মেলাতেই

এমন কতশত যায়গায় গিয়া ইহারা এমনি করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, অথচ আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি। আমরা যে মানুষ—আর নেহাৎ যে-সে মানুষ নয়—সেটা আমরা দেখাইব শুধু হুঁকা তামাক বন্ধ করিবার সময়। ইতিমধ্যে হুঁকা তামাকের মায়া কাটাইয়া কতশত আপন লোক যে পর হইয়া যাইতেছে, তাহার হুঁস্ নাই আমাদের।... হায়, যদি কোন উপায়ে আপাতত: এ যাত্রাটা পণ্ড করিতে পারিতাম, সামান্যও একটা সান্ত্বনা মনে থাকিয়া যাইত।...

এতক্ষণ অন্যমনস্ক দেখিয়া বোধকরি সাহেবের সন্দেহ হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি চিন্তা করিটেছ?"

"বলিলাম একটা কথা ভাবছিলাম, ধর্ম্মাবতার; কিন্তু ব'লতে মোটেই সাহস হ'চ্ছে না"

"আমি সাহস দিতেছি, বল; কাফ্রীকে এত ভয় কেন?

"কাফ্রীকে ভয় নয়, ধর্ম্মাবতার; তোমার মুখে বাঙ্গলা বক্তৃতা শোনবার বড় লোভ হচ্ছে, যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নাও..."

সাহেব উল্লসিত হইয়া উঠিল; বেঞ্চের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল—"নিশ্চয় যাইবে, নিশ্চয় যাইবে। আমার বাঙ্গলা জানের জন্য গোল্ড মেডেল অর্থাৎ স্বুবর্ণ তক্মা আছে। আর তোমায়ও আমার বাঙ্গলা সহকারীর স্থানে বক্তৃটা দিটে হইবে। বাইবেল জানা আছে টো?"

"তা' আর নাই!"—বলিয়া jesus christ the son of David the son of Abraham. Abraham begot Issac থেকে সুরু করিয়া ইজ্‌রেলাইট ইস্‌মেলাইট প্রভৃতি বাইবেল প্রসিদ্ধ কতকগুলা জাতির কুলুজি গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গেলাম। মিশনারি কলেজে পড়ি—ঔষধ-গেলা করিয়া বাইবেলের অনেকটা মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

সাহেবের চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল আমায় একটি রত্ন বিশেষ ঠাহরাইয়াছে, আমিও তাহার রাশি রাশি প্রমাণ দিয়া যাইতে লাগিলাম। শেষে এমন হইল যে কোথায় আমিই খোসামোদ করিব, না সেই আমার হাত দুইটা ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল,—"শুধু আজ বক্তৃটা দিলে চলিবেনা এনফ্রেণ্ড্ গোসা; তোমায় আমাদের মিশনে থাকিটে হইবে; আমি কোনমতে ছাড়িব না..."

আমি বলিলাম—"আমাকে সর্ব্বদা কষ্ট ক'রে ধ'রে রাখতে হবে না সাহেব—মিশনে থাকা তো পরম সৌভাগ্য, কটা খ্রীশ্চানের ভাগ্যে ঘটে? তবে ওরকম রাগী কাফ্রী, সেখানে কজন আছে জেনে রাখা দরকার।"

"ও ব্লাক (কেল্টে) তোমার কি করিতে পারে?—আমি রক্ষা করিব তোমায়"—বলিয়া সাহেব কাফ্রীটার দিকে একটা নির্ম্মম দৃষ্টি হানিল।

কাফ্রীটাও প্রায় সেই রকম ভাবেই দৃষ্টিটা ফিরাইয়া দিল। খুব চটিয়া গিয়াছে। আমার দিকে যা চাহিল সে আবার আরও তীব্র। আমি তাহার মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলাম—"তা' হ'লে ধর্ম্মাবতার, বোধ হয় এখন থেকেই রক্ষা করা আরম্ভ করতে হয়..."

কাফ্রী আমারই মত কাল বুকের ভিতরে যে হৃদয়টা আছে, তাহাকে রক্ষা করিয়া মনে মনে বলিলাম—'ভাই, লাঞ্ছনায় আমরা সব কালোই আজ এক, এ অনুগ্রহটা ক্ষণিক—এই তোমার উপর ছিল, এই আমার উপর হইয়াছে। তবে যুগব্যাপী গোলামির পরও তোমরা এখনও যে কড়া নজরটা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে পারদেখিতেছি।—তবু ভাল।

(২).

এই সব কথাবার্ত্তা—চিন্তার মধ্যে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। পাদ্রী সাহেব ঠাকুরদেবতাদের উপর যে বাক্যবান সব ছাড়িতে লাগিল সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া কাহারও দৃষ্টি কলুষিত করিতে চাহি না। নিজে মুখটি বুজিয়া শুনিয়া গেলাম, অনেকটা শোনা অভ্যাসও আছে। মনে মনে বলিলাম—'তেত্রিশ কোটির মধ্যে একজনেরও যদি তিলার্দ্ধও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে তো শুনিয়া রাখ।—বিশেষ ক'রে হে মা কালি, তোমারই উপর দেখ্‌ছি বড আক্রোশ ব্যাটার—রাতারাতি একটা বিলি করো। কোন হিন্দু হ'লে মিনতি করতাম না মা, তুমি নিজেই ওপর পড়া হ'য়ে ব্যবস্থা করতে,—এর সিকি ভাগও ব'লে রেহাই পেতনা..."

ষ্টেশন হইতে গোবিন্দপুর পাকা তিন ক্রোশ। একটা প্রসস্ত পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে,—গাড়ী থামিবার কয়েক মিনিট পরে তাহার জনস্রোতে বান ডাকিল। নামিয়া

দেখিলাম ছোটবড় রাস্তাদিয়া, ক্ষেতের আল দিয়া, পিঁপড়ার সারের মত উত্তর দিকে লোক চলিয়াছে। দেবতা আজ পথে নামিয়াছেন, আমার হিন্দু আত্মা এই উদ্ভট বেশের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত পাখা ঝাপটাইতে লাগিল। মনে হইল এই প্রবঞ্চনা ছাড়িয়া ঐ সব ছোটবড় যাত্রীর সাথে আজ পথিক দেবতার সঙ্গ লই। কিন্তু মাথায় দুষ্টামির প্ল্যানটা জাঁকিয়া বসিয়াছিল এবং অনেকদিনের লাঞ্ছনার শোধ লইবার লোভটাও অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িল, সুতরাং সাহেবের সঙ্গেই থাকিয়া গেলাম এবং আপাততঃ তাহারই কথায় সায় দিয়া চলিলাম।

কাফ্রী জিনিষপত্র নামাইতেছিল। সাহেব একবার চারিদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অনেক পথভ্রষ্ট আত্মা।"

আমি বলিলাম—"উঃ, আত্মার গাঁদি লেগে গেছে একেবারে, পথ চলা দায়।"

সাহেব।—"একটা গাড়ী দরকার"

আমি।—"খুব বেশী রকম, বিশেষ ক'রে আমায় লুকুবার জন্যে ; দেখছেন না কি রকম ঘিরে ফেলেছে"—কথাগুলা ইংরাজিতে বলিলাম।

সাহেব হাঁসিয়া ফেলিল ; ইংরাজিতেই বলিল—"মিশনে ফিরিয়াই তোমার একটা ভাল সুট করাইয়া দিতে হইবে।... তোমরা সকলে কি দেখিতেছ, দশহস্তযুক্তা দুর্গা আছি, মহাদেবের বুকে কালী আছি, না দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গনেশ আছি ?"—একথাগুলি বাঙ্গলায় দর্শকদের প্রতি বলা হইল।

আমরা তিনজনে, তাহার মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া আমি যে, কি এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাদের অভ্যুদয় তাহা লইয়া নানান রকমের মতামত জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। একটা দজ্জাল গোছের মাগীই বেশীরকম অভিমত দিতেছিল ; সাহেবকে ভেঙাইয়া বলিল—"দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গনেশ আছি মুখে অগুন, মা আবার তোমায় ছেলে ক'রবেন।...আমি বল্‌, এরা খিস্তখিষ্টের দল, রথে ঠাকুর দেবতাদের গাল পাড়্‌তে এয়েচে, তা তোমরা তো শুনবেনি। ওরা ঐজন্যে কোম্পানিথে' ট্যাকা পায়গো।—ঘেন্নার কথা বল্‌বো কাকে, আমার গদার বাপকেও তো একরকম কলমা পড়িয়ে নিছ্‌লো—আমি সেই মেয়েমানুষ কিনা—মিন্সেকে ঝাঁটার মুড়ো দিয়ে আবার জেতে-তুলেচি।...তুই আবার কার কুল মজিয়ে এয়েচিস্‌রে ছোঁড়া। আহা কিবে মানিয়েছে—একে বেড়াল কালো, তায় গাং সাঁতরে এলো..."

বলা বাহুল্য এই গাং-সাঁতরান বেড়াল আমিই। গদার বাপের হেফাজতের কথা স্মরণ করিয়া আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ঝুকিয়া পড়িয়া অতি ভালমানুষের মত সাহেবের একটা বাক্সের তালা গভীর মনোনিবেশের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সাহেব এই ছাঁকা বাঙ্গলার সব বুঝিতে না পারিলেও অস্বস্তির সহিত ইংরাজীতে বলিল—"চল, আমরা গাড়ী ঠিক করিয়া রাখি ; জোসেফ কুলি দিয়া সব লইয়া আসিবে।

আলোচনা জোর চলিতেছে এবং সেই মাগীটা হাতমুখ নাড়িয়া, তাহার 'গদার বাপ'—এর কলমা পড়ার অথরিটিতে খুব ব্যাখ্যানা করিয়া যাইতেছে। কে একজন বুঝি কাফ্রী জোসেফের কুলশীল সম্বন্ধে সংসয় জানাইয়াছে ;—গদার মা বলিল—"তা কেন হবে ?—আহা ও-ও আমার গদারই মত কোন বাঙ্গালী মায়ের নাড়ী-ছেঁড়া দুলাল গো, এখন শোর গরু খেয়ে ওরকম চোয়াড় মেরে গেছে। হ্যাঁগা, তা যাবে নি ? এই তো আমার শরীল দেখছ, ভাবছ মাগী কি ক্ষীর ননীই না খায় ; বলতে নেই—তা যদি জাত খুইয়ে অখাদ্যি কুখাদ্যি খেতাম তো তোমরা কি ত্যাখ্‌ন ব'লতে পারতে—'এই সেই গদার মা গো..."

সাহেব গদার মাকে ভয় পাইলেও বোধ হয় স্বভাবের দোষে তর্কের লোভটা সংবরণ করিতে পারিল না। বিশেষ করিয়া এই একটু আগেই, সে আমার কাছে আলোকপ্রাপ্ত গদার বাপের আবার অন্ধকারে ফিরিয়া যাইবার রোমাঞ্চকর ইতিহাসটী শুনিয়াছিল।—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কি জন্য শুয়ার গরু খাইবে না ? ঈশ্বর ফল সৃষ্টি করিয়াছেন, মাছ সৃষ্টি করিয়াছেন—গরু শুয়ারকেও সৃষ্টি করেন নাই ? টাহারা কি অপরাধ করিয়াছে ? টোমাদের অসভ্য, পক্ষ-পাতী ধর্ম্মে..."

গদার মা নিজের দলের দুই তিন জনকে সাক্ষ্য মানিয়া বলিল—"দেখ বৈরিগী ঠাকুর, দেখ ঘোষের পো, দেখ্‌

কালবৌ—কথাগুনো একবার শুনে থুস্—এ নাগাদ ক্ষেমী বাগ্দিনীর ধর্ম্মে কেউ হাত দিতে হেম্মৎ করেনি; যদি এর নেয্যো জবাব দি, তোরা গাঁয়ে গিয়ে রটাতে পারবি নি, ক্ষেমী মদ্দ সেজে সাহবের সঙ্গে নড়াই ক'রেছে...”

এ'দিকে ঠাকুর্দ্দার কাঁধে চড়িয়া একটা সাত আট বছরের ছোঁড়া অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত আমাদের পরিচয় লইতে-ছিল। তাহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর্দ্দা বলিল—“ও সাহেব, আমাদের রাজা; সেলাম ক'রতে হয়” ছোঁড়া—“সাহেব সেলাম” বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, তাহার পর আমার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—“আর ওটা কি!”

ঠাকুর্দ্দা একটা সদুত্তর খুঁজিতেছিল। সেটা আমার পক্ষে সুশ্রাব্য হইবে না জানিয়া আমি সাহেবের জামায় একটা টান দিয়া ইংরাজিতে বলিলাম—“ও একটা অক্ষর জ্ঞানহীন মেয়েমানুষ, অত সূক্ষ্ম তর্ক কি বুঝ্‌তে পারবে?—চলুন আসুন...”

“ওদিকে জোশেফ হাঁড়িপানা মুখ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে জিনিসপত্র সুশৃঙ্খলায় নামাইবে কি, সেখানেও একপাল লোক গাড়ীর দরজা ঘেরিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—গতিক দেখিয়া বোধ হইল ‘গদার মা' গোছের কেহ যেন ছিল।

সাহেব বলিল—“সব পুঁটলিগুলা নামান হইয়াছে।”

জোসেফ পুঁটলিগুলার দিকে না দেখিয়াই বলিল—“হাঁ হইয়াছে।”

“তা হলে কুলির মাথায় করিয়া ঐখানে লইয়া এস—আমরা গাড়ী করিগে—” বলিয়া সাহেব আমায় লইয়া ষ্টেশনের বাহির হইয়া আসিল। কতকগুলি লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল, কতকগুলা গদার মার লেক্‌চার শুনিতে শুনিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল...কতকগুলা জোশেফের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বেশীক্ষণ আর বিলম্ব হইল না; একটু পরেই আমাদের গাড়ী মেলার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল; যতই অগ্রসর হইতে লাগিল লোকের ভিড় ততই পুরু হইতে লাগিল। গরমে, ঘামে, ধুলায় কিম্ভূতকিমাকার হইয়া জোশেফ ঢুলিতে লাগিল এবং এক একবার তন্দ্রার ঝোঁকে সাহেবের বিপুল পেটে ঢুঁ মারিতে লাগিল; কিম্বা প্রেমিকের মত আমার ঘাড়ে হেলিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাড়া খাইয়া ক্ষণিকের জন্য সচকিত হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। কলির কুম্ভকর্ণ!

সাহেব উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িল, জোশেফের বজ্রসম মস্তক হইতে নিজের ভুঁড়িটাকে বাঁচাইবার জন্য হাতের একটা আগল সৃষ্টি করিয়া বলিল—“I never knew a Christian could sleep under these conditions.

(কোন ক্রিশ্চান যে এ অবস্থায় ঘুমাইতে পারে তাহা জানিতাম না)। শেষে হাতের আগলেও যখন বাগ মানিল না, একটা জবরদস্ত ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং যাহাতে জাগ্রত থাকে সেই উদ্দেশ্যে বলিল “বইয়ের পুঁটুলিটা বাহির কর এবং কয়েকমিনিট অন্তর তিন চার খানা করিয়া কাপি রাস্তার লোকেদের বিলাইতে বিলাইতে চল”—আমার দিকে চাহিয়া বলিল “ইহাতে রট্ বেচো কলা দেখা দুইই হইবে।” নিজের বাঙ্গলা জ্ঞানের গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; আমিও জ্ঞানের বহর দেখিয়া হাঁসিতে লাগিলাম।

জোশেফ মুষ্টিদ্বয় কোলের উপর রাখিয়া সাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাহেব বলিল—“কথাটা কাণে গেল? পুঁটুলিটা খোল; কোথায় রাখিয়াছ!”

“গাড়ীর বাক্সের উপর”

“ঘোঁড়ার গাড়ীর ওপরটাকে বাক্স বলে না, ছাট বলে। বস্তা রাখিলেই সেটা বাক্স হইয়া যায় না। জ্বালাটন!... যাও লইয়া এস কোচম্যানকে দাঁড়াটে বল।...এই খাড়া হোও।”

জোশেফ সেই শূন্য দৃষ্টিতে সমস্তটাই শুনিয়া গেল। তাহার পর বলিল “রেল গাড়ীর বাক্সের উপরই আছে, তাড়াতাড়িতে নামান হয় নাই।”

সাহেব লাফাইয়া উঠিল “কি সর্ব্বনাশ! নামান হয় নাই? পাঁচশত বই গাড়িতে রহিয়া গেল! “লেক্‌চার দিয়া আজ কি ফল হইবে? লোকে বই না পাইলে কেন একত্র হইবে, কেন বিশ্বাস করিবে! বই নামান হয় নাই! কিসের এত টাড়াটাড়ি ছিল? কখন টের পাইলে?...”

“গাড়ী ছাড়িয়া গেলে।”

"গাড়ী ছাড়িয়া গেলে ? বলিতে লজ্জা করিটেছে না ? এটক্ষণ বলা হয় নাই কেন শুনি ।"

"বলিব বলিব করিতেছিলাম"-

"শুনছ এলফ্রেড্ গোসা ? উনি যে এটক্ষণ নাক ডাকাইয়া টোমার আমার ঘাড়ে পড়িটেছিলেন ওটা ঘুম নয়। ভাবিটেছিলেন কথাটা কি করিয়া বলি ; এমন গর্দ্দভ আর দ্বিতীয়টা দেখিয়াছ ? জানোয়ার ; ক্রিশ্চানিটিকে ইহারা কলঙ্কিট করিয়াছে। একটুও অনুতাপের ভাব দেখিটে পাইতেছ। আবার চেহারা দেখিটেছ ?"

—"যেন—যেন..."

সমস্ত রাস্তা পাদ্রী সাহেব ক্ষিপ্ত ভাবে এই রকম বকিতে বকিতে চলিল। কাস্ত্রীটার উপর ইহার কি ফল হইল ভাল বোঝা গেল না—কারণ সে খোলা জানালার মধ্য দিয়া হাত দুইটা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার উপর থুথ্‌নিটা চাপিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাতে তাহাকে অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখাইতে লাগিল বটে ; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার মাথাটা যেরূপ জানালার ফ্রেমে ঠুকিয়া যাইতে লাগিল তাহাতে আমার যেন বোধ হইল সে অনুশোচনার সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিব্য নিদ্রা যাইতেছে।...

মেলায় গিয়া আমরা প্রায় পাঁচটার সময় পৌছিলাম। অত্যন্ত ভিড়—"ন স্থানম্ তিলধারয়েৎ।" আমাদের গাড়ী গিয়া মেলার বাহিরে একটা ঝাঁকড়া গাছতলায় দাঁড়াইল। পাদ্রীসাহেব তাহার পরদিন ভোরে বাসায় পৌঁছিবে, সুতরাং কতকগুলা লটবহর ও একটা ছোট্ট তাঁবু পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। জোসেফ লোক দিয়া তাঁবু খাটাইয়া জিনিস-পত্রগুলা ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল। আমরা মুখ হাত ধুইয়া, পোষাকের ধুলা ঝাড়িয়া, ঠাণ্ডা হইয়া গাছের শেকড়ের উপর বসিলাম। সাহেব একটা লেমনেড পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল;—চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আচ্ছা কি করিয়া বক্তৃটা দিব বলত। ইহা মোটে আমার এই তৃতীয়বার বক্তৃটা দেওয়া হইবে। অবশ্য আমার বাঙ্গলা জ্ঞানের জন্য মেডেল..."

আমি বলিলাম—"আমি কি এতটা একসঙ্গে এসেও সে পরিচয় পাইনি সাহেব ? মেডেলটা অক্সফোর্ড দিলে, না কেম্ব্রিজ ? ওঁরা আজকাল বড় বড় বাঙ্গলা বলার বের করেছে।...হাঁ, বক্তৃতার কথা ;—সকলের চেয়ে আগসই হবে আগে ওদের ঠাকুরদেবতাদের আজগুবি আজগুবি কীর্ত্তিগুলা সোজাসুজি ব'লে যান ; তারপর—একধার থেকে সমালোচনা, চুটিয়ে একেবারে ; তাহলে যারা শুনবে তাদের মধ্যে কম লোককেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর যদি আগে থেকেই ওদের ঠাকুর দেবতাদের গালমন্দ সুরু করে দেন তো সব ভড়কে যাবে। আমি ঠিক এই রকম সাজন্ বক্তৃতা শুনেই তো আলোকে এসেছি।...সে ছিল রেভারেণ্ড উড্ সাহেব,... বাঙ্গলায় ডাকলে 'উদো' বলে ডাকবেন—ভাল বাঙ্গলাও জানত না—আর আপনার মুখে যা বাঙ্গলার তোড় শুনলাম ......ইত্যাদি।

তোড়টা আবার নামিল। অনেক স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল,—অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর। সাহেব বক্তৃতা দিতে সুরু করিয়া দিল। আমি উঠিবার সময় আর একবার টুকিয়া দিলাম—"দেখ্‌বেন যেন প্রথমেই গাল দিয়ে আরম্ভ করবেন না, আর বাঙ্গলাটা খুব শুদ্ধ হওয়া চাই"—মনে মনে বলিলাম যাহাতে একবর্ণও কেউ বুঝতে না পারে।

বক্তৃতা—"ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, (একটি সভ্য স্ত্রীলোক বলিল—চল্ তাঁতিবৌ ; বন্ন গাল পাড়বে) আপনারা যে হষ্ট পডহীন ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ ডেবটার ডর্শন করিটে আগট করিয়াছেন সে কে আছে ? টাহার বাল্যকালের ইটিহাস বর্ণনা করিলে টাহা আপনাডের ভক্টির মূলে কুঠারাঘাট করিবে। প্রঠমট আপনাদের বিচার বুড্ডি প্রয়োগ করিয়া ডেখুন এই ডেবটা কে আছেন। আপনাডের বলা বাহুল্য যে এই অড্‌ভুট ডেবটাটি আপনাডের শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যিনি বাল্যকালে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ড্বারা গোবর্ধন ঢারণ করিয়াছিলেন। হাঃ হাঃ—গোবর্ধন ঢারণ করিয়াছিলেন। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আমি কি আপনাডিগকে প্রশ্ন করিবার স্বাধিনটা লাভ করিটে পারি যে যাহার হস্ট ডুইটাই কটিট টাঁহার আবার অঙ্গুলী আসিল কোঠা হইটে ?...এ প্রশ্নের উট্টর আপনারা ডিটে পারিবেন না কিন্তু আমি পারিব। এই কৃষ্ণ নামক ডেবটা বাল্যকালে এট ডুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, সে বড় হইয়া পূজার লোভে উহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় চেহারা বডলাইয়া ফেলিটে হইয়াছে...

আমি উঠিয়া একান্তে ইংরাজিতে বলিয়াছিলাম—'সাহেব, সমালোচনা পরে হবে, এখন এক এক ক'রে আজগুবি গল্পগুলা সোজাসুজি শুনিয়ে যাও, যেমন কংশবধ, পুতনাবধ, বিশ্বরূপ দেখান, কালীয় দমন—এই সব'

—ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, আসুন আমরা প্রঠমে সযত্ন সহকারে ডেখিবার চেষ্টা করি, এই দুই রকম চেহারার অড্‌ভুট্‌ ডেবটা বাল্যকালে কি কি কীর্টি করিয়াছিল। এই অণ্ঢকার ডেবটার জন্ম হইয়াছিল এক অণ্ঢকার রাট্রিতে। আমাডের ট্রাণকর্টা খৃষ্টের যে জন্ম হইয়াছিল টাহার টারিখ লিখিট আছে; কিন্টু কৃষ্ণের কী টারিখ আছে?—কি অকাট্য প্রমাণ বর্টমান আছে টাহার জন্মের? (আমি জামার খুটটা একটু টানিয়া দিলাম) আচ্ছা সে ইতিহাসের কথা পরে পর্য্যালোচনা করা যাইবে। যে সময় বসুডেব সড্যজাট কৃষ্ণকে বক্ষে লইয়া ভীরুর ন্যায় নণ্ডর গৃহে পলাইটে ছিল সেই সময় হইটেই যট অসম্ভব অসম্ভব ঘটনা বেচারী পৃথিবীটে সংঘটিট হইটে আরম্ভ হইল। টাহাকে বৃষ্টি হইটে ট্রাণ করিবার নিমিট্ট বাসুকী সহস্র মুখের ফণা বিষ্টার করিয়া পিছনে পিছনে পশ্চাট্‌গমন করিটে লাগিল। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, আমি সট্বর আমাডের পবিট্র চর্ম্মপুষ্টক হইটে ডেখাইটে চেষ্টা করিব যে এই সর্প অটি ক্রুড় জাটি।—সয়টান সর্পের রূপ...” (আমি নিরস্ত করিবার জন্য জামাটা টানিয়া দিলাম)...“আসুন এইবার আমরা নণ্ডের গৃহে প্রবেশ করি—” (একটা বুড়ী বলিল—'শোন কথা, নন্দের জাত মারবে নাকি!—যত সব...) “সেখানে হটভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ রাজার টনয় হইয়া গরু চড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। কঠায় বলে টুমি যাও বঙ্গে, টোমার কপালও পশ্চাটে পশ্চাটে গমন করে। বাসুকী বৃষ্টি হইটে রক্ষা করিটে পারে কিন্টু অডৃষ্ট হইটে এক আমাডের ট্রাণকর্টা ভিন্ন কে পরিট্রাণ করিবে? ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, গয়লা অটিশয় ভয়ঙ্কর জাটি। আমাকে যে গোবর্ডন গয়লা ডুগ্ধ বিক্রয় করে সে ঈশ্বরের নামে শপঠ করিয়া বলে যে আমার নিমিট্ট চারিসের রেটে সে-ডুগ্ধ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না এবং আমার কুকুরের জন্য ডশসের রেটে যে ডুগ্ধ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না! অঠচ যডি মডীয় ডুগ্ধ ক[illegible]নদিন খারাপ প্রমাণিত হয় টো কহে বোট হয় ভুলক্রমে সেই কুকুরের ডুগ্‌ঢ পান করিয়াছি। একডিবস অত্যন্ত ক্রুড্ঢ হইয়া আমি টাহাকে চাবুক আঘাট করিয়াছিলাম। ইহাটে টাহার বৃড্ঢা ভগ্নী ও যুবটী পট্নী আমার প্রাচীরের বাহিরে ডণ্ডায়মানা হইয়া যে প্রকার বিবিধ অঙ্গসঞ্চালন সহকারে অসভ্য গালী ডিটে লাগিল টাহাটে বুঝা গেল যে স্ত্রীগয়লারাও (আমি জামার খুট ধরিয়া টানিয়া দিলাম)...“ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, ইহা হইটে স্বচ্ছন্দে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই গয়লা স্ত্রী পুরুষডিগের মধ্যে ঠাকিয়া ও টাহাডের বালক বালিকাডের সঙ্গে মিশ্রিট হইয়া চরিট্র হারাইয়া ফেলিল এবং অট্যণ্ট ডুর্ড্ডাণ্ট এবং বখাটে ছোকরা হইয়া দাঁড়াইল। বিষক্ট বৃক্ষ রোপণ করিলে টাহাটে কি উট্‌পাডিট হয়?—কণ্টক উটপাডিট হয় এবং বিষাক্ট ফল উটপাডন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ডুষ্ট হইয়া পড়াশুনা করিল না, ক্ষীর ননী চুরি করিতে লাগিল, প্রটিডিন চরিট্র হারাইটে লাগিল।—টাহার খারাপ চরিট্রের বৃক্ষে কি ফল উট্‌পাডিট হইল।—জল-কেলী এবং বষ্ট্রহরণ;—উঃ লেডির বষ্ট্রহরণ!—আমাডের শ্বেটডিগের লেডি হইলে শ্রীকৃষ্ণকে শুট্‌ করিট। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, গয়লারা একটি ভয়ঙ্কর জাটি।—বিডেশী ভালমানুষেরা টাহাডের ডবল ডাম ডেয় টঠাপি টাহাদের ডুগ্‌ঢে জল মিশ্রিট করে; স্ত্রীগোয়ালারা টাহাডের কুটসিট গালি ডেয়, অঠ্চ শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের মহিলাডের বষ্ট্রহরণ করা সট্বেও টাহাকে পূজা করে, ভক্টি করে। আমি কি ন্যায়হীন কার্য্য করিয়া ছিলাম যে মডীয় গয়লার বৃড্ঢা ভগ্নী এবং যুবটীপট্‌নী একট্র হইয়া...” (আমি জামার খুট্‌ টানিলাম)...ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, শ্রীকৃষ্ণের অট্যাচার অনলে বৃণ্ডাবন প্লাবিট হইয়া গেল। ঘরে ঘরে ক্রণ্ডনের অট্টরোল উঠিট হইটে লাগিল। গোপীকারা বিরহানলে কাঁডিটে লাগিল।—শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের সবাইকে কঠাডিয়া কঠা রাখিটে পারিল না। টাহাডের স্বামীরা স্ত্রীডের ব্যবহারে কাঁডিটে লাগিল। পুটনা নামক রাক্ষস-বটুকে শ্রীকৃষ্ণ লজেন্সের ন্যায় চুষিয়া মারিয়া ফেলিল বলিয়া টাহার বিটবায়ুক্ত স্বামী এবং সণ্টানেরা কাঁডিতে লাগিল। হায়, হায়, সে কি ডৃশ্য! ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোডয়গণ, এরূপ ডুর্ডাণ্ট ছেলে ঠাকিলে কখন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে? এই নিমিট্ট কংশমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে

হট্যা করিবার জন্ত চেষ্টা করিটে লাগিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ কংশের কে ছিল? ভগ্নীরপুট্র, ভাগিনেয় ছিল; টঠাপি কি জন্ত ইহাকে হট্যা করিটে চেষ্টা করিল?—কর্টব্য পরায়ণের জন্ত। শ্রীকৃষ্ণ যড্যাপি আমাডের খেটডিপে জন্মগ্রহণ করিট টাহা হইলে টটট্য লোকেরা কাহার পূজা করিট?—কংশমহারাজের পূজা করিট; যেহেটু টাহার অট্যণ্ট কর্টব্য জ্ঞান প্রবল ছিল। সে টুলাডণ্ডের একডিকে কর্টব্যপরায়ণটাকে বসাইল, অপরডিকে ভগ্নীর পুট্র-ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণকে বসাইল; কর্টব্যপরায়ণটা ভারী হইয়া গেল..."

বলা বাহুল্য লোকে সাহেবের বক্তৃতার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। চারিদিকে যেমন সং তামাসা দেখিয়া বেড়াইতে ছিল সেইরূপ ভাবে এইখানেও আসিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া, একটু শুনিয়া, কতকটা রুচি অনুযায়ী অভিমত দিয়া আবার ভাসিয়া পড়িতেছিল;—কারণ এখানে সংএর কোন অভাব তো ছিলই না, বরং বেশ একটু নূতনত্ব ছিল। অবশ্য এমনও অনেকজন ছিল যাহারা অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া মন দিয়া শুনিতেছিল। তাহাদের অনেকেই সেই জাতীয় ভাবুক বৈষ্ণব যাহারা কৃষ্ণনাম শুনিলেই—আত্মহারা হইয়া পড়ে। বাল্য লীলা কথন হইতেছে,—তাহাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। সেখানে একটু আধটু বুঝিতে পারিতেছে—"আহা হা হা" করিয়া উঠিতেছে; যেখানে মোটেই বুঝিতে পারিতেছে না আরও আবেগের সাহত "ওহো হো হো" করিয়া উঠিতেছে। অনেকে পাদ্রীর এ-সুমতি হইল কেন বুঝিতে পারিতেছে না, অনেকে প্রভুর ইচ্ছা বলিয়া মিমাংসা করিয়া লইয়াছে; আবার অনেকে 'পাদ্রী' বলিয়া যে আলাদা একপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের জীব আছে তাহার খবরও রাখে না সুতরাং তত্ত্বের দিকে না গিয়া দিব্য বাল্যলীলা শুনিতেছে। আমার, যতটা সম্ভব ইহাদের দিকেও কাণ আছে, আবার পাদ্রীর কথাও শুনিতেছি এবং প্রায়োজন মত তাহার জামার খুটটা টানিয়া বক্তৃতার মোড় ও ফিরাইয়া চলিয়াছি।... পাদ্রী বলিয়া চলিয়াছে "কর্ত্তব্যপরায়ণটা ভারী হইয়া গেল, টখন কংশমহারাজ মনষ্ঠ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের আর নিষ্টার নাই। এবং ক্রোটে ক্ষিপ্ত হইয়া আহার নিদ্রা ট্যাগ করট: গালে হাট্ দিয়া চিন্তা করিটে লাগিলেন... •

কারণ কিছু সময় পর্যন্ত কংশবধের কাহিনীটা একটানা চলিবে, এবং আমার জামা টানিবার দরকার হইবে না।... সাহেব মাথা নাড়িয়া ঘুঁষি চালাইয়া কংশের সভাঘটিত ব্যাপার বর্ণনা করিতে লাগিল...।

কাফ্রীটা সেই আধ-হাত তাঁবুর মধ্যে মহা আনন্দে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। আমি সাহেবের অজ্ঞাতসারে তাহার নিকটে গিয়া নীচু গলায় ডাক দিলাম—"জোশেফ।"

কোন উত্তর নাই।...আমি ফিরিয়া দেখিলাম সাহেব খুব গর্জ্জন করিয়া বক্তৃতা দিতেছে,—আমার আওয়াজ তাহার কাণে পঁহুছিবে না।—আর একটু জোরে ডাকিলাম—"জোশেফ। মিষ্টার জোশেফ!!"

উত্তর দিতে জোশেফের দায় পড়িয়া গিয়াছে। তখন বাধ্য হইয়া ভয়ে ভয়ে একটু ধাক্কা দিতে হইল। জোশেফ একেবারে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"what is it, fire?—আগুন লেগেছে নাকি?

ঠেলা দিয়াই আমি দুই পা পিছাইয়া গিয়াছিলাম; সেইখান হইতে উত্তর করিলাম—"না, সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন। তোমায় এই বইগুলা বিলি করবার হুকুম হ'য়েছে।"

জোশেফ সাহেবকে একটা গালদিয়া বলিল—"সে আপদ তো চুকে গিয়েছিল, আবার কোথা থেকে এল?"

আমি সেকথার উত্তর না দিয়া বলিলাম—"আর কিছু হিদেনদের দেবদেবীর ছবিও এইসঙ্গে আছে—ওদের আকর্ষণ করিবার জন্ত বিলি করে দিতে ব'লেছেন"

জোশেফ কিছু সন্দেহ করিল না; গর্ গর্ করিতে করিতে পুঁটুলিটা তুলিয়া লইল। সাহেবের একেবারে সামনা সামনি যাহাতে না পড়ে সেই জন্ত বলিয়া দিলাম—"আর দেখ, ঐ কোনটাতে গিয়ে বিলি ক'রতে আরম্ভ কর,—এদিকে আরম্ভ করলে সাহেবের বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে,—একে তোমার ওপর ভয়ানক চ'টে র'য়েছে..."

সাহেবকে কিছু বলিতে না পারিয়া জোশেফ সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাকেই চোখ রাঙাইয়া বই ছবি বিলি করিতে গেল।..."

সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কংশবধ হইয়া গিয়াছে তখন কালীয়-দমন চলিতেছে। ঠিক কোনখানটা

ব্যাখ্যান হইতেছে বোঝা গেল না, কারণ সাহেব গোবর্দ্ধন গয়লার 'বৃড্ঢা ভগ্নী' এবং 'যুবটী স্ত্রী'র কথা আবার পাড়িয়া বসিয়াছে, বলিতেছে—"ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লা অটি ভয়ঙ্কর জাটি;—অড়াই ষ্টেশনে একটি 'গডার মা' নামক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইল, সে নিশ্চয়ই গয়লা কারণ টাহার অঙ্গসঞ্চালন এবং ভাষা প্রয়োগ আমার ডুগ্ধ বিক্রেটা গোবর্ধন গয়লার বৃড্ঢা ভগ্নী এবং যুবটী স্ত্রীর অনুরূপ, এবং সে নিজের পটিকে—যাহাকে টোমরা পটি-ডেবটা বল টাহাকে ঝাঁটা মারিয়া আমাডের পবিট্র ডর্ম্ম হইটে ভ্রষ্ট করিয়াছে…"

বেশী বেলাও নাই, তাহা ভিন্ন সাহেবের এইরূপ গয়লা প্রীতির নিদর্শনে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না;—আমি সাহেবের জামার খুঁট ধরিয়া একটু জোরে টান দিলাম। সাহেব এমন রুচিকর বিষয়টির মাঝখানে ক্রমাগতই বাধা পাইয়া বিরক্তভাবে আমার পানে তাকাইল। আমি মিনতির সহিত কহিলাম—'বলছিলাম, দুরাচার গয়লাদের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শেষ হ'য়ে গেলে নেমে আসবেন কি?—আমায় ও একটু বলতে বলেছিলেন; আর বেলা নেই, তাই মনে ক'রে দিলাম—"

সাহেবের বিরক্তিটা কাটিয়া গেল, বলিল—"টাহা হইলে এইবার—সমালোচনা করা উচিট্—টুমি পারিবে কি?—ডেবটাডের খুব গালাগালি ডিটে জান?"

আমি উত্তর করিলাম—"নিজের প্রশংসা করাটা ক্রিশ্চানের পক্ষে শোভা পায় না সাহেব, তবে এইটুকু ব'লতে পারি, রেভারেণ্ড উড্ সাহেব এই জন্যেই এই স্যুটটা পুরস্কার দিয়েছিলেন—"

সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"টবে উঠ, there is a good boy (খাসা ছোক্‌রা)।—খুব গাল-গালি ডিবে, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এবং কালীকে। আমি অট্যান্ট ক্লান্ট হইয়াছি; একটু টাটকা হইটে যাই…"

আমি বাক্সটার উপর দাঁড়াইয়া ঘরোয়া বাঙ্গলায় বলিতে লাগিলাম—"ভাই সব, পাদ্রী সাহেবের মুখে তোমরা বৃন্দাবনের সেই ননীচোরা আর গোপীমনোহরার ছেলেবেলার কীর্ত্তির কথা শুনলে। এখন আমার ওপর সাহেবের ফরমাস হয়েছে, তাঁকে গালাগালি দিতে হবে। বেশ, মনিবের হুকুম, আমি এই উঠেছি; কিন্তু কি গালাগালি দোব—তাঁকে! তোমরা সব একবার ব'লে দাও ভাই। সাহেব খোদ যাঁকে গাল দিতে উঠে হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁকে বাঙ্গালীর ছেলে আমি, কি গালাগালি দোব? গাল দিতেই তো এসেছিলাম:—কথা ছিল পাদ্রীও গাল দেবে, আমিও গাল দোব, আর ঐ যে তোমাদের সত্যনারায়ণ-কথা, মনসার-কথা আর দেবদেবীর ছবি বিলুচ্ছে ও-ও গাল দেবে, কিন্তু সে আর হোল কৈ? কোথা থেকে মা স্বরস্বতী পাদ্রীর ঠোঁটে এসে বসে' সব গোলমাল ক'রে দিলেন? গালাগাল দোব কি?—আজ কতদিন পরে যমুনাপুলিনবিহারী, গোবর্দ্ধন-ধারী, কংশদলনকারী, বংশীধারীর নাম শুনে, প্রাণ আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠছে; মনে হচ্ছে এই রাস্কুসে ধর্ম্ম আর রাস্কুসে পোষাক ফেলে আবার কৌপীন পরে তাঁর কোলে ফিরে যাই—একবার প্রাণ খুলে "হরি হরি" বলে ডাকি (সকলে—"হরি হরি বল)

—কিন্তু এ কলঙ্কিত শরীরকে কি তিনি আর স্পর্শ করবেন? চৈতন্য অবতারে বটে মহাপাপী জগাই মাধাইকে কোল দিয়েছেন; কিন্তু আমি যে ভাই তাদের চেয়ে ঢের পাপী,—আমার কি গতি আছে?…(ভিড়ের মধ্যে—"অবশ্য আছে—খুব আছে—সাহেবের পর্য্যন্ত আছে—ঐ কেলেটারও আছে—একবার সবাই 'হরি হরি' বল"—একটি চশমা পরা যুবক সন্ন্যাসী বলিল—"জয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জয়।)…

পিছনে চাহিয়া দেখিলাম ক্লোশেক ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সহিত সাহেবের বেশ জোর গলায় কথা কাটা কাটি চলিতেছে।—নিশ্চয়ই আমার বই এবং ছবি বিলির ব্যাপার লইয়া।…আমি শ্রোতৃমণ্ডলের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—"ভাই সব আর মায়েরা, পাদ্রী সাহেব যে লোক-টিকে এখন গালিমন্দ দিচ্ছে তার নাম নিতাই মণ্ডল, জেতে চাঁড়াল; ওদের দমবাজিতে পড়ে কেরেস্তান হ'য়ে গেছে। কেরেস্তান হ'য়ে সে কী সুখ তা আমরা দুজনে হাড়ে হাড়ে বুঝছি,—যীশুর পদে প্রার্থনা করি যেন শত্রুতেও কেরেস্তান না হয়। সমাজ থেকে বাড়ী থেকে তো তাড়িয়ে দিয়েইছে তার ওপর যাদের কথা শুনে মাথা মুড়িয়েছিলাম সেই পাদ্রীর ব্যবহারও দেখতে পাচ্ছ। আহা বেচারি নিতাই!—ধর্ম্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু বড়ই নাকি ঠাকুরদেবতাদের ভক্ত

ছিল, তাই এখনও তাঁদের ভুলতে পারেনি। তাই যা পয়সা পায় তাই দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের ছবি, তাঁদের বই কিনে রাখে আর এই রকম একটু সুবিধা পেলেই বিলি করে।—বলে—"আর জন্মে কতই না পাপ ক'রেছিলাম, এলফ্রেড্ দাদা, তাই এই দুর্দ্দশা, তাই এই নাকাল দিয়েছেন মা কালী; এজন্মে একটুও তো পুণ্যি ক'রে রাখি"—। সাহেব এসব মোটেই পছন্দ করে না, গালমন্দ দেয়, মারধোর করে—আহা কিন্তু ভক্তি এমনি পদার্থ!...তা ভাই সব, তোমাদের ধর্ম্ম কি এতই কঠোর যে আমাদের মত পাপীকে আর নিতাই মণ্ডলের মত ভক্তকে আবার তুলে নেবে না?... চশমাপরা যুবক সন্ন্যাসীর দল বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় তুলে নোব—মাথায় ক'রে তুলে নোব—ভয় নেই নিতাই মণ্ডল, সামনে জবাব দিয়ে যাও, আমরা আছি......"

* * * *

জোশেফের সঙ্গে বচসার ফলে এবং মাঝে মাঝে জনতার ক্রিশ্চান-বিরুদ্ধ চিৎকারে পাত্রীর আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ লাগিয়া গিয়াছিল,—কাছে আসিয়া আমায় ডাকিয়া ইংরাজিতে কহিল—"এলফ্রেড্ গোসা!—এসব কি..." আমিও ইংরাজিতেই উত্তর দিলাম—যাহাতে জনতার মধ্যে কেহ বুঝিতে না পারে—"মাফ্ করবেন, আমার কোন পুরুষেই কেহ 'গোসা নয়, আমার নাম শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ, জাতিতে কুলীন অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ..." আরও কিছু কিছু পরিচয় দিলাম।

সাহেব নির্ব্বাকভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল—ঘৃণায় কি রাগে কিম্বা বিস্ময়ে ঠিক বুঝা গেল না—বোধ হয় সব মিশান ছিল। একটু পরে মাথা নাড়িয়া ক্রোধভরে চিবাইয়া চিবাইয়া বাঙ্গলায় বলিল—"হুঁ—আমি শুনিয়াছে ঘোষেরা কায়স্থ হয়, আর গোবর্দ্ধনের মট গয়লাও হইয়া ঠাকে......

সাহেবের দারুণ নিরাশার মধ্যে এ সান্ত্বনাটুকুতে আমি আর আঘাত করিলাম না।

জবা

শ্রীমতী সরোজবালা ঘোষ

লোহিত বসনে ঢাকি তনু আপনার,
সাজায়ে বাসর একা ক্ষুদ্র গুল্ম মাঝে,
কত যুগ কাটাইলে বহি দুঃখ ভার,
প্রিয়ের আশায় সাজি অভিসার সাজে।

তরুণী সুন্দরী জবা। ও রূপ তোমার
লাগে নাই কভু কোন দেবতার কাজে,
ভ্রমর চলিয়া গেল ছুলি বার বার,
ঢালিল না প্রেম-মধু চুম্বনের মাঝে।

মিটিল না অফুরান প্রাণের পিয়াসা,
লো তরুনি! জবারাণি! ব্যর্থ হতাশায়,
বলি দিতে আপনার যৌবনের তৃষা,
ঢলিয়া পড়িলে শেষে মহাকালি-পায়।
রক্ত-রাঙ্গা জোড়া ওই শ্যামার চরণে
মিশে গেল রক্ত-রূপ জীবনে মরণে।

কাল সে আসিবে

জসীম উদ্দীন

১

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে
ওপারের ঢেউ এপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে ক'রে।
বুঝি তাই মনে ক'রে
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধ'রে।
কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের ক্ষেতের মতই তাহার গা.
কোথা বা হলুদ আবছা হলুদ কোথা বা হলুদ না।

২

কাল সে আসিবে হাসিয়া হাসিয়া রাঙা মুখখানি ভরি,
এপারে আমার পাতার কুটীরে আমি কিবা আজ করি।
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, এপারে আমার ঘর
তার পরে নদী, ঘাটের ডিঙাটি কাঁপে নদীটির পর।
কাল সে আসিবে, লঙর ছিঁড়িল, ছুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি কারে যেন আমি দেখি নাই কতকাল।
ওপারেতে চর বালু লয়ে খেলে উড়ায় বালুর রথ,
ওখানে সে কাল রাঙা ছুটি পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।

৩

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে নদীটির কাছাকাছি
মোর ভাঙাঘরে ভাঙাগান লয়ে এপারেতে আমি আছি।
আমি কি কালকে গলায় পরিব আবার মোতির মালা
ছুহাতে ছুখান কাঁকণ ছুলিবে ললাটে সিঁদুর জ্বালা।
কাজললতা সে শাড়ীখানি প'রে, কাজল আঁকিব আঁখে
অবেলায় যাব জল ভরিবারে কলস বাজায়ে কাঁখে।
সে আসিবে কাল, আকাশের তারা গণিয়া হয়না শেষ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ।

৪

কাল সে আসিবে মিঠে মুখে তার আরও মিঠে লাগে কথা
আর মিঠে তার চোখের চাহনি, আসিবে ও চর যথা।
সে আসিবে কাল সরিষার রেণু মাখাবে সারাটি গায়ে
কুসুম ফুলের কুসুম ভাঙিয়া নূপুর জড়াবে পায়ে।
মাথায় বাঁধিবে দুধালীর লতা কচি সীম পাতা কানে
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে, রাই সরিষার হলদী-কোটার শাড়ী
মটর বোনেরে সাথে ক'রে যেন খুলে দেখে নাড়ি নাড়ি।

৫

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, ধারে তার এই নদী
তারি কূলে মোর ভাঙা কুঁড়েঘর—বহুদূরে নয় যদি,
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে সেকি মণি-মাণিকেতে ভরি।
সে কি ওই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে, বরষার তরুগুলি
শীতের তাপসী, কারে বা স্মরিছে, আভরণ গার খুলি'?
হয়ত দেখিবে, হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে
এপারে আমার ভাঙা কুঁড়েখানি, আমি রব সেই ঘরে

———

চতুর্দ্দশপদী কবিতা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

পুনরাবৃত্তি

এখন যাঁর কথা বল্‌বো, অসংখ্য technical দোষ সত্ত্বেও বাঙ্‌লা দেশের সনেট্‌কারদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত তিনিই সর্ব্বপ্রধান। দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর কাব্যযশ প্রধানত তাঁর সনেট্‌গুলির ওপরই নির্ভর কর্‌ছে, এবং সনেট্‌-রচনাতেই তিনি সব চেয়ে বেশী কুশলতা দেখিয়েছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্ত শতাধিক সনেট্‌ আছে (এগুলোকে একত্রিত করে' একখানা আলাদা বই বা'র কর্‌লে কোনো প্রকাশক লাভবান্‌ হ'তে পারেন); তাঁর ভাবের ভঙ্গীতে ও ভাষার সারল্যে এমন একটি বিশেষত্ব ছিলো, যা সনেট্‌-রচনার এত বেশি উপযোগী যে অন্য কোনো form-এ হাত দিয়ে তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মত careless workman বাঙ্‌লা দেশের নাম-করা কবিদের ভেতর দু'টি নেই,—তাঁর যে-কোনো কবিতায় অযত্ন, ঔদাস্য বা আলস্য-প্রসূত অজস্র ত্রুটি বর্ত্তমান। সাহিত্যিকের পক্ষে মানসিক আলস্যের চেয়ে যে বড় পাপ নেই, তা'র প্রমাণ দেবেন্দ্রনাথ। তিনি সনেট্‌গুলোকে যেমন-তেমন করে' বেঁধেছেন, মিল ইত্যাদির প্রতি একটুকো নজর রাখেন নি, কোনো বিশেষ আদর্শ অনুসারে না চলে' যখন যেমন সুবিধে হয়েছে, লিখেছেন। সনেট্‌-রচনার কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রথা মেনে না চল্‌লেই যে অপরাধ হ'বে, তা নয়; কিন্তু মেনে-চলায় খানিকটে ফাউ লাভ আছে। ইতালীয় সনেট্‌-এর ছাঁচে খালি যে একটা covention, তা তো নয়, ওই ছাঁচে ফেল্‌লে সনেট্‌ সব চেয়ে শ্রুতিমধুর হয়, এ পরীক্ষিত সত্য। সাহিত্যক্ষেত্রে যখনি form-এর ব্যাপারে কোনো convention গড়ে' ওঠে, তখনি বুঝ্‌তে হ'বে, এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। যেমন Spenserian stanza-র শেষের লাইনটি মিছিমিছি দীর্ঘতর করা হয় নি—এর সার্থকতা যে কত বড়, শ্রবণেন্দ্রিয়ই তা'র সাক্ষ্য দেবে। এ-সব ব্যাপারে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা, কারণ নূতনত্বের ফল সব সময় শুভ না-ও হ'তে পারে। পৃথিবীর অনেক কবি নতুন কোনো form-এর জন্মদাতা না হ'য়েও শ্রেষ্ঠ বলে' পরিগণিত হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সনেট্‌-এর বিভিন্ন বিদেশী রূপের সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে একটিকেও নিজের বলে' গ্রহণ করেন নি, তা'র কারণ নতুন-কোনো রূপের অন্বেষণ নয়, মানসিক আলস্য। 'কে আবার অত হাঙাম কর্‌তে যায়'—গোছের মনোভাব নিয়ে তিনি শিথিল অমনোযোগিতার সহিত লিখে' গেছেন;—ফলে একটি সনেট্‌ও perfect হয় নি। কাব্যের রসের দিকটা আমি অবহেলা কর্‌ছি না; কিন্তু কবি বল্‌তে আমরা তাঁকেই বুঝি যিনি অনিন্দ্যনীয় দেহে একটি অনবদ্য ভাবকে মূর্ত্ত কর্‌তে পারেন। কাজেই কবিতার বাহ্যিক ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটিও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ঠেকে। পৃথিবীতে যাঁরা বড় কবি বলে' গণ্য, তাঁদের কখনো ছন্দপতনও হয় নি, বা কোনো খারাপ মিলও তাঁরা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয়টি দেবেন্দ্রনাথ অহরহই করেছেন, এবং প্রথমটি যে তাঁর মধ্যে না পাওয়া যায়, একথা জোর করে' বলা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সনেট্‌গুলোতে এমন অগোছাল ভাবে মিল ব্যবহার করেছেন যে তা' থেকে কোনো scheme বা'র কর্‌বার অসম্ভব চেষ্টা আমি কর্‌বো না। আসলে কোনো schemeই নেই, নিজের সুবিধে বুঝে' যেখানে খুসি যেমন-তেমন মিল বসিয়ে গেছেন। সব চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার এই যে ভালো মিলের চেয়ে খারাপ মিলই তিনি দিয়েছেন বেশী, এবং কোনো-কোনো মিল এম্‌নি নিকৃষ্ট

যে আজকালকার কোনো একাদশ শ্রেণীর কবিও তা দিতে রাজি হ'বে না—যেমন, 'করিয়া-বলিয়া'; 'সহিষ্ণুতা-দেবতা' 'দশমী-সালমি'। ইচ্ছে করলে অজস্র দৃষ্টান্ত জড়ো করা যেত, কিন্তু বিভিন্ন কারণে নিন্দনীয় তিনটি নমুনা দিয়েই ক্ষান্ত হ'লাম। *

দেবেন্দ্রনাথের আর একটি দুর্ব্বলতা মধুসূদনেরও ছিলো—সে হচ্ছে 'সু' কথাটির অত্যাধিক ব্যবহার। 'সুকপোল' 'সুরঞ্জিত', 'সুপ্রসন্ন', সহ্য করা যায়, কিন্তু এই সব পদের ব্যবহার বার-বার দেখ্‌লে সন্দেহ হয় যে অন্যথা চোদ্দটি অক্ষরের সংযোগ সাধন করতে পারেন নি বলে'ই কোনো শব্দের আগে 'সু' বসাতে কবি বাধ্য হয়েছেন। মধুসূদন ও দেবেন্দ্রনাথ দু'জনের চতুর্দ্দশপদীতেই 'সু'র একেবারে ছড়াছড়ি; মধুসূদন 'সু-সুন্দরী' পর্য্যন্ত ব্যবহার করেছেন। এই উপায়ে পদটির অক্ষরসংখ্যা চতুর্দ্দশ হল, এ-ছাড়া 'সু'-র কোনোই সার্থকতা নেই। 'সু-সুন্দরী' বলতে খারাপ, লিখ্‌তে কটু। এম্‌নি হাস্যাস্পদ আরো পদ মধুসূদনে পাওয়া যায় ('সুভদ্রা')

কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে

কিম্বা:

সাজাতে কু-চূড়া তোর হেন সুভূষণে ('কেউটিয়া সাপ')

মধুসূদনের সময় বাঙ্‌লা ভাষার যে-অবস্থা ছিলো, তা ভেবে এই সব দোষ মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব নয় বলে' মনে করতে পারি; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই 'সু'র উৎপাত অসহ্য হ'য়ে ওঠে। কথায়-কথায় 'সু'! 'সুভগিনী' 'সুরবে', 'সুদেহে', 'সুহার ('সুহার' মানে কি সুন্দর হার মনে হয়?)—যেখানেই অক্ষরের সংখ্যা কম পড়েছে, চোখ বুঁজে 'সু' বসিয়ে গেছেন।

এ-ছাড়াও মধুসূদনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আরো মিল আছে। মধুসূদনের মত দেবেন্দ্রনাথও এক-একটি পদকে পরবর্ত্তী পদের মধ্যে আংশিক রূপে টেনে আনতে ভালোবাস্‌তেন। অর্থাৎ end-stop line দু'জনেই খুব কম লিখেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হ'বে।

চেয়ে দেখ চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দীনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে।

(মধুসূদন—'সায়ংকাল')

বঙ্গবধূ,—কারাগারে সুচির-বন্দিনী,
দৈবযোগে পায় যদি করিতে ভ্রমণ
মালঞ্চে,

(দেবেন্দ্রনাথ—'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি')

সনেট্‌-এর প্রত্যেকটি লাইন্‌ পরবর্ত্তী লাইন্‌-এর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকাই বাঞ্ছনীয়; তা হ'লে compactness বজায় থাকে। পদের মাঝখানে ছেদ দিলে শ্রুতিমাধুর্য্যের হানি হ'বার আশঙ্কা আছে। আর, উদ্ধৃত দু'টি দৃষ্টান্তে তিন অক্ষরের পরে ছেদ বসাতে তা অত্যন্ত আকস্মিক হয়েছে,—এবং সেইজন্য সনেট্‌-এর ঠাসবুনোন হ'য়ে গেছে আল্‌গা।

ভ'রেছো কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ? (রবীন্দ্রনাথ—'বসন্তের দান')

এখানেও পদের মাঝখানে ছেদ বসেছে, কিন্তু আট অক্ষরের পর বলে' তা অত শ্রুতিকটু হয় নি, এবং আগের লাইন্‌-এর পরে কমা আছে বলে' গোটা কবিতাটির continuity অক্ষত রয়েছে।

মধুসূদনের মধ্যে আর-একটি জিনিষের অনতিব্যক্ত আভাষ দেখ্‌তে পাই, যা পরে দেবেন্দ্রনাথে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সে হচ্ছে abstract কল্পনা ও ভাবগুলিকে concrete উদাহরণ দিয়ে একেবারে মূর্ত্ত করে' তোলা। এর ফলে যে-জিনিষটি সাধিত হয়, ইংরেজীতে তা'কে বলে pictorial effect. এই জিনিষ শেলি বা রবীন্দ্রনাথে নেই; কীট্‌স্‌-এ আছে, দেবেন্দ্রনাথে আছে। বর্ণনার চাতুর্য্যে এই effect সৃষ্টি করা যায় না; এই চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য ও উপায় দুইই আলাদা। কবিতা'র বিষয়বস্তুকে

---

* 'মহিরাবণের পালা' নামক সনেট্‌-এ ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম লাইন্‌ মিলের বন্ধনে আবদ্ধ; তা'র মধ্যে ষষ্ঠ ও নবম লাইন্‌ এর শেষের কথা 'প্রহরী'। একই কথা দু'বার ব্যবহার করে' মিল দে'য়া যে কত বড় দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, তা সহজেই অনুমেয়। তারপর 'সৌম্য' নামক কবিতার 'মাখানো' 'খেলানো' 'ছড়ানো' ও 'সাজানো'র মিল একেবারে হাস্যাস্পদ।

অপরূপ শব্দসমষ্টির সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করায় শেলির সমকক্ষ নেই ; কিন্তু কীট্‌স্ যা কর্‌তেন, তা ঠিক বর্ণনা নয়, বিষয়টিকে বাদ দিয়ে তা'র বদলে একটি concrete রূপক ব্যবহার কর্‌তেন। 'Concrete' শব্দটির ওপর আমি জোর দিচ্ছি ; কারণ কীট্‌স্-এর কাব্যের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে তাঁর appeal শুধু চোখে বা কানে নয়—স্পর্শেন্দ্রিয়েও বটে ; তিনি যে-জিনিষটির কথা বল্‌তে চান্, পাঠককে দিয়ে তা যেন স্পর্শ করিয়ে ছাড়েন। তাঁর Ode to Autumnই এ-কথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। দেবেন্দ্রনাথের methodও ছিল তা-ই ; কীট্‌স্-এর প্রভাব তাঁর ওপর কতখানি ও কত গভীরভাবে পড়েছিলো, এ-কথা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দর্‌কার করে না। মধুসূদনের মধ্যে অতখানি sensuousness না থাক্‌লেও কল্পনাকে concrete চিত্র দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা ছিলো। যেমন :

> সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
> অতি তুচ্ছ শৃঙ্গ-শিরে। সে শৃঙ্গের তলে,
> বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে
> বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে। ('যশের মন্দির')

> ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
> গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
> প্রলয়ের মেঘ যেন। ভীম শরাসনে
> ধরি বাম-করে বীর মত্ত বীর-মদে,—
> টঙ্কারিছে মুহুর্ম্মুহু হুঙ্কারি ভীষণে। ('বীররস')

কিন্তু এইরকম চিত্র 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে কমই আছে, এবং তা'রো সবগুলিই যে পূর্ণাবয়ব লাভ করেছে, এমন নয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এইরূপ চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা second nature হ'য়ে গিয়েছিলো, তা'র সনেটগুলির বর্ণনীয় বিষয় প্রায়ই কীট্‌স্-এর 'Autumn'-এর মত অতি-জীবন্ত, একেবারে বাস্তব হ'য়ে উঠেছে—হাত বাড়ালেই যেন তা'দের ছোঁয়া যায়। এ-বিষয়ে বাঙালী কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের জুড়ি নেই।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বৈশাখ' কবিতাটি আমাদের সকলেরই মনে আছে ; নিছক বর্ণনার জোরে বৈশাখ মাসের দারুণ রূপটি যত স্পষ্ট করে' ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, ও-কবিতায় তা ফুটেছে। কিন্তু হাজার হ'লেও ও-বর্ণনা মাত্র ; তাই সে রূপ আমরা একেবারে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি নে। Description ও concrete representation-এ কোন্‌খানে যে পার্থক্য, দেবেন্দ্রনাথের এই ক'টি লাইন্ পড়লে পাঠক তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

> আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, আম্রের উদ্যানে
> হেরিলাম মূর্ত্তিমান বৈশাখ মাসেরে!
> ঈষৎ ঈষৎ রক্ত মদির নয়ানে
> ঢুলু ঢুলু, নিদ্রাবেশ ; স্বেদ নাহি ঝরে,
> থাকে লগ্ন মুক্তা-প্রায় ললাট উপরে।
> আম্রমুকুলেতে গাঁথা অলিময় হার,
> গলদেশে লম্বমান, শোভার আধার ;
> সুরভি, মৃদুল উষ্ণ, নিশ্বাস সঞ্চারে।
> বসি আম্রতলে, সুখে পৃষ্ঠ হেলাইয়া,
> করিছে আম্রের সংখ্যা সুপ্রসন্ন মনে।
> ('বৈশাখ মাস')

একটি গরম দুপুরবেলা, বেজায় ঘাম, মাঝে-মাঝে আগুনের হল্‌কার মত বাতাসের ঘূর্ণী ও-তা'র সঙ্গে আম্রমঞ্জরীর মিঠে গন্ধ—আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত এই সম্পূর্ণ atmosphereটি এখানে মূর্ত্তি লাভ করেছে ; বৈশাখ মাসকে যেন—মনশ্চক্ষে নয়, চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তে পেলাম। এই চর্ম্মচক্ষে দেখানোর কৌশল দেবেন্দ্রনাথ জান্‌তেন, এবং আমার মনে হয়, এখানেই তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার আর-একটি নিদর্শন দে'য়া যাক্। 'আত্ম-হত্যা' নামক সনেট্‌এ তিনি বল্‌ছেন,

> তোমরা কি হেরিয়াছ ডাইনীরে? শোণিতপায়িনী,
> বিষম ডাকিনী সেই, ভাবিও না ইহা উপকথা!
> উলঙ্গিনী, উন্মাদিনী, ভালবাসে ঘোর নীরবতা!
> যবে গৃধিনীর মত, তমস্বিনী, কৃষ্ণা, বিহঙ্গিনী,
> প্রসারে আয়ত পক্ষ, বিষাদিনী হয় আহ্লাদিনী!
> এক ফোঁটা রক্ত নাই, ক্ষীণ বাহু যেন বিষলতা!

দেবশূন্য দেউলেতে মানুষের সাড়া নাই যথা,
থাকে তথা ; হাতে ক্ষুর, বিমুক্ত কেশিনী !

কীটস্-পন্থী দেবেন্দ্রনাথের কাব্য যে sensuousness-এ একেবারে ভরপূর হ'বে, তা আশাই করা যায়। sensuous কথাটি আমরা যত সহজ ও ব্যাপকভাবে বুঝে' থাকি, তা'র চেয়ে একটু সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ কর্‌লে অন্যান্য কবিদের চাইতে কীটস্ ও দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বো। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ, 'Let thy kisses in showers rain upon my cheeks and eyelids pale' বা 'হেসে করেছিনু পান চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধরে' সত্ত্বেও আসলে spritual; টেনিসন্ The Miller's Daughter সত্ত্বেও মূলত logical; ব্রাউনিঙ্-এর মধ্যে স্থানে-স্থানে আশ্চর্য্যরকম sensuousness পাওয়া গেলেও তিনি মোটের ওপর এত বড় যে তাঁর সম্বন্ধে এক কথায় কিছুই বলা যায় না। ইন্দ্রিয়বিলাসের নামই sensuousness নয়; কারণ হুইট্‌ম্যান্-এর মত অত কম sensuous আর কোনো কবিই নন্। 'গাব আজ আনন্দের গান'-এর একটি লাইন্‌ও sensuous নয়। জীবনের যে কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্য প্রকাশ করার নাম sensuousness বলা যেতে পারে। 'Sage and serious Spenser-এর কাব্যে এ-জিনিষের বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য দেখতে পাই। একটী সুন্দর নারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে স্পেন্‌সার্ লিখেছেন :

And yet through languour of her late sweet toyle,
Few drops, more cleare then Nectar, forth distild,
That like pure Orient perles adowne it trild.

স্বেদবিন্দুকে অকবিজনোচিত জিনিষ বলে' যে তিনি উপেক্ষা করেন নি, এইখানেই অন্যান্য কবিদের থেকে তিনি আলাদা। এই সব ছোট খাটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে অনেক কবিই উপেক্ষা করে' থাকেন, কারণ তাঁদের কারবার হয় অতিন্দ্রিয়কে নিয়ে। সুদীর্ঘ 'এপিসাইকিডিয়ন্' পড়ে' এমিলিয়া ভিভিয়ানির দৈহিক আকৃতি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা আমাদের জন্মায় না; সে-ক্ষেত্রে তা'র অবিশ্যি দরকারও নেই !

কীট্‌স্ কিন্তু এই দিক দিয়ে স্পেন্‌সার্-এরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কীট্‌স্ সম্বন্ধে সমালোচকেরা বলে' থাকেন যে তিনি হচ্ছেন একমাত্র কবি যিনি রসনেন্দ্রিয়কে কাব্যে আসন দিয়েছেন। আমরা অবিশ্যি ঈশ্বর গুপ্তের নাম কর্‌তে পারি, কিন্তু রসনার রসকে কাব্যরসে পরিণত কর্‌তে পারার মত দুর্লভ কবিত্বশক্তি কীট্‌স্-এরই ছিলো। আর ঈশ্বর গুপ্তের মুখে কর্কটের গুণকীর্ত্তন শুনে' একবার তা চেকে দেখ্‌তেও লোভ হয় না। The Eve of st. Agnes-এ পর্‌ফিরো নিদ্রিতা ম্যাড্‌লীন-এর ঘরে ঢুকেছে; তারপর

And still she slept an azure-lidded sleep,
In blanched linen, smooth and lavender'd,
While he from forth the closet brought a heap
Of candied apple, quince, and plum, and gourd;
With jellies soother than the creamy curd,
And lucent syrops, tinct with cinnamon,
Manna and dates, in argosy transferr'd
From Fez; and spiced dainties, every one,
From silken Samarcand to cedar'd Lebanon.

এই stanzaটিতে উল্লিখিত সুগন্ধি শয্যাটির স্পর্শ যেন অনুভব করি ; যে-সব খাদ্য ও পানীয়ের কথা লেখা হয়েছে, তা'র স্পর্শ সুকোমল সুস্বাদুতায় মন আমাদের আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। *Ode on Melancholy*-র

Though seen of none save him whose strenuous tongue
Can burst Joy's grape against his palate fine;

এই লাইন্ দু'টিতে কবির সুনিবিড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির চরম অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই। রসের এতখানি গভীরতা ও ভাষায় এমন অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য না থাক্‌লেও দেবেন্দ্রনাথের এই সনেট্‌টির রস রসনাতেই পর্য্যবসিত হয় নি; একটি fine poetic appealও আছে।

উপেন্! লুকাট্, লিচু, পেঁপে, আক্, শশা,
যা পাও কিনিয়া এন, আজিকে দশমী।
রসনার তৃপ্তিকর তর্‌মুজ্ লাল্‌মি,
অবশ্য আনিও তুমি, দধির দুর্দ্দশা।
হের, হের!—ইহা হ'তে ঘোল ও আমানি
সুস্বাদু; (বড় বউ পাতিয়াছে বুঝি?)
এক রাশ তেঁতুল ঢেলেছে চোক্ বুজি,—
তাই বলি, ব্রজে এল কোন্ গোয়ালিনী?
দুইটী কুল্পী বরফ হ'য়ে গেল পার।
রাণী বলে, "আরো দাও"। বেদানার যম,—
সে বরং ছিল ভাল! এ বড় বিষম!
জলের উপরে ঝোঁক হয়েছে উহার!
ধর্, ধর্! সাপটিয়া ধরেছে সুরাই,—
বালিকা-বড়াই নয়; বালিকা-বালাই!

('গ্রীষ্মের ফল প্রভৃতি')

কিন্তু কবিতা-হিসেবে এ খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়, বিষয়বস্তুর বিশেষত্বের জন্যই এখানে তা উদ্ধৃত করা হ'ল। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে তিনি যা-ই নিয়ে লিখুন্ না কেন, জিনিষটিকে in terms of the Senses প্রকাশ না ক'রে পারেন না। যেমন, 'রবীন্দ্রবাবুর সনেট্'-এর শেষের দু'টি লাইন্:

পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে!

অন্য একটি সনেট্-এ 'মস্ত বড় পরিবারের আড়ালে-আব্‌ডালে' অতৃপ্তিকর দেখাশোনার সঙ্গে তিনি এই উপমা দিচ্ছেন:

আধ গ্রাশ জল যেন নিদাঘের কালে

অতৃপ্তির এমন সুন্দর ও সার্ব্বজনীন উদাহরণ আর কি কিছু আছে?

'নিদাঘ' দেবেন্দ্রনাথের একটি খুব favourite subject ছিলো; নানা কবিতায় তিনি বিভিন্নভাবে গ্রীষ্মের নানা রূপ এঁকেছেন, এবং এই সব কবিতাতেই তাঁর লেখ্‌বার যে বিশেষ কায়দাটির কথা এতক্ষণ বলে' এলাম, তা'র সব চেয়ে চমৎকার উদাহরণ মেলে। গ্রীষ্মের কথা বল্‌তে তিনি আকাশ, সূর্য্য, আগুন, মরুভূমি, ভস্ম প্রভৃতি নিয়ে কোনো কথাই বলেন নি; তিনি বাইরের জগতের কয়েকটি বাস্তব phenomenon দিয়ে তাঁর বক্তব্য সুপরিস্ফুট করেছেন। যেমন, নিদাঘের তৃষ্ণার দারুণতা তিনি এই উপায়ে বুঝিয়েছেন:

বসি জলের কুঁজায়
ডাকে কাক; বোল্‌তাও তৃষাসমাকুল,
বসে গিয়া সেই জলে; গীরগিটি-কুল
মার্জ্জারের ঘর্ম্মবিন্দু মহা সুখে খায়! ('পিপাসা')

ইত্যাদি। কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়ে তৃষ্ণার প্রখরতাটি তিনি আমাদের অনুভব করিয়ে ছেড়েছেন। খোকাখুকিরা আজ চির-বর্জ্জিত দুধ সানন্দে পান কর্‌ছে, ঘরের কুকুর লক্‌লকে জিভ্ মেলে ধুঁক্‌ছে। 'গীরগিটি-কুল মার্জ্জারের ঘর্ম্মবিন্দু মহা সুখে খায়'—এ অবিশ্যি অ-সাধারণ দৃষ্টান্ত; কিন্তু এই প্রায়-বীভৎস চিত্রটি এঁকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনে পূর্ণতম সাফল্য লাভ করেছেন, এ বলাই বাহুল্য। এই চিত্রের জন্য তিনি সম্ভবত সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে ঋণী।

'নববর্ষ-উপহারে'র অন্তর্গত 'বৈশাখ' নামক সনেট্-এ (পাঠক মনে রাখ্‌বেন যে সমস্ত উদ্ধৃতি শুধু কবির সনেট্‌গুলো থেকেই করা হয়েছে) দেবেন্দ্রনাথ এই method-এ অপূর্ব্ব কুশলতা দেখিয়েছেন:

কি প্রচণ্ড তীব্র রৌদ্র! রবির কিরণে
অভিতপ্ত, গতিহারা হয়েছে ধরণী;
শিখিনী পড়িয়া আছে ক্লান্তদেহমনে;
কলাপমণ্ডলে তার শুয়েছে ফণিনী!
ফণিনীরে মহাসুখে করি আবেষ্টন,
আকুল দর্দ্দুরকুল রয়েছে পড়িয়া!

যে-গরমে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, এ যে সেই গরম, এ-পর্য্যন্ত পড়ে'ই সে-বিষয়ে পাঠকের মনে কোনো সন্দেহ থাকা অসম্ভব, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এতেও পরিতৃপ্ত না হ'য়ে আর-একটি এমন প্রমাণ দিলেন, যা যেমন আশাতীত, তেম্‌নি অবশ্যবিশ্বাস্য:

চন্দনে চর্চ্চিত, সূক্ষ্ম দুকুল পরিয়া
আছে বধু; প্রিয় তারে করে না চুম্বন!

যে-গ্রীষ্মের প্রকোপে প্রিয়াকে চুম্বন কর্‌তেও মানুষ

বিস্মৃত হয়, তা'র উগ্রতা যে বাস্তবিকই অসহ্য তা সবাই একবাক্যে মেনে নেবে। আমার মনে হয়, এইখানে দেবেন্দ্রনাথের sensuousness-এর চরম অভিব্যক্তি হয়েছে; বাঙ্‌লা ভাষায় ঠিক এতখানি sensuous লাইন্ খুবই কম লেখা হয়েছে। আজকালকার কবিদের মধ্যে মোহিতলালের ওপর দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব খুবই পড়েছে; বর্ত্তমান কালে তাঁর মত sensuous কবি এ-দেশে আর নেই। গত অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'স্বপার্ট্‌ ব্রুক্' নামক সনেট্-সমষ্টিতে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্বাদ আমাদের খুবই স্পষ্ট করে' জানতে দিয়েছেন।

মমতার মোম দিয়ে বধুমুখ করিলে মার্জ্জনা
প্রকৃতির।

বা

তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ দোহন-সুরভি

দেবেন্দ্রনাথের কথা বিশেষ করে'ই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার যে-কবির কথা বল্‌বো, কবি-হিসেবে তাঁর স্থান দেবেন্দ্রানাথের অনেক ওপরে, কিন্তু সনেট্-এ তিনি বিশেষ হাত পাকাতে পারেন নি। গোবিন্দচন্দ্র দাসের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর দীর্ঘ (প্রায়ই অতিদীর্ঘ) গীতি-কবিতাবলীতে; ছোট কবিতা লিখে' তিনি কখনো জুত্ পেতেন না; তাই তিনি যে একশো কুড়িটী সনেট্ লিখেছেন, তা-ই আশ্চর্য্য মনে হয়, এবং তা'র চেয়েও আশ্চর্য্য এই যে তা'দের প্রত্যেকটি খাঁটি শেক্‌স্‌পীরীয় ছাঁচে লেখা (দু' একটি কবিতায় ব্যতিক্রম আছে)—এবং খারাপ মিল কিম্বা ছন্দ-পতন কদাচ পাওয়া যায়। গ্রাম্য গোবিন্দচন্দ্র কখনোই শেক্‌স্‌পীয়র্ পড়েন নি; তাই, তিনি যে এই formটি ব্যবহার করেছেন, তা নিতান্তই দৈব ঘটনা বলে' মনে হয়। সে যা-ই হোক্, অমিতভাষী ও দুর্দ্দান্তপ্রাণ গোবিন্দচন্দ্র যে ঐ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বাঁধাবাঁধিতে প্রায় সওয়া শ'টি কবিতা লিখ্‌তে পেরেছিলেন, এইটেই তাঁর পক্ষে বাহাদুরি। সনেট্‌গুলির বিষয়বস্তু প্রধানত নারী ও প্রেম, দু'চারিটি topical বা local ব্যাপার নিয়ে লেখা। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে এই ক্ষণজন্মা মহাকবির প্রাণশক্তির যে-প্রাচুর্য্য, কল্পনার যে-অসীমস্পর্শী প্রসার, ভাষার যে দুর্ব্বার আবেগব্যাকুলতার পরিচয় দিয়েছেন, 'ফুলরেণু'তেও সে-সব নিত্য বর্ত্তমান; কিন্তু 'কুঙ্কুম' বা 'কস্তুরী'র সঙ্গে তুলনা করলে এই সনেট্-সংগ্রহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণায়ু মনে হয়। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী'র মত এর সম্বন্ধে বলা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষে এ তেমন কিছু নয়, কিন্তু অন্য যে কোন কবিকে বিখ্যাত করে' দেবার পক্ষে এ যথেষ্ট।

গোবিন্দচন্দ্র যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নি, বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এ একটি অত্যন্ত fortunate accident বলে' মনে হয়। উচ্চশিক্ষিত গোবিন্দচন্দ্র একজন মার্জ্জিতভাষী চলনসই কবি হ'তে পারতেন; কিন্তু তাঁর কাব্যের প্রধান গৌরব যে unsophistication, যে-লজ্জাহীন সারল্য, যে-অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ, তা যে আমরা হারাতাম, সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। 'ফুলরেণু' তাঁর অন্য-সব কাব্যের মত সম্পূর্ণ আত্মজীবনীমূলক; নিজের জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, আশা অভিলাষ, স্মরণীয় ঘটনা তিনি অকুতোভয়ে প্রকাশ করেছেন;—proper name গুলোকে বদ্‌লে বসাবার মত সুবুদ্ধিও তাঁর হয় নি। তাই, বাঙ্‌লার কবিকুলের মধ্যে এক তাঁর কাব্য-সম্বন্ধেই বলা যায়, 'Who touches this book, touches a man.' কবির জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকলে যে তাঁর কাব্যের সম্পূর্ণ রস-গ্রহণ করা যায় না, এ-কথা তাঁর পক্ষে যেমন খাটে, আমাদের আর কোন কবির পক্ষে তেমন খাটে না। 'ফুলরেণু'র অন্তর্গত ১৯ ও ২২নং কবিতা দু'টিতে সম্ভবত তাঁর জীবনের কোনো গোপন ঘটনার প্রতি উল্লেখ আছে; তা না জানার দরুণ ও দু'টি কবিতা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়েছে।

এক হিসেবে পৃথিবীর সকল সাহিত্যই (এমন কি, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকও) আত্মজীবনী-মূলক; কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার দু'টি রকম আছে;—একটি হচ্ছে নিজের সত্তাকে আড়ালে রেখে বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্ন অবস্থায় (situation) ফেলে তা'দের মানসিক গতিবিধির ভিতর দিয়ে পাঠকের অজানিতে আত্ম-প্রকাশ-করা; আর-একটি হচ্ছে পাঠকের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে, নিজের ভাষায় তা'র কাছে আত্মোদ্‌ঘাটন-করা। প্রথমটি থেকে drama ও dramatic-কাব্যের উদ্ভব, দ্বিতীয়টি থেকে লিরিক্

বা গীতি-কবিতার। লিরিক্‌ লিখ্‌তে বসে'ও অনেক কবি সুকৌশলে আত্ম-কাহিনী গোপন করে' তা'কে একটি সার্ব্বজনীন অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেন—রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের অগণ্য কবিতাবলীর মধ্যে তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট স্বীকারোক্তি নেই। কিন্তু অনেক কবিতার মধ্যে নিজেদের সত্তা সম্পূর্ণরূপে ঢেলে দেন্—জীবনে যত ঘটনা তাঁদের নাড়া দিয়েছে, তা এম্‌নি তুচ্ছ হ'লেও কাব্যে সব মহিমামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। এই শ্রেণীর কাব্য এলিজাবেথ্‌ ব্যারেট-এর *Sonnets from the Portuguese* ও গোবিন্দচন্দ্রের 'ফুল-রেণু'।

'ফুল-রেণু' পড়্‌তে বস্‌লে, শুধু কবি কি লিখেছেন, তা-ই শুনি নে, মানুষটি কি অনুভব করেছেন, তা-ও জান্‌তে পাই; তাই আমাদের মন সহজেই অভিভূত হ'য়ে পড়ে। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের প্রধান গুণ Sensuousness নয়, passion. এই passion হুইট্‌ম্যান্‌-এর মত পৃথিবীর প্রথম মানবের পরম-সুন্দর নির্ল্লজ্জতা থেকে উৎসারিত; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রে হুইট্‌ম্যান্‌-এর বর্ণ ও ধ্বনির দারিদ্র্য নেই। রঙ্‌য়ের ও শব্দের অফুরন্ত প্রাচুর্য্যে গোবিন্দচন্দ্র সুইন্‌বার্ণ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয়—যদিও (বলা বাহুল্য) সুইন্‌বার্ণ্‌ বা রসেটির সযত্নসাধ্য নিখুঁত কারিগরি তাঁর ছিলো না। তাঁর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের হাস্যোজ্জ্বল সুকোমল সরসতা তেমন পাই নে; তাঁর উন্মত্ত আবেগসিন্ধুতে সুরসিকতার পদ্ম ফুট্‌তে পারে নি; কিন্তু সেই সমুদ্রমন্থন করে' কাব্যের অমৃতলক্ষ্মীর উদয় হয়েছে। চোদ্দ অক্ষর ও চোদ্দ লাইনের আঁটসাঁট গণ্ডীর মধ্যেও এই passion যে কতখানি প্রবল প্রকাশ পেয়েছে, তা আশ্চর্য্যের বিষয়:

> সত্যই কি রক্তমাংসে এত না কি সয়,
> মুহুর্ম্মুহু এত চুম্ব এত আলিঙ্গন,
> গুড়া হ'য়ে যেত হ'লে গিরি হিমালয়,
> সাগর হইলে যেত শুকায়ে দু'জন! ('আজি')

> দিলে যদি আর' দাও, যত দিতে পার'
> এখনো পুরেনি প্রাণ, ভরে নাই বুক,
> আর' চাই আর' চাই—আর'—আর'—আর'—
> শীৎকারে ছিঁড়িছে শিরা—সাংঘাতী কৌতুক। ('আর')

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে যিনি পরিচিত আছেন, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পড়ে তাঁর সেই অতুলনীয় কবিতাটি মনে পড়্‌তে বাধ্য—'দিবে যদি সব দাও যা আছে তোমার'। বস্তুত, এই সনেট্‌টি সেই কবিতারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ—যদিও এই সনেট্‌টিতে যতখানি vigour প্রকাশ পেয়েছে, তাও—গোবিন্দচন্দ্রকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে—বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্যে বিরল।

> বহ' জাহ্নবীর মত পর্ব্বত-পাষাণে,
> তরঙ্গে তরঙ্গে তারে দেও ভেঙ্গে চূরে,
> কি হবে বলিলে লোকে শুধু কাণে কাণে
> আসে যদি ঐরাবত ভেসে যাবে দূরে। ('ভয়')

অথবা—

> বচনে অমৃত তব, অমৃত অধরে,
> স্বর্গীয় অমৃতগন্ধে দেহ সুবাসিত,
> সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত করে'
> নয়নে করিব ভোগ, কর' না বঞ্চিত। ('দেখা')

কিম্বা—

> তুমি আর আমি দেবী তুমি আর আমি,
> প্রবল পদ্মার স্রোতে ভাসি দুই ফুল, ('তুমি আর আমি')

গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষেই লেখা সম্ভব। এবম্প্রকার আবেগপ্রাবল্য ও তা'র ছদ্মবেশহীন, নিঃসঙ্কোচ, সুস্পষ্ট ও তীব্র প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে আর দেখা দেয় নি।

এই উদ্দামতার পাশে পাশে গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষত্ব চোখে পড়ে—একটি পরম উপাদেয় ঘরোয়ানা পূর্ব্ব বাঙ্‌লার গাঁ-দেশের আব্‌হাওয়া, পল্লী-জীবনের ছোট-খাটো ঘটনার অতি-পরিচিত মাধুর্য্য। তাঁর কাব্যের এই দিকটিতে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়; এখানে প্রফুল্ল লঘুচিত্ততায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের কাছাকাছি নেমে এসেছেন। 'কাঁথা সেলাই' 'চুল শুকান' 'খই ভাজা' চিড়া কুটা' 'আম মাখা'

প্রভৃতি কবিতায় পাঠক'এর প্রমাণ পাবেন। শেষোক্ত সনেট্‌টির শেষের দু'টি লাইন রসিকজন মাত্রেরই অনুধাবন-যোগ্য : (একটি মেয়ে বসে'-বসে' আম মাখ্‌ছে ; একজন পুরুষ দূরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে।)

আম মাখা থালা আর অধর কমল,
কি দেখিয়া জিবে ওর আসিয়াছে জল ?

এই হাল্‌কা রসমধুরতার একটি মধুরতর নিদর্শন পাঠক দু'পাতা ওল্টালেই পাবেন :

সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সে-ই সে ফুলের তোড়া, আমি ফুলদানী! ('ফুলদানী')

তারপর 'বার্দ্ধক্য' কবিতায় কবি জরার সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত, কিন্তু :

কেবল যুবতী নারী করিবে যে ঘৃণা,
সেই দুঃখে হে বার্দ্ধক্য, বাঁচি না, বাঁচি না!

'নিরাকার ঈশ্বর' নামক কবিতায় কবি বল্‌ছেন যে যিনি চন্দ্রসূর্য্য, সৌরভ, বায়ু, কোকিলকণ্ঠ সৃষ্টি করেছেন তিনি সবগুলি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী না হ'য়েই পারেন না :

কিন্তু যেই নারী
রচিলা যৌবনে তার চখে দিলা ঠার,
সে অবধি ভয়ে বিধি হৈল নিরাকার!

এতদনুরূপ একটি ভাব 'নারী'তে প্রকাশ পেয়েছে! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে আলিঙ্গন দিতে কবি পশ্চাৎপদ নন্, শতবজ্র কিম্বা সহস্র সর্পকে তিনি ভয় করেন না :

কিন্তু যুবতীর কাছে যাইতে ডরাই

এই humour কিন্তু সর্ব্বত্র সুমধুর হ'য়ে প্রকাশ পায় নি ; প্রায়ই তার মধ্যে তিক্ততা মিশে' তার স্বাদ বদ্‌লে দিয়েছে। তপ্ত খোলার ওপর মুঠি-মুঠি ধান ফেটে খই বেরিয়ে-আসার দৃশ্য দেখে কবি মন্তব্য কর্‌ছেন ;

রমণীর ভালবাসা বুঝিলাম কাজে।

নারীর প্রেমের প্রতি এই অবিশ্বাস বহুবার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ;

রমণী পীরিতি করে তেল মেখে গায়,
ছুঁইতে কি না ছুঁইতে পিছলিয়া যায়! ('রমণীর প্রেম')

বুক চিরে' আসে যায় শাঁখের করাত,
রমণী তেমনি আহা পেটভরা দাঁত। ('শাঁখের করাত')

রমণী এমনি ভোলে ভালোবাসে যাকে,
মেঘ গেলে আকাশে কি আবছায়া থাকে ? ('অনুরোধ')

শকুনী খাইলে মড়া তখনি ফুরায়,
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায় ('নারী ও শকুনী')

নারীর হৃদয় খানি বিমল দর্পণ,
তারি ছায়া ভাসে প্রাণে যে থাকে সম্মুখে,
একটু সরিলে দূরে নাহি কাঁদে মন,
আরেক নূতন ছায়া পড়ে তার বুকে। ('নারীর হৃদয়')

পুরুষের প্রেম আর পুরুষের প্রাণ,
দিক্‌দর্শনের কাঁটা এক মুখে থাকে,
না নড়ে (নক্সে) পশ্চিম পূর্ব্ব নৈঋত ঈশান,
চিরলক্ষ্য একজন—ভালবাসে যাকে।

* * * * *

রমণী প্রেমের ঘড়ি সতত চঞ্চল,
প্রাণে যায় দাগ রেখে পল অনুপল।

ওপরের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা আর-একটি জিনিষ দেখ্‌তে পাই—উপমাদি অলঙ্কার-প্রয়োগে গোবিন্দচন্দ্রের অতুলনেয় মৌলিকত্ব। দেবেন্দ্রনাথের অদ্ভুত কল্পনা—

জ্যোৎস্না তোমার আনন,
অধরের তিল যেন ঘুমন্ত কোকিল।

প্রভৃতি উপমা হচ্ছে যা'কে বলে poetic ;—কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের উপমাতে সাধারণত আমরা কবিত্ব বল্‌তে যা বুঝে থাকি, তা ততটা নেই। তাঁর উপমাগুলি বেশির ভাগই কোনো অতি সাধারণ ঘরোয়া জিনিষ থেকে নেয়া—বাইরের প্রকৃতি থেকে নয় ;—রমণী পীরিতি করে তেল মেখে গায় বা রমণী প্রেমের ঘড়ি সতত চঞ্চল'—একেবারে অননুকরণীয় ও অভিনব। যদিও তথাকথিত 'কবিত্ব' যখন তিনি করেছেন তখনো চমৎকার নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন ;

ঊষার অরুণবর্ণে অবগাহমান,

বা

অথবা সন্ধ্যার স্বর্ণকুসুমিত নভ ('প্রেম অরণ্যানী')

বা

অনলে মিশিয়া যায় অধরের হাসি ('দাহ')

মোহিতলালের মত একজন poet's poet-এরো লেখা হ'তে পারতো। গোবিন্দচন্দ্রের কল্পনার পাখী যখন ভাবের আকাশে ডানা মেলে উড়েছে, তখন একেবারে sublime-এর রাজত্বে অধিরোহণ না করে' ক্ষান্ত হয় নি :

পশ্চিমে বৈশাখী বেলা অবসন্ন প্রায়,
আকাশ-কটাহে মেঘ দ্রবরক্তময়,
বিশ্ব রচিবারে যেন বিশ্বকর্ম্মা তায়,
জ্বাল দেয় মহাভূত উপাদানচয়। ('কাঁথা সেলাই')

ক্রমশঃ ডুবিল সূর্য্য হয়ে ঘোর লাল,
মুছে নিয়া অভাগীর সীঁতার সিঁন্দুর ('মোক্ষদা'১)

যে চন্দ্র গিয়াছে আজ চির অস্তাচলে,
পূর্ণিমা পুড়িয়া গেছে হ'য়ে ছারখার,
পৃথিবীর ঘোরতর অন্ধকার তলে,
ছিন্ন ও যুবতী-জ্যোৎস্না ডুবিল তাহার। ('মোক্ষদা'২)

কখনো একটি বিচ্ছিন্ন পদে এই অপরূপ কল্পনাশক্তি এমন ভাবে ফুটে' উঠেছে যে পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ সেখানে এসে চম্‌কে উঠতে হয় ;

থুইয়া গিয়াছে চন্দ্রে অমৃত-চুম্বন—('অনাদি অব্যয়')

যুবকের বুকে অই তড়িতের লতা ('আজি')

অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে ('প্রেতযোনি')

কোনো-কোনো কবিতায় এক-একটি আশাতীত realistic touch-এ একটি সম্পূর্ণ atmosphereকে কবি জীবন্ত করে' তুলেছেন ;

সম্মুখে কলার খোলে কাকে ভাত খায়
অর্দ্ধ-উর্দ্ধদৃষ্টি আর্দ্র নয়ন-কমল,
পশ্চিমে ঢলিয়া সূর্য্য শোকে মূর্চ্ছা যায়,
দেখে' যেন অভাগীর শোক-অশ্রুজল। ('মোক্ষদা'—৩)

কাকের ভাত-খাওয়ার কথা এ-কবিতায় না বল্‌লেও চল্‌তো ; কিন্তু ঐ একটি বর্ণনায় মোক্ষদার বৈধব্যের দারুণ দুঃখ তীব্রতর হয়ে আমাদের বুকে এসে লাগে।

একটা বাজে পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কারকে কবি যে নিজের কাব্যের সার্থকতার জন্য কি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন, তা দেখ্‌লে তাঁর এই realism-এর সুদৃঢ় বলশালিতায় মুগ্ধ হ'তে হয় :

যে বলে জীবিত তুমি, সে ত বলে ভুল,
সে তোমার প্রেতমূর্ত্তি দেখেছে নিশ্চয়;
আমতলে সন্ধ্যাকালে এলাইয়া চুল,
অমাবস্যা শনিবারে দাঁড়াইয়া রয় ('কুশপুত্তলিকা')

প্রায় গা-ছম্‌ছম্ করে ওঠে ! শনিবার, অমাবস্যার সন্ধ্যাকাল ও আমতলা সম্বন্ধে যে-জন্মগত সংস্কারের বীজ আমাদের মনে গুপ্ত হ'য়ে আছে, সেগুলো সব একসঙ্গে চাড়া দিয়ে ওঠে ; ফলে 'suspension of disbelief' সাধিত হয়, তখনকার মত সেই প্রেতমূর্ত্তিতে বিশ্বাস না করে' আমাদের উপায় থাকে না।

গোবিন্দচন্দ্রের 'পদলালিত্য' সম্বন্ধে খুব বড়াই করা চলে না ;—মাঝে-মাঝে বরং এমন-সব পদ পাওয়া যায়, যা সত্যি-সত্যি coarse। কিন্তু 'লালিত্য'ই কবিতার একমাত্র গুণ নয় ; কি গুণে যে আজ গোবিন্দচন্দ্র শ্রেষ্ঠ কবি বলে' পরিগণিত, সে-কথা আগে বলেছি। আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-কথা বলা যে গোবিন্দচন্দ্রের শ্রুতিশক্তিতে কবি-জনোচিত সূক্ষ্ম প্রখরতা ছিলো ;—নিজের অজানিতেই তিনি মাঝে-মাঝে ধ্বনিগৌরবময় পদ রচনা করে' ফেল্‌তেন। মধুসূদন বা দেবেন্দ্রনাথ অনুপ্রাস না করে' কথা বল্‌তে জান্‌তেন না ; তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মসচেতন শিল্পী ; কি কর্‌লে শব্দগুলোকে সবচেয়ে সুরময় করে' সাজানো যেতে পারে, তা তাঁরা ভেবে-ভেবে ঠিক কর্‌তেন। সেইজন্য তাঁদের অনুপ্রাসে একটি পরিচ্ছন্ন সম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র সচরাচর অনুপ্রাস ব্যবহার কর্‌তেন না ; অনুরূপ শব্দের কয়েকটি শব্দ যখন পর-পর এসেছে, তখন তা'রা পরস্পরের টানে অযাচিত ভাবেই এসেছে, কবি তা'দের জন্য মাথা ঘামান্ নি। সেইজন্য

নদীতীরে বিলে ঝিলে পুকুরের পারে,

সন্ধ্যা রেতে অন্ধকারে অথবা নিশীথে ('আলেয়া')

বা

অনন্ত বসন্তকাল রয়েছে ব্যাপিয়া,

নীলে নীলে মিলে মিলে জ্যোতি সমুদায়

('সারদার প্রেম')

এই সব পদের অনুপ্রাসে এমন একটি মনোরম freshness আছে, যা মধুসূদন বা দেবেন্দ্রনাথের সনেট্-এ পাওয়া দুষ্কর; যদিও মধুসূদনের পদগাম্ভীর্য্য বা দেবেন্দ্রনাথের মাধুর্য্য গোবিন্দচন্দ্রে নেই?

গোবিন্দচন্দ্রের সনেট্গুলি আগাগোড়া খাঁটি পয়ারে লেখা, অর্থাৎ লাইন্গুলি সব end-stop (দু' এক জায়গায় যদিও এর ব্যতিক্রম হয়েছে), এইখানে তাঁর কৃতিত্ব। আশ্চর্য্য এই যে শুধু form-এর ব্যপার ছাড়াও আরো কোনো-কোনো বিষয়ে শেক্স্পীয়ার্-প্রমুখ এলিজাবেথীয় সনেট্-কারদের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। নানারকম অতিরঞ্জিত অদ্ভুত 'conceit' গোবিন্দচন্দ্রে প্রচুর পাওয়া যায় ('ক্ষতি নাই', 'অবশিষ্ট', 'শ্রাদ্ধ', 'আত্ম-ঘাতী' প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য); এবং এই 'conceit' জিনিষটি খাঁটি এলিজাবেথীয় যুগের ফসল। তখনকার দিনে কবিত্বশক্তি বল্তেই লোকে নব নব conceit আবিষ্কার করার ক্ষমতা বুঝ্তো; এই জন্য শেক্স্পীয়্যর্ থেকে আরম্ভ করে' ক্ষুদ্রতম কবি পর্য্যন্ত সবার মধ্যেই এই বিশেষ অলঙ্কারের বিস্তর সৎ-বা অপব্যবহার দেখা যায়। গোবিন্দচন্দ্রের conceit গুলো grotesque হয় নি; অনেক ক্ষেত্রেই সুন্দর ও শোভন হয়েছে। এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধ হয় 'আলিঙ্গন' কবিতায় আছে। ও-কবিতার প্রথম চারিটি লাইন্ তুলে' দিচ্ছি :

ও নহে গভীর ঘন মেঘে অন্ধকার,

ব্যাপিয়া গগন নীল আছে দিক্ ছেয়ে,

ও জানি প্রলয়পূর্ণ আলিঙ্গন কার,

কাহার উদ্দেশে জানি কোথা যায় ধেয়ে!

'কোকিল' কবিতায় 'কু-উ' ও 'অলি' কবিতায় 'গুণগুণ' শব্দটি নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র যে-pun করেছেন, তাও এলিজাবেথীয় কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদ্ভিন্ন, তাঁর শেষের rhyming couplet গুলোর ব্যবহারও সম্পূর্ণরূপে এলিজাবেথীয় কবিদের অনুরূপ। শেষের দু'টি লাইনে তিনি যেন সমস্ত কবিতাটির মূল অর্থ সংহত করে' একটি এপিগ্রাম্-এর রূপে প্রকাশ করেছেন। এইজন্য তাঁর অধিকাংশ দ্বিপদীই প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'বার উপযুক্ত।

বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,

সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিষ। ('নারী')

বা

ও নহে শ্মশানে তার পোড়া ভস্ম-ছাই,

আমরা যা দিছি সে যে রেখে গেছে তাই। ('দাহ')

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গোবিন্দচন্দ্র-সম্বন্ধে আর আলোচনা এখানে নিষ্প্রোয়জন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বাঙ্লায় খাঁটি ইতালিয় ও ফরাসী ছাঁচের সনেট্ প্রথম আমদানি করেন। নিজের মুখেই তিনি স্বীকার করেছেন :

পেত্রার্কা-চরণে ধরি' করি ছন্দোবন্ধ

তাঁর সনেট্-এর form অনবদ্য হ'লেও ভাব অগভীর ও ভাষা হাল্কা; তাই সুলিখিত ও সুপাঠ্য light verse-এর লেখক-হিসেবেই বাঙ্লা কাব্য-সাহিত্যে তাঁর স্থান। তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্তকান্তিচন্দ্র ঘোষ ইতালীয়, ফরাসী ও পেত্রার্কীয়—ত্রিবিধ ছাঁচের সনেট্-রচনাতেই অভ্যস্ত; সম্প্রতি তাঁর সনেট্ সমষ্টি পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। আর একজন কবি গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 'প্রাচীন আসামী হইতে—'এই নাম দিয়ে অনবরত সনেট্ লিখে' আস্ছেন। প্রাচীন আসামী বলে' কোনো আলাদা ভাষা আছে কিনা সন্দেহ, আর যদি বা থাকে তো সে ভাষায় নিশ্চয়ই কোন সনেট্ লেখা হয়নি; কাজেই শ্রীযুক্তপ্রমথনাথ বিশী যে এলিজাবেথ্ ব্যারেট্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে' অনুবাদের মুখোসের আড়ালে নিজের authorship গোপন করে' আস্ছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের কথা পূর্ব্বেই বলেছি;—তাঁর সনেট্-এর সংখ্যা অত্যল্প, কিন্তু বাঙ্লা ভাষায় সব দিক দিয়ে perfect সনেট্ তিনিই লিখেছেন ('শ্রাবণ-শর্ব্বরী' স্মরণীয়) এবং তাঁর আধুনিকতম 'স্বপার্ট্রক্' তাঁর যশ বর্দ্ধিতই করেছে।

—

(৫)

বাঙ্‌লা সনেট্‌-সম্বন্ধে আর একটি সমস্যার উদয় হয়, যা অন্য কোন ভাষায় নেই। ইংরেজি ভাষার সমস্ত সনেট্‌ চিরাচরিত iambic pentametre বা heroic line-এ লেখা;—সবাই এক রকম লিখেছেন; এ নিয়ে কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু বাঙ্‌লা সনেট্‌-এ প্রতিটি পদের দৈর্ঘ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। চোদ্দ অক্ষরই খুব বেশি চলেছে—তারপরেই আঠারো। মধুসূদনের সব সনেট্‌ চোদ্দ অক্ষরের, রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই; শুধু 'যৌবন-স্বপ্ন' কুড়ি অক্ষরের হওয়াতে তা'র rhythm সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে;—কবিতাটি একটানে পড়া যায় না;—মাঝখানে যতি দিতে হয়;—যেমন,

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন। ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে। রূপসীর পরশের মত

দেবেন্দ্রনাথ চোদ্দ ও আঠারো দুই-ই ব্যবহার করেছেন—চোদ্দই বেশি। গোবিন্দচন্দ্র—আগাগোড়া চোদ্দ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও প্রমথনাথ বিশীও তা-ই। আবার মোহিতলালের সব ক'টি সনেট্‌-এর পদই আঠারো অক্ষরের। আমি বাইশ ও ছাব্বিশ অক্ষর চালাতে চেষ্টা করেছি।

দেখা যাচ্ছে যে চোদ্দ অক্ষরই কবিদের দ্বারা সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে—তার কারণ বোধ হয় এই যে পয়ারের অক্ষরসংখ্যা চোদ্দ। যতই না কেন নব-নব ছন্দ আবিষ্কৃত হোক্‌, বাঙ্‌গালীর মনে সেই সনাতন পয়ার যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে' আছে, তা কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। আর, পয়ারের মধ্যে কী প্রচণ্ড শক্তি যে আত্মগোপন করে' আছে, তা গোবিন্দচন্দ্রের 'অতুল' কবিতা পড়লে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সনেট্‌ রচনার পক্ষে এ কতখানি উপযোগী তা ভাববার বিষয়। চোদ্দ অক্ষরের চোদ্দটি লাইন-এ কতটুকু কথাইবা বলা যায়? এই সঙ্কীর্ণতার জন্য কবিতার ভাবটি হয়-তো আত্মপ্রসার করবার সুযোগ পায় না; গভীর নিষ্পেষণে খর্ব্ব হয়ে যায়। চোদ্দ অক্ষরে অনেক ভালো সনেট্‌ লেখা হয়েছে, কিন্তু এ-আশঙ্কা খুবই আছে। তা ছাড়া, কবিতাটি আকারে ও প্রকারে নিতান্তই ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়ে বলে' পাঠকের মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কুড়ি অক্ষরের লাইন্‌-এ মাঝখানে যতি পড়ে বলে সনেট্‌-এর অতি-আবশ্যক continuity থাকে না; কাজেই এ-ও খুব প্রশস্ত নয়। বা:শ বা ছাব্বিশ অক্ষরে লিখ্‌লে পয়ারের প্রায় দ্বিগুণ কথা বলা যায়; এতে কবির পক্ষে খুব সুবিধে, কিন্তু এতখানি সুবিধেই আপত্তির বিষয়। এ-ছাড়াও এত দীর্ঘ পদ ব্যবহারের আরো কয়েকটি অসুবিধে আছে। 'কল্লোলে' প্রকাশিত আমার একটি সনেট্‌ থেকে চারিটি লাইন্‌ দৃষ্টান্তস্বরূপ নেয়া যাক্‌:

আর-কিছু নাহি সাধ। জানি মোর তরে নহে জয়মাল্য, যশের মুকুট,
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হ'য়ে রজনীর সুনীল অঞ্চলে,
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান জাগিবে না নীল নভস্তলে,
মোর করস্পর্শে কভু লভিবে না শ্রদ্ধা-সিক্ত অভিষেক-পল্লব-সম্পুট।

প্রথমত, প্রথম লাইন্‌ থেকে চতুর্থ লাইন্‌-এর দূরত্ব এত বেশি যে মিল থাকা না-থাকা প্রায় সমান হয়েছে। তারপর প্রথম ও তৃতীয় লাইন্‌-এ আট অক্ষরের পর পূর্ণচ্ছেদ বসেছে—নইলে এতবড় লাইন্‌ সাম্‌লানো অসম্ভব। ফলে বাকি আঠারো অক্ষরে মিলে' যেন এক-একটি আলাদা পদ গঠন করেছে—পূর্ব্ববর্ত্তী আট অক্ষরের সঙ্গে কোনোই সংযোগ রাখে নি। ফলে, এখানেও সেই continuityর ব্যাঘাত হয়েছে—যা সনেট্‌-এ কখনো হওয়া উচিত নয়। পদের মাঝখানে ছেদ না থাক্‌লেও পড়বার সময় একটা কাল্পনিক ছেদ বসিয়ে নিতে হয়; কারণ এক নিঃশ্বাসে অত দীর্ঘ লাইন্‌ পড়ে' ওঠা সম্ভব নয়। কাজেই, খাঁটি সনেট্‌-এর সবগুলো লক্ষণ বজায় রাখ্‌তে গেলে এই ছন্দ অনুপযোগী। বাইশ অক্ষর সম্বন্ধেও একই কথা।

আমার মনে হয়, আঠারো অক্ষরের ছন্দই বাঙ্‌লায় সনেট্‌-রচনার সব চেয়ে উপযোগী। এর কারণ হচ্ছে এই যে তা ইংরেজি Iambic pentametre-এর corresponding বাঙ্‌লা ছন্দ। আঠারো অক্ষর এমন ছোট নয় যে ভাব-প্রকাশের পক্ষে কোনো ব্যাঘাত হতে পারে, আবার এমন বড়ও নয় যা'র দরুণ সনেট্‌-এর compactness

আলগা হ'য়ে যা'বে। আঠারো অক্ষরের পদ এক নিঃশ্বাসে সহজেই পড়া যায়—এবং মাঝখানে থাম্‌তে হয় না বলে, মিলগুলি স্পষ্ট হ'য়ে কানে বাজে, ও musicটি পূর্ণমাত্রায় শ্রুতি গোচর হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে অবিশ্যি কোনো নিয়ম বেঁধে দেয়া যায় না; কিন্তু আঠারো অক্ষরে লিখ্‌লেই কবিতার পক্ষে সনেট্-হিসাবে perfect হওয়া সব চেয়ে সহজ, এ-কথা মেনে নিতে দোষ নেই।

---

(৬)

'A Sonnet is a moment's monument'. জাপানী শিল্পী যেমন এক ইঞ্চি হাতীর দাঁতের ওপর একটা সমস্ত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে রূপ-দান করেন, তেম্‌নি সনেট্‌কারও সনেট্-এর নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে একটি মুহূর্ত্তের অসীমস্পর্শী আলোড়নকে নিত্যকালের মত বন্দী ক'রে রাখেন। একটি মুহূর্ত্ত—একটুখানি দেখা বা ছোঁয়া, কথা-বলা বা ভালো-লাগা—জীবনের ক্ষণিক বিপ্লব; কিন্তু কাব্যে তা'রি মধ্যে অসীম ধরা পড়েছে। শ্রেষ্ঠ সনেট্-এ আমরা যে-জিনিষটি দেখ্‌তে পাই, তা হচ্ছে, 'the instant made eternity. রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র প্রথমাংশের সবগুলো কথিকা উৎকৃষ্ট সনেট্-এ পরিণত করা যেত। রসেটির *The House of Life*-এর অনেকগুলো সনেট্ এম্‌নি এক-একটি মুহূর্ত্তের অক্ষয় স্মৃতি-সৌধ। এইজন্য প্রেমের কবিতা লেখ্‌বার পক্ষে সনেট্-এর মত উপযোগী form আর নেই। ক্রিশ্চিনা রসেটি ঠিকই বলেছেন, 'Sonnets are full of love'. কিন্তু দান্তে তাঁর পুরুষ-বন্ধুদের উদ্দেশ্যে অনেক বিখ্যাত সনেট্ লিখেছেন এবং পেত্রার্কা বড়লোক মুরুব্বিদের অবগুণ্ঠিত স্তব-গান করে" সনেট্ লিখে তাঁদের সন্তোষোৎপাদনের চেষ্টা করেন;—পরে এই ফ্যাশান্ সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে। যে সময়ে সনেট্ লেখার ধুম, তখন রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতি এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে রাশি রাশি সনেট্ লেখা হয় নি। তবু আজ পর্য্যন্ত লোকে সনেট্ বল্‌তে প্রেমের কবিতাই বোঝে, তার কারণ দান্তে পেত্রার্কার tradition. এই বহু কীর্ত্তি, বহুদেশের ও বহুকালের কাব্যরূপটি বাংলার কবি-মণ্ডলী নিজেদের বলে' গ্রহণ করে তার নবতর শ্রী-সম্পাদন করেছেন; লক্ষ্মণের মস্তক সীতার চরণস্পর্শ কর্‌লো;—কে যে কাকে ধন্য কর্‌লো ঠিক বোঝা গেলো না।

গত পৌষ সংখ্যায়, শ্রীরাধারাণী দত্তের-"প্রেম-প্রশস্তি" শীর্ষক কবিতায়—

দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ লাইনে 'সিদ্ধ'—'স্নিগ্ধ' হইবে।

তৃতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনের 'মানুষে'—'মানবেই' হইবে।

ষষ্ঠ শ্লোকের সপ্তম লাইনে-'উৎসনা'—'ভৎ'সনা' হইবে।

সপ্তম শ্লোকের প্রথম লাইনে—

"পাত্র খানি রিক্ত করি যত তুমি ঢেলে দাও" স্থলে—

"পাত্র খানি রিক্ত করি যত তুমি ঢেলে ঢেলে দাও" হইবে।

তখনও তুমি আস নাই ভাই

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তখনও তুমি আস নাই ভাই, ছিলাম অদ্বিতীয় ;
কবিতার বাতি জ্বালায়ে তাহারে রেখেছিনু রমণীয় ।
তবুও জানিত মন—
তৃতীয়ের তরে আছে তার চোখে দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ ।
বিপথ-অতিথি, জানি যে আসিবে,—তাই আমি কবে থেকে
অমাবস্যার রহস্য দিয়ে রেখেছি তাহারে ঢেকে' ।
নিকটের চেয়ে দূর যে অধিক আমি শিখালাম তারে ;
আমি যে আজিকে দূর,—সে-দুরাশা ভুলেছে সে একেবারে।
আছে সব ভুলিয়া সে,—
আকাশ হইতে নামায়েছি তারে বসাতে তোমার পাশে।
তোমার প্রিয়ার এত যে আদর চোখের চাহনি বেচি',
জান কি বন্ধু, সে চোখের মায়া আমি তারে শিখায়েছি ।
জান কি বন্ধু, হায়,
তোমার প্রিয়ারে অমর করিনু আমার এ কবিতায় ।
করতলে সেবা, বুকে অমৃত, নয়নে দিলাম আলো,
যদি পার, বেশি, নতুবা আমারি মতন বাসিয়ো ভালো ।
তোমারি চুমার তরে
আমার চুমায় লালিমা লেপিনু তাহার ওষ্ঠাধরে ॥

—

ভুলে যাওয়া

জাহাঙ্গীর ভকীল

সত্যিই আমার বয়স হয়েছে। চুলে কবে পাক ধরেছে মনেই নেই। প্রায় ত্রিশ বছর আগে যখন নিজের মাথায় একদিন প্রথম সাদা চুল দেখলাম, মনে হল যেন কি একটা ছোট খাটো প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে। অবুঝের মত আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে জুলিয়াস সীজার-এর কথা মনে পড়েছিল। সীজারের মত দিগ্বিজয়ীও নাকি, পাকা চুলের লজ্জায় মাথায় ফুলের মালা প'রে বেড়াতেন ; যুদ্ধের সময় ছাড়া, কেননা সে সময় অপ্রস্তুত করবার লোকের অভাব হ'ত বোধ হয়। বেশ মনে আছে, সীজারের মত লোকের সম্বন্ধে এমন কথা যখন পড়্‌লাম একটা রোমান ঐতিহাসিকেরই বইতে, তখন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। এত ছোট কথা যে, অত বড় লোকের মনের মাঝে বাজে কি ক'রে, তা বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না। তখন আমি ছিলুম ছেলেমানুষ, পৃথিবীর সমস্ত ভার কাঁধে ক'রে কপাল কুঞ্চিত ক'রে বেড়াতুম। আজও বোধ হয় যাঁরা পণ্ডিত, অথবা যাঁদের বয়স অল্প, তারা বুঝ্‌তে পারবে না এই ছোট ঘটনার মহিমা ; কিন্তু যারা দুঃখ কষ্ট পেয়ে এ জীবনকে ভালবাস্‌তে শিখেছে তারা জানে, আমি জানি, আর সীজার জান্‌তেন যে, এ জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি কেমন একটা করুণ রসে ভরপুর।

অনেক বছর আগেকার কথা। ঘটনাটি যে আমারি জীবনে ঘটেছিল তা এত কাল পরে যেন বিশ্বাসই হ'চ্ছে না। আর তার উপর সেকালে ফিরে যাবার জন্য এই দীর্ঘ বৎসরের বনের মধ্য দিয়ে, যেন পথ কেটে কেটে যাওয়াও দায়।

কলকাতা থেকে বোম্বাই হ'য়ে সেই প্রদেশের একটি ছোট সহরে যাচ্ছিলাম। দাদা সেখানে জজীয়তি ক'র্‌তেন। বোম্বাই থেকে রাত নটায় আমার গাড়ী ছাড়্‌ল'। আমার সঙ্গে দুজন আরোহী,—একজন বৃদ্ধ আর একটি মেয়ে। গাড়ী ছাড়্‌বার আগে তাঁদের ভাল ক'রে দেখ্‌বার অবসর পাই নি। মাল গোছাতে ব্যস্ত ছিলুম। যখন গাড়ী ছাড়ল বৃদ্ধটি বাতি কমিয়ে দিলেন—তখনকার সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতেও বাতি থাকতো। ক্ষীণ আলোকে দেখলুম বৃদ্ধ গায়ে চাদর দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। তাঁর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ্‌ দুটি যেন গাড়ীর বাহিরের অন্ধকার বিদ্ধ ক'রছে। মনে হ'লো তিনি মুসলমান। তাঁর ঠোঁটের সরু রেখাগুলির উপরে তাঁর কাটা গোঁফ্‌টি একেবারে সাদা দেখাচ্ছিল। কি যে ভাব্‌ছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর মুখের উপর আমার চোখ্‌ পড়্‌তেই চোখদুটি তাঁর শান্তভাবে বন্ধ হয়ে এল। তাঁর উপরের সিটে বিছানা পেতে মেয়েটি শুয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে আমি, স্ত্রীলোক দেখে ভয় পেতাম না, বিশেষ লজ্জাও করতাম না, তাহলেও সে সময়ে স্বাভাবিক লজ্জার অভাব আমার মধ্যে ছিল না। এখনকার মত বল্‌তে হবে, সে সময়ে ঔদাসীন্যের প্রতি আমার একটু আতরিক্ত ঝোঁক্‌ ছিল। অর্থাৎ একটু মহাত্মা মহাত্মা গোছের ভাব ছিল আর কি। থিয়েটার যাওয়া পাপ মনে কর্‌তাম। ইংরাজি মাসিক পত্রগুলিতে, সেখানকার অভিনেত্রীদের ছবিগুলি দেখ্‌লেই আমার রুচি জ্ঞানে আঘাত লাগতো, কান লাল হ'য়ে উঠ্‌ত'। আজকাল ও-সব কথা মনে পড়্‌লেই সশব্দে হেসে উঠি। চাকরগুলো কানাকানি ক'রে বলে—"বুড়ো বুঝি আবার ক্ষেপে গেছে রে!" ভাবে আমি বুঝি, তাদের কথা শুন্‌তেই পাই না। তারা আমাকে কালা মনে করে। দুর্ভাগ্য যে, কালা আমি নই। সেই জন্য বিরক্তির চোটে ঘোড়ার মত আর একটা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মোটা গলায় এক একটা বাজে কসুর্‌ ক'রে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিই, আর চাকরটা একটু দেরি কর্‌লেই, তার উপর সব আমার বিলেতে-শেখা গালির কামান বর্ষণ করি। গিন্নী নাই, কি করি,—চাকরদের নিজেই শাসন করতে হচ্ছে। তা সে যাই হোক—বল্‌ছিলাম, বৃদ্ধের উপরের সিটে মেয়েটি বিছানাপেতে শুয়েছিল। নিজের

মনকে বলেছিলাম 'তার দিকে চাইতে নেই'। কিন্তু চোখ্ কেবল সেই দিকেই যেতে চায়, মনকে চোর বানালে তো তার নজর বেশী করে পুঁট্‌লির দিকেই পড়বে। গাড়িতে ভারতবর্ষের একখানা ম্যাপ ছিল, তারি উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখ্‌তে চেষ্টা করলাম। নিজেকে বল্লাম—ভারতবর্ষের বড় বড় সহরগুলি ঠিক কোন্‌খানে, কোন্‌টি কার উত্তরে বা দক্ষিণে সে সব আজপর্য্যন্ত ঠিক কর্‌তে পারি নি, এখন তাই করা যাক্। এমন সুযোগ আর পাব না। কিন্তু হায় 'এমন সুযোগ'ও কাজে লাগ্‌লো না। নক্সাটার কাছে যেতে হুঁস হল যে, এমন আলোতে সাধারণত কেউ ম্যাপ দেখে না। বিরক্ত হয়ে বসে পড়্‌লাম। আবার সেই মেয়েটির দিকে চোখ ফির্‌তে লাগলো—আস্তে আস্তে, চোরের মত। এইবারে চোখ একেবারে বন্ধ করে ফেল্লুম। মনে মনে বল্‌তে লাগলুম—'আমার ও দিকে দেখতে কোনো ইচ্ছা নেই, কোন ইচ্ছা নেই"—আর বাস্তবিকই কোন ইচ্ছা ছিল না। তবে কেমন যেন মনে হল যে, ঐ কথাতেই আমার ভিতরে ভিতরে সেই দুষ্ট প্রবৃত্তিটি যেন বিদ্রূপের মৃদুহাস হাস্‌লো। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। তখন মনের অবস্থা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। রাগ করে বল্লাম, 'এত হাঙ্গামা কিসের? এমনি করেই ত' তুচ্ছকে বড় করে তোলা হয়। ওদিকে না দেখার চেয়ে, দেখাই ত শতগুণে ভাল। কাজ নাই বাপু, অত অশান্ত জাগিয়ে তুল! মনে মনে Oscar wilde মৃদু হেসে বললেন,—"The best means of overcoming a temptation is to yield to it. তাইত! না হয় একবার সে দিকে তাকালেই বা, তাতে এমন কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে!" তার পরে তাকালাম মেয়েটির মুখের পানে। বাপরে! বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ক'রে উঠল। এমন বিশ্রী দৃশ্য দেখিনি কখনো। মেয়েটির রং কুৎসিত, কালো, আর তার চেয়ে কদাকার—মুখের উপর কালো কালো সব দাগ। বিষাদে, ধিক্কারে মনটা সিঁটিয়ে উঠ্‌লো। তাকে আমি কি যে ভাবলুম মনে পড়লে এখনও আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। পাশ ফিরে মুখের উপর লেপ্ টেনে দিলুম। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লাগল। সে অপরিচিতার কাছ থেকে আমি কি প্রত্যাশা করেছিলুম যে তার কুরূপ নিয়ে আমার এত দুঃখ ক্লেশ! মন আমার দল-ছাড়া আহত হরিণীর মত নৈরাশ্যে বিহ্বল হয়ে উঠলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তরে বাহিরে আমার যেন কি একটা ভেঙ্গে গেছে, যেন প্রকাণ্ড একটা ছারখার হয়ে গেছে, তারই চূর্ণ বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিয়ে সারা অন্তরের ক্ষেত্রটি আমার ভরে উঠলো। ভেঙে যাওয়া খেলনাটির উপর অভিমানী শিশুর মুক্ত কণ্ঠের কান্না যেমন সত্যি, যেমন গভীর তেমনি অন্তর-বাহির-ব্যাপী ছিল সে আমার নবীন হৃদয়ের চাপা কান্না। মধ্য বয়সের স্থূল মনোভাব বশতঃ আমি এই কান্নাটিকে অতিশয় হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছি বহুবার, কিন্তু আজ আর সে দুঃসাহস আমার নেই।

এমনি ভাবে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাট্‌লে, আবার ভোর হবার একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। চোখের উপর এক ঝলক সূর্য্যের আলো পড়াতে যখন ঘুম থেকে উঠ্‌লাম তখন বেলা প্রায় আট্‌টা। বৃদ্ধটি আমার সামনের সিটের উপর বসে আছেন আর তার একটু দূরে সুন্দর একটা মেয়ে। মেয়েটির হাতে কালো একটা পাতলা ওড়্‌না। দেখেই মন আমার চাবুক-খাওয়া তেজস্বী ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল। রাত্রি বেলাকার ঘরে-ঢোকা বাদুড় যেমন ভাবে অন্ধ বেগে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটী করে বেড়ায়, তেমনি ভাবে আমার চোখের চাওন, মেয়েটির মুখশ্রী থেকে তার হাতের কাপড়টায় আর সেখান থেকে তার মুখের উপর ছুটোছুটী করে বেড়াতে লাগল। বুঝলাম মেয়েটী ঘুমোবার সময় এই কাপড়টী মুখের উপর মশার উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বা যে কোনো কারণেই হউক—আবরণরূপে দিয়েছিল। লজ্জায় মরে গেলাম। এই কাপড়টী ছিল তবে ওই প্রশান্ত শিশু-কোমল চাঁদ মুখের কলঙ্ক! গত রাত্রির লজ্জা আমার আজিকের প্রবলতর আনন্দের স্রোতে ভেসে গেল! মনে হল মুখের উপর যে সূর্য্যের আলো পড়্‌ছিল সে যেন কোন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত আমার কপালে

স্পর্শ করেছে। সকাল বেলাকার বাতাসে আমার বিগত রাত্রির গ্লানি মুখের উপর থেকে মুছে নিয়ে গেল। তাড়া তাড়ি উঠে মুখ ধোবার জন্য স্নানের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম, পাছে তাদের কাছে আমার মনের আবেগটা ধরা পড়ে যায়।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জমে গেল। জানতে পারলাম তিনি নিকটেই কোন একটা সহরে ওকালতী করেন। মেয়েটী তাঁর বন্ধুপুত্রী। তাঁরা মোকদ্দমা করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন। সামনের ষ্টেশনেই তিনি নাম্‌বেন। মেয়েটী দুঘণ্টা পরে 'হুরালি' নামক একটা ষ্টেশনে নাম্‌বে, বৃদ্ধের অনুরোধ তাকে যেন আমি একটু দেখি। খানিক পরে সত্যিই তিনি নেমে গেলেন। গাড়ির মধ্যে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ রইল না। কয়েক মিনিট অস্বস্তির মধ্যেই কেটে গেল।

এক সময় মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই চমৎকার! একখানি পদ্ম যেন টলটল করছে। মুখের ওপর দ্বিধাহীন অসংকোচ লাবণ্য। অকুণ্ঠিত, শান্ত, আত্ম-সমাহিত! শ্রাবণের আকাশ যেন পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি নিয়েছে। সে যেন একখানি শীতলকায়া পরিপূর্ণ নিশীথ-নদী, হঠাৎ চৈত্ররাতের চন্দ্রালোকের ছোঁয়ায় মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে গেছে।

হরি হরি! এক ধাক্কায় আমার Logic পড়া মন সজাগ হয়ে উঠলো। দেবী হঠাৎ মানবী হয়ে দেখা দিলেন। দেখি আহারের আয়োজন কচ্ছেন। ধীরে সুস্থে একটি কমলালেবু ছাড়িয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—'খাবেন?'

শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম,—কিন্তু কি যে বলেছিলুম আজ আর মনে নেই। তবে এ মনে আছে, আপত্তি জানিয়েও কমলালেবুটি হাত পেতে নিয়েছিলুম; এবং মেয়েটি চাপা হাসি হেসেছিল। সে হাসি এমনিই যে দুজনের আলাপ জমে উঠ্‌তে দেরি হল না! মনে হতে লাগ্‌লো যেন দুই পুরাতন বন্ধুর পুণর্মিলন হয়ে গেল।

আমার অনেক কথা যা বোধ হয় অন্য কাউকে বলিনি সেগুলি কেমন করে যেন এই ক্ষণিকা বান্ধবীটির কাছে অকপটে বলে ফেল্‌লুম। সেও আমাকে নিজের অনেক কথা বল্লে। নিজের কথা উপযুক্ত শ্রোতার কাছে প্রকাশ করবার, সে বয়সে কেমন যেন একটা আকাঙ্খা থাকে! আর তেমন লোক পেলেই তার কাছে এই যৌবন-ভার নামিয়ে দিলে কি তৃপ্তিই যে পাওয়া যায়, সেদিনকার সেই পথলব্ধ বন্ধুত্বের ছায়ায় দুজনে বসে যেন জীবনের শ্রান্তি, ক্লান্তি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিছলুম।

কোন্ একটী ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। দুজন সাহেব তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। তাঁদের ব্যাগ-এর উপর চিহ্নগুলি দেখে বুঝলুম তাঁরা মিশনারী। মিনিট কয়েক পরে ছোট একটি ষ্টেশনে এসে আবার গাড়ী থাম্‌তেই মিশনারী দুটি নেমে গেলেন। মেয়েটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—"আঃ বাঁচ্‌লুম! কালো বেড়াল আর মিশনারী—এদের আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।"

হেসে জিজ্ঞাসা করলুম—'কেন'।

'আমি খৃষ্টান, সেই জন্যেই।'

'আপনি খৃষ্টান?'

অকৃত্রিম সহজ স্বরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু আমার মুখ শুকিয়ে গেল। উত্তরে আস্তে আস্তে গম্ভীর ভাবে দুবার ঘাড় নেড়ে সে তার দুটি ব্যথিত চোখ্ আমার দিকে তুলে ধর্‌লো। তার সে করুণ একান্ত দৃষ্টি থেকে চোখ্ সরিয়ে নিতে হল।

কিছুক্ষণ পরে সে নিজের কথা বলতে সুরু করলে—"বাবা খৃষ্টান্ হয়ে গেছিলেন আমার জন্মের আগে। আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দু-সমাজ, হিন্দু-আচার বিচারের প্রতি তাঁর একটা ভয়ানক অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল'। ছোট বেলা থেকে আমাকে হিন্দুদের বাড়ী যেতে দিতেন না। তাদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেখ্‌লেই বারণ করে দিতেন। সে সব আমার ভয়ানক অন্যায় বলে মনে হত', তাই বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লুম। একদিন—তখন আমার বয়স তেরো—বেশ মনে আছে—Good Friday-এর দিনে, হঠাৎ বলে বসলাম আমি আর চার্চে যেতে পারব না। মা কাণে আঙুল দিলেন, বাবা লাফিয়ে উঠে বল্লেন—"কি বল্লি, হতভাগী?" অনেক সাধাসাধি রাগারাগির পর বাবা এমন চোটে গেলেন যে আমার মত বড়মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। এর আগে তিনি কোনদিন আমার গায়ে হাত তোলেন নি। মেঝের

উপর লুটোপাটি করে দু'ঘণ্টা ধরে কান্নাকাটি করলুম। কেউ যেন লক্ষ্যই করলো না। শেষে যখন মেঝেয় মাথা ঠুকে রক্ত বের করলুম, বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে পাদরী সাহেবকে ডেকে আনলেন। তিনি অনেক চেষ্টায় আমাকে শান্ত করলেন। কিন্তু সেদিন আর তার পরদিন কিছু খাইনি বলে, তিন দিনের দিন পাদ্রীসাহেব আবার এসে খুব খানিকটা ধমক দিয়ে গেলেন।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েটির মুখখানি কঠিন হয়ে উঠলো। তাকে দেখে আমারও মধ্যে বিদ্রোহী যে মনটি ছিল' সেও সমান তালে তালে নেচে উঠল। তার মুখ খানির স্বাভাবিক মাধুর্য্য, আর ঐ আকাশ্মিক ইস্পাতের মত কাঠিণ্য এই দুইয়ে মিশে তাকে কি অপূর্ব্ব ভৈরবী রূপে দেখাল, তা বলা অসম্ভব।

পাদ্রী সাহেব বল্লেন—'চার্চে না গেলে তুমি নরকে যাবে'। আমি হেসে বল্লাম বেশতো"। যাই হোক,—এই একবছর ধরে তারা আমার উপর যত অত্যাচার করতে পারলেন করলেন; কিন্তু সেদিন থেকে খৃষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখ্‌লুম না। যতদিন বাবা বেঁচে আছেন, নামে থাক্‌বো খৃষ্টান, তারপরে আর্য্য সমাজী হয়ে যাব। দেশের কাজ করব।" ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে থাম্‌লো। আমিও অন্য দিকে মুখ ফেরালাম, কিন্তু মেয়েটির রূপ আমার সমস্ত অন্তরকে ছেয়ে ধরেছিল। একটু পরে বল্লে—'মিশনারীরা আমার জীবনে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশের লোককে তারা ঘৃণা করে। আমাদের যত হীনতা দুর্ব্বলতা বড় করে দেখা ও জগতকে দেখানই তাদের চেষ্টা। আমাদের যা শ্রেয় তাকে তারা বুঝ্‌তে পারে না, বুঝ্‌তে চায়ও না। তার মাহাত্ম্যতো স্বীকার করবেই না, কেননা তাহলে তাদের ব্যবসা আর থাকে না। যাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরও তারা শেখায়, দেশের লোককে ঘৃণা করতে। আমাদের দেশের কাছ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নেবার কত রকমের, আর কত একাগ্রভাবে তাদের যে চেষ্টা তা আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি। কিন্তু আমার উপর এর প্রভাব ঠিক উল্টো হয়েছে। ঐ সব বিদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতা ভেদ করে আমাদের দেশের বাণী, দূরাগত সঙ্গীতের মত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করত। সে সঙ্গীতের তালে তালে আমি একটা স্বপ্ন-দেশ খাড়া করলাম, তার নাম দিলাম 'ভারতবর্ষ'!—আমার সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে ওঠে। যে সব প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনের অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, সে আমি আমার 'ভারতবর্ষে' পেলাম। সে আমার কল্পতরু। একটু থেমে, চোখ বুঁজে চাপা গলায় বল্লে—আমি যিশুকে খুব ভক্তি ক'রতে পারতাম যদি না মিশনারীরা তাদের নিজেদের ক্ষুদ্রতা দিয়ে তাকে এমন লেপে দিত। তাও আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। অসম্ভব নিশ্চয়—একশোবার!—"শেষের কথাটি প্রায় উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠ্‌লো। তার চোখে জল এল তাও দেখ্‌লাম। চোখ মুছে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঠোট দুখানি শুধু কেঁপে উঠলো। অকস্মাৎ কি এক অপূর্ব্ব আবেগে ইচ্ছা হল' তার মুখখানি আমার বুকের মধ্যে টেনে নিই। কিন্তু লজ্জা হল। আমার সে মধুর দুর্ব্বলতার মধ্যে ভাইয়ের, মায়ের ও প্রিয়তমের ভালবাসার এক সুন্দর প্রকাশ থাকৃতো—যা এ জীবনে দুর্লভ; অথচ যাকে পাপ বলে মানুষ নিজেকে খর্ব্ব করেছে।

চুপচাপ বসে রইলাম সে ও মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে লাগল। টেলিগ্রাফ পোষ্ট একটার পর একটা, গাছের পর গাছ, ক্ষেতের পর ক্ষেত, দূর থেকে ছুটে এসে আমাদের পাশ কাটিয়ে নেচে চলে যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় ক্ষেতে হরিণের দল আকাশের কোলে চক্রাকারে শিকারী শ্যেনপক্ষীর ঝাঁকে—আকাশ আর মাটী যেন এক হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ যেন একটা নিস্তব্ধতার বিচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেল; কিন্তু তখনও তার কণ্ঠের আওয়াজটি গাড়ীর মধ্যে চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

এই ত ঘটনা। এ কল্পনা নয়, কোনো প্রেমের ইতিহাস নয়—এ কোনো রোমান্স নয়। ঘটনাটি যেমন ঠিক—তেমনিই। কতকগুলি মুহূর্ত্তকে আশ্রয় করে যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে জমে উঠেছিল তাকে কোনো স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে তোলবার মত প্রবৃত্তি আমার নেই—হয়ত বা তারও ছিল না।

পরের ষ্টেশন আস্‌তেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। বল্লুম—'এবার তাহলে চললেন?'

মৃদু হাসলে। পরে কৃতজ্ঞ চোখ দুটি তুলে একটি নমস্কার করলে।

আমার বল্‌বার কথা তখন ফুরিয়ে গেছে। তার সঙ্গে কথা কইতে পাওয়া জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব—তাকে হারানো জীবনের প্রকাণ্ড ব্যর্থতা। অকস্মাৎ সেদিন আমি নিজের অন্তরের মধ্যে সীমাহীন মরুভূমির সন্ধান পেলাম। তবু চুপ করে থাক্‌তে পারলুম না। বললুম—'আপনাকে ভুলে যাবো—এই কথাটাই আমার চিরদিনের সাধনা হয়ে রইলো।'

মেয়েটি বললে—'এত বড় সম্মান আমাকে আজ অবধি কেউ দেয় নি। ধন্যবাদ জানিয়ে একে আমি ছোট করতে পারবো না।—যাই হোক্‌ অনেক বাচালতা করে গেলাম মার্জ্জনা করবেন!

পা বাড়িয়ে গাড়ী থেকে নাম্‌তেই বলে উঠ্‌লুম—'কিন্তু একটি কথা যে কিছুতেই বল্‌তে পার্‌লুম না!'

'সব কথাই কি বলতে হবে?'—কিন্তু—কিন্তু,—মুখ ঢেকে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চলে গেল।

* * * *

সে ত' শুধু তার চলে যাওয়া নয়,—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তৃপ্তি-আনন্দ, আমার নির্জ্জনের শান্তি, জীবনের সমস্ত সাধারণ আরামের কল্পনা,—সমস্তটা নিয়েই সে চলে গেল।

কিন্তু আজও ভাবচি তাকে ভুলবো—ভুলতে তাকে হবেই। নৈলে নিশ্চিন্ত মরণের মত আজও সে আমায় নিঃশব্দে আলিঙ্গন করে থাক্‌বে—এ বোঝা আমি বইতে পারব না।

হায়রে বার্দ্ধক্য।

শান্তিজল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঙালী অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে কেঁপে উঠলো। হুঁকো থেকে কল্‌কেটা পড়তে পড়তে-একটু কাষ্ঠ-ত্যাগ করেই রয়ে গেল!

"চম্‌কে উঠলে যে!"

সাম্‌লে বললে,—"আরে—তুমি? এসো এসো ভাই।"

"তুমি মানে?"

"আমি ভেবেছিলুম—বন্ধু হবে"।

"আর-আমি?"

"আরে ভাই সে বন্ধুনয়—সে বন্ধুনয়,—শাস্ত্রীয় বন্ধু,—রাজদ্বারে যাঁরা সঙ্গ নেন্। যাঁদের দেখলে অন্তর-আত্মার এক অনির্ব্বচনীয় সুড়্‌সুড়ি লাগে,—শিউরে দেয়। তুমি তো আজ পাঁচ-বচর পরে এলে—বন্ধু হবে কখন্ বলো।"

কাঙালীর কথাবার্ত্তা ওই রকমই।

বললুম—"তা বটে,—জানইত'ভাই—Forest-Department, বাঘের মুখে চাকরি,—

"অ্যাঁঃ তবে—ফিরলে কি ক'রে,—সব ফোক্‌লা বুঝি? সেকেলে,—না?"

বললুম,—"ফোক্‌লা হবে কেনো?"

কাঙালী খুব উৎসাহের সহিত বললে—"তবে চলনা যাই, 'Servent-Pass' পাওতো?"

এ-সখ্ কেনো—তবে তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের দেখবার......

"তার জন্যে নয় হে—তার জন্যে নয়। কবিদের আবার গিয়ে দেখতে হয় নাকি, তাঁরা seers, ঘরে বসেই সব দেখেন। পদ্যপাঠ ভুলে গেছ নাকি? সেই কথাই তো ভাবছিলুম্- তুমি এলে।"

"কি কথা?"

"আরে ভাই—যদুগোপালবাবু কোন্নগরে বসে—এসত্য কি-করে আবিষ্কার করলেন—"

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান,

সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।"

—তবে স্রষ্টা কিনা,—শেষটা সুখের পথটা বাত্‌লে দিয়ে খুব সামলেছেন—

"কি রকম?"

"লক্ষ্য করনি"—

—"নদী হ্রদ তড়াগেতে সলিল প্রচুর"। আর কি বলবেন?

কাঙালীর কথা শুনে হাসতে পারছিলুম না,—সুরটা তো রহস্যের নয়!

বললুম—"ও-সব উপভোগ্য কথা সন্ধ্যে বেলা বসে শুনবো। এখন বলতো—আছ কেমন?"

"আরো বলতে হবে? মধ্যবিত্তের গণ্ডী পেরিয়ে পড়েছ দেখছি। বেঁচে গেছ ভাই। তবে আর শুনোনা।"

শুনে মনটা ব্যথা পেলে। কাঙালী যেমন সহৃদয় তেমনি আমুদে ছিল। এই চণ্ডীমণ্ডপই ছিল আমাদের অষ্টপ্রহরের আড্ডা, কত উৎপাতই সয়েছে। আজ—এ কেনো! নিশ্চয়ই কোথাও কষ্ট ঘনিয়ে উঠেছে। বললুম—

"ও সব কথা এখন থাক্। আমার চেয়ে মধ্য অবস্থার লোক আর নেই,—আপিসে ঢুকলেই মিষ্টার লায়ন্‌,—বেরুলেই বাঘ। যাক্, তোমার মনটা তো কখনো এমন উদাস—নির্লিপ্ত দেখিনি"!

বললে—"ছুটিটে উপভোগ করতে এসে কেনো ভাই তার মধ্যে একটা বেমানান উপসর্গ ঢোকাবে! শুনবেই যখন—শোনো;—নতুন কিছুই নয়।—তোমরা ইন্‌টেলিজেন্ট ছেলে, একমাস **Audit**-এই আন্দাজ করে নিতে পারবে"।—

কাঙালী বললে—

"মধ্যবিত্তের মন আর কবে ভালো থাকে কানাই,—তায় তিন-সহোদরের সংসার। জানইত'—দুজন ফার্টাইল(Fertile) ফ্যামিলি ফেলে—একজন কলকেতায় মেডিকেলে, একজন বিদেশে কেরানিকেলে,—আমি বাড়ী আগ্‌লে।

বিশখানা পঞ্জিকায় নোটিস্‌ দিয়ে মা-আনন্দময়ী এলেন—মালগুজারি মেটাবার তিনদিনের মহলৎ দিয়ে,—একেবারে তারিখ ফেলে"।—

"এ-তো ভাই রেল্‌-কোম্পানী নয় যে—ছিটে, ফোঁটা, খুদে, কণিকা, কর্ণিকা, ছটাকীকে কোলে করে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। সব চানের বাড়ীর জুতো—বড় ছোট নেই—সুপেয়া সমান দেবে। ভগবান কৃপা করে সাতবচরেরটিকে আড়াই বচরের কর্দ্দায় ফেলে রাখলে কি হবে,—সুপেয়া সমান দেবে!—

—"সুতরাং সোজা রাজ-পথ ধরে—On demand লিখে Command তামিল করতে হয়,—সকলের মুখে হাসি ফোটাতে হয়!

—"এখন সব বলেন—অতীতের কথা কয়ে বৃথা গর্ব্ব করায় পৌরুষ নেই। ভুলতে পারি কই দাদা, ভুলতে দেয় কে! ষষ্ঠীর-দিন যে নব-বাসে নব-বেশে গুষ্টিবর্গ সেজে—মাটীর কৃপা-লব্ধ কুচো-নৈবিদ্যিগুলি আজো সাজাতে হয় বন্ধু! তাঁরা সাজেন ও সাজান,—আমি ঘন ঘন তামাক সাজি। ভাবি—শরতের শোভাই ত' এই,—কবির কাশফুলও নয়—সেফালীও নয়। সে ত' ফাঁকির মার,—এযে চামড়া নিয়ে ওঠে!

—"মা দিব্যি দোলায় চলে গেলেন,—দোলার বন্দোবস্ত করে—আমার। অবশ্য দূরদৃষ্টি দিয়ে। যে-হেতু—তারপর থেকে চঞ্চল হয়ে চারদিক্ চাইতে হয়—পথের প্রান্ত পর্য্যন্ত,—পাওনাদার আসছে কি না। তাদের কি বল্‌বো—সেটাও ভেঁজে রাখবার সময় চাই তো।

"ক্রমে প্রত্যুৎপন্নমতি দাঁড়িয়ে গেল!"

* * * *

—মাস না ফিরতেই শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া!—আবার যে অতীতের স্মৃতি জাগায় বন্ধু! সেই-টাকায় আড়াই মোন চাল, সাত মোন ধান, আড়াই সের ঘি—সাতসের তেল্! এখন সেটা যে ভানমতির খেল্"।—

—"তাই না কবির এত সাধাসাধি—"

"হে অতীত কথা কও—কথা কও"।

কথা আর কইবেন কি। মনের অগোচর পাপ নেই। ভবিষ্যতের ইজ্জৎ রাখবার কথাটা কি একবার ভেবেছিলেন। যাক্.........

"মা-ষষ্ঠী, প্রসাদপুর, আর পাঁচুঠাকুরের লম্বা liberalityর কৃপায়—"

"বাড়ীতে নয়টী কন্যা আর তাদের পঁউনেতিনটী ভ্রাতা।"

"বড়-বউদি এসে একগাল হেসে বল্‌লেন,—ছোটবউয়ের কোলের পোঁটাকেও সবাই ফোঁটা দেবে। তাদের উৎসাহ

যদি ভাখে! ওর ছেলেদের কাপড়গুলো,—বুঝলেতো! আমাদের যা হয় আমলেই হবে। সব বেঁচে থাকুক, দেখো এমন সুন্দর দেখাবে,—দালানের এ-মুড়ো ও-মুড়ো কি আনন্দ বলদিকি"!

বললুম,—"তা আর বলতে! তা সবাই মিলে তিন ভাইকে তিন-খানা দিলেই তো হবে?"

"ওমা—ওকি কথা! ওদেরই আমোদ;—আজ সাত দিন ধরে সবক'টা সিন্দুক উট্‌কে—রেকাবী বার্ করেছে এক রাশ্! দেড়-শো বচর আরশোলার জিম্মের জিনিষ—তার দাগ্ কি ওঠে! আবার নিজেরা সব খাবার সাজাবে,—কারুকে হাত দিতে দিবেনা। যেন পাকা গিন্নি"!—

—"দশবারো রকম ভালো ভালো খাবার আনা-চাই ঠাকুরপো,—তোমার পচন্দ ভালো। দেখিনা কেমন সাজায়। ঐ সঙ্গে ছাঁচি পান, জৈত্রী আনতে ভুলোনা যেনো"!

বললুম—"অত'-সব খাবে কে বউদি!"

"নেম্-কম্মো—ওতে খুঁৎ রাখতে আছে কি? এটি আবার যে সে নয়,—যমের দোরে কাঁটা দেওয়া যে! এ করাই চাই, গরীব দুঃখিরাও করে।"

"আমাদের চেয়ে গরীব কেউ আছে নাকি বউদি!"

"চুপ্ করো,—ও অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌তে নেই। আমরা গরীব হতে গেলুম কেনো!"

পরে ইঙ্গিতে জানালেন—"ছোটবউমা শুনছেন। এবং "আনন্দটা তোমারি বেশী হবে—তখন দেখে নিও"।

"এখুনি কোন্ কম্ হচ্ছে বউদি!"

"তবে"!

—চলে গেলেন।

বললুম—"আটমাসের পেঁটারও যখন কেঁাটা চাই' তখন আমার তরেও একটা লোটা বার্ কোরো বউদি"।—

বোধহয় শুনতে পেলেন না।

সেকেন্দরী গজের দেড় গজ নিশ্বেস—হাউয়ের মত বেরিয়ে গেল,—অবশ্য আমার।

* * * *

বেণী-মাষ্টার বহুকষ্টে আমার মাথায় ত্রৈরাশিক ঢুকিয়ে-ছিলেন,—তাঁর বেত্ আজ কাজ দিলে। কি মুক্তহস্তই ছিলেন!

—যদি নয়জনে প্রত্যেককে একখানা করে কাপড় দেয় তো তিনজনকে ক'খানা দিতে হবে?

অতীত আজ চেঁচিয়ে কথা কইলেন—সাতাশ!

বর্ত্তমান আমাকে শিউরে উঠতে দেখে বল্লে—

—তাবলে' সাতাশ শুনে, হতাশ হলে

চল্‌বেনারে চল্‌বেনা।

"চলছে আর কবে!"

তবে, —উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার—খোলাই ছিল। উত্তমর্ণ উদার—এবং দেদার! কম্বল ক্রমেই ভারী! বড় দোকানেই ঢুকলুম। শুঁই মশাই কাপড়ের ফর্দ্দ দেখে, আমার পায়েব ধূলো নিলেন। বললেন—

"আহা,—দেশে এখনও দেবতা আছেন বইকি! নইলে আর দুনিয়া চলে,—আছেন বইকি! আমার পরম সৌভাগ্য তাই দেখতে পেলুম। সেকালে সব এইরকম সংসারই তো ছিল।' তেমনটি আর নজরে পড়েনা।—দোকান-পেতে এই যা-দেখলুম! এখন সব দ্বৈতবাদী—রামানুজের অনুজ,—স্বামীস্ত্রীব সংসার, তাও ম্যালথস্-মার্কা! হরে কৃষ্ণ"............

দুঃসময়ে যা ঘটে ভাই,—মুখদে সগর্ব্বে বেরিয়ে গেল—"সেকি মশাই! মন্ত্রপড়ে রাখি বাঁধার পর আর কি ঠাঁই ঠাঁই"........

পায়ের ধূলো repeat করে বললেন—"আহা, এইতো কথা!—কে বলে ধর্ম্ম নেই! এরকম শতকরা দশজন থাকলে আজ,......... হরে কৃষ্ণ,—"

"—দে-রে উদ্ধোব খাঁটি শান্তিপুরী গাঁট্‌টা; দেখিস্—বিলিতীর সঙ্গে ঠ্যাকাঠেকি না হয়, খবরদার,—শুনচিস্?

—"খরিদের খাতাখানা দে-তো নটবর। দেআমায় দে"

শুঁই মশাই চশমা চড়িয়ে স্বয়ং দেখে,—"এটা আর আপনার জন্যে নয়,—নাঃ ওটাও না।" শেষে গড়ে আড়াই টাকা ধরে—'আপনি ৬৭ই দিন, ও দশ আনা আর দিতে হবেনা। পায়ের ধূলো দিলেই হবে, কিছুর দরকার থাক্ না-থাক্, মাঝে মাঝে ওটা যেন পাই,—

সেই আমার পরম লাভ। কৃপাপদ্—আহা"!

তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়লো,—সঙ্গেসঙ্গে বেশ মোড়কা করে বাঁধা বাণ্ডিল, আমার হাতে এসেও পড়্‌লো!

পায়ের ধূলো নেবার—third bellও পড়ে গেল।

আর কথা চলেনা। আমই চললুম,—অবশ্য টাকা গুলি গুণে দিয়ে।

রাস্তায় যখন ভূশুপদ্ পড়লো, তখন আমি সজীব কি নির্জ্জীব, ভগবানই জানেন।

ক্রমে ময়রায় বানিয়ে দিলে! আগ্রাওলা কি লৌওলা হুঁস্ ছিলনা, একটা দোকানে ঢুকে—খাজা, করেলা, লালমোহন-নীলমোহন, কিছু আর বাদ দিলুমনা, —মায় দালমুট্।

দেখে বউদি বললেন—

"ঠাকুরপো মা বাজার করলে কারুর মনে ধরেনা ক সাধে! এমন পচন্দটী কারুর নেই, এমন খুঁটিয়ে কনতেও কেউ পারেনা"!

গ্রহ জিহ্বায় জুৎ করে বসেছিলেন, বললুম,—"তখন কন্ত—নারকোল নাড়ু আর পক্কান্নই ছিল মিষ্টান্ন,—বড়জোর —চন্দ্রপুলি"...

"ভালোকথা মনে করে দিয়েছ! দাও সাড়ে ছটাকা বকসিস্, তোমার একটা কাজ কমিয়ে রেখেছি ভাই!"

"সে আবার কি?"

ছুটে গিয়ে—দু'বারে দু'খানি প্রমাণ পরাৎ এনে সামনে রাখলেন। একখানিতে দেড়পো ওজনের এক একখানি চন্দ্রপুলি। অন্যখানিতে—ক্ষীরের ছাঁচ; ক্ষীরের গোলপজাম, জামরুল, আতা, আপেল! আরো কি কি—ভালো বুঝতে পারলুমনা,—চক্ষু ধোঁয়াটে মেরে এলো!

বললেন—"আহা বড়-ঘরণীরাই ঘর করতে পায়না! কি সুন্দর করেছে বলো ভাই!—ওই ঘোষেদের কপাল পোড়া সৌদামিনী"—

বললুম—"হয়েছে তো বেশ দেখছি,—কিন্তু কার জন্যে বউদি! এ চন্দরপুলি চাগাবে কে, খুদে—

বাধা দিয়ে বউদি চোখ্টিপে জানালেন—"খুদের মা সন্নিকট!—

—"থায় আর কে কত ঠাকুরপো! নেম্কম্মো তো ফ্যালা যায়না!—হিঁদুর ঘর ...

"তা বটে। তবে বক্সিসটে রাখো"। সাড়েছয়টি মুদ্রা গুনলুম। কিন্তু বউদির মুখতো বেশ প্রফুল্ল দেখলুম না। জাফ্রানের গন্ধ পাচ্ছিলুম,—ওঃ তাই ব্যস্ত আছেন।

পোলাও পরমান্নের পালা চলেছে—বালখিল্য, বালখিল্যিরা নেম্ রক্ষে করবে। কি আনন্দ!

* * * *

দেওয়ালীর রাত্টা ভাই তিনসের তেল আর এক চুপড়ি তুবড়িতে মন্দ কাটেনি! বোধ হয় সাহিত্যে একটু ঝোঁক থাকায় গায়ে লাগেনি,—ওই দীপান্বিতা আর দীপালি শব্দ দুটোর মোহে রাত বারোটা পর্য্যন্ত সলতে উসকে ছিলুম।

"বুঝলে কানাই, ভাষার কি ভীষণ শক্তি ভাই! একটুও গায়ে লাগেনি। ওই যে দীপালি রয়েছে ও একেবারে ভূপালীর সুর দেয়,—বুঝলে!"

বললুম, "বুঝচি বই কি; তা ঐ খরচে জগদ্ধাত্রী পূজো যে সারতে পারতে।"

কাঙালী মৃদু হেসে বললে—"মা জ্যান্তো সিন্নীতে এলে কি আর আনতুম না ভাই! শোনো, আরও কিঞ্চিৎ আছে,—"

"বউদি উস্খুস্ করছিলেন—একটু ফাঁক্ পেতেই এসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—

—"ঠাকুরপো—সব মাটি! আমি ছোটবোয়ের মুখের দিকে চাইতে পারছি না। বচরকার দিন—ছেলেমেয়ে গুলোকে সামনে পেলেই ঠ্যাঙাচ্চে......

"কেনো"?

—"আমাদের যে মস্ত ভুল হয়ে গেছে! ওর যে সাত বচরের আর নয় বচরের দুটি ভাই রয়েছে! এই গাঁয়েই বাস, ওরে বাপ্রে, তাদের ব্যবস্থা কি করেছ? ওই এক বোন্। তাদের জন্যে যে আগে আন্তে হয়!—

—"ছাখো ভাই, লক্ষীটি, সর্ব্বানন্দঠাকুরের দোকানে পাবে'খন্। এ চাই-ই। অমনি ও-পাড়ায় হয়ে তাদের একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। খাবার দাবার আমি ওই থেকেই কুলিয়ে দেব'খন লক্ষীটি—রক্ষে করো ভাই"...

আমি কিছু বলবার তরে ঠোঁট ফাঁক্ না করতেই বললেন —"এর ওপর একটী কথাও চলবে না ভাই।"

"উঃ কি আনন্দ,—না বউদি!"

চোখে হাসির আমেজ্ ঢেকে, চট্ রান্নাঘরের খোলোসের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

* * * *

গ্রামের মধ্যে ওই একখানি দোকান। সর্ব্বানন্দঠাকুর খানকতক কোরমাখানো কাপড়ও রাখেন, আর বিচুলি, গোলপাতা, তামাকও রাখেন। ইতর সাধারণ মধ্যে পণ্ডিত বলেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। আমার ফরমাজ্ শুনে বললেন—

"ভাগ্যিমানের বোঝা ভগবান বন্। আপনার খুব বরাৎ মেজবাবু,—কার ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করে। জমিদার বাবুদের জন্যে বরানগরের একজোড়া খাসা কাঁচি ধুতি এনেছিলুম;—তাঁদের দরকার হ'লনা। বড়লোক—কথা কবার তো জো নেই—ঘাড়ে পোড়লো। স্মরণ যে করেছিলেন এই সৌভাগ্য! ভাবলুম—থাক্, খাওয়াতে পরাতে হবেনা তো;—স্বামী পাট্টার বাবাজীবন তো নয় যে নিত্য শোনাবে—সালিয়ানা সাত লাখ্ টাকার জমিদারিটে বাহাত্তর সালের বন্যায় পিছ্‌লে কোথায় যে সরে গেলো, কোথাও পাত্তা লাগছে না।—যাবে কোথায়—ভাসবেই। তখন সব পুষিয়ে দেবে,—পলিপড়ে বর্ব্বর (উর্ব্বর?) হয়ে আসবে যে!

—"এ সব তো আর শুনতে হবেনা,—যাক্, খেতে দিতে হয়নাতো। অড়াৎ স্বস্তি...

সর্ব্বানন্দ পণ্ডিত লোক,—পুঁথি না খুলে—সত্যনারায়ণের কথা শোনায়। অনেক কিছু শোনাবে।

আমার সময় ছিল না, বললুম—"তোমার কথা বসে না শুনলে তৃপ্তি হয় না, অন্য সময় শুনবো, এখন বড় তাড়া রয়েছে,—জোড়াটা দেখি। তোমার—সব কথাগুলি কানে না এলে সুখ হবে না"।...

সর্ব্বানন্দ বললে,—"এ কথা সমঝ্‌দার না হলে বলে কে,—পেটে বিদ্যে থাকা চাই তো।

—"হ্যাঁ—এই যে—এ আর দেখতে হবে না। হারণে তন্দ্রকারের (তন্তুবায়ের?) স্বকৃত ভঙ্গ",...

বললুম,—"দশ হাতি, যে সর্ব্বানন্দ। ছেলেছুটো যে সাত আর নয়।"

তাতে কি হয়েছে বাবু—ছোট তো হবে না, শাস্ত্রই বলছে 'অধিক্রান্ত (অধিকন্ত?) ন দোষায়'। হেসে খেলে দশবছর পরবে। ও আপনি ভাববেন না। এই যে,—গরুটো যদি তিনসের দুধ দেয় আর ছেলেটা যদি দেড়-সেরের বেশী শুষতে না চায়, অমন গরু কি কেউ বাতিল্ করে মেজবাবু! নিয়ে যান, নিয়ে যান, ঢের কাযে লাগবে, আয় রেখে কাজ করতে হয়। এই যে ঘরগুলো অত লম্বা চওড়া বানানো হয়,—কেনো?—মানুষ তো চোদ্দপো। আয় রাখতে হয় মেজবাবু! বংশে ঘটোৎকচ জন্মাতে কতক্ষণ। তখন যে লম্বা হয়ে শুতে পারবে না হুজুর! নিজের ঘরে সিঁদকেটে পা চালিয়ে শেষ্ কি তুড়্‌মুড়ুকে পড়ে থাকবে! আয় থাকাই ভালো,—দেখুন বুঝে।"

কি বিপদ—এযে Strange bed Companion-এর বাবা,—শুঁয়ের ওপোর!

আমার দাঁড়াবারই সময় ছিলনা তো-বেরোবার। তার ওপর—সর্ব্বানন্দ ছাড়া—নান্য পন্থা। বললুম—

'দামটা'?

সর্ব্বানন্দ আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—

"অ্যাঁ—এ কাজ কে করলে!—কে এমন সর্ব্বনাশ করলে! আপনি তো কখনও বিষয়ী ছিলেন না,—এ পাপ ঢোকালে কে? ও'বচর বালিসের জন্যে তুলো নিতে এলেন, কাপাস্ তুলো দিলুম্ তাই-ই নিয়ে গেলেন। নিমে নাপ্‌তে বসে ছিলো, সে আমার দিকে চাইলে। বললুম—"সাধু দেখে নে—নমস্কার কর"।—

—"দাম তো কখনও করতেন না মেজবাবু! কি দিলুম তাও দেখতেন না। সে তুলোর পাপ আমাকে ধুতেই হবে,—আপনি সাত টাকার বেশী এক পয়সা দেবেন না। ও-জোড়া তো এখন হরি-শয়নেই থাকতো—নিয়ে যান।"—

—"সে-দিন সিমুলতুলো ছিলো না মেজবাবু, মাপ করবেন! তবে দামটা সিমুল তুলোরই নিয়েছিলুম, তাতে তফাৎ করিনি,—তা অন্তর্য্যামী জানেন।"

বেরুতে পারলে বাঁচি—নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

ছোট বউমার ভায়েরা বাড়ীতে ছিল না। একজন বললে—'বাড়ীতে খুঁজলে কি পাবেন! গাছে, না হয় কারুর পুকুর ধারে দেখুন।"

লোকটি মিথ্যে কথা কয়নি? শেষ-ভটচার্য্যিদের পেয়ারাগাছ থেকে পেড়ে আনতে হ'ল!

বড়বৌদি ঘরবার্ করছিলেন,—লগ্ন বুঝি বয়ে যায়!

বললেন—

—"এতো বেলা করতে হয়!—এই যে বেশ কাপড় পেয়েছ। আমি ভেবেই মরছিলুম"…

সময় আসন্ন। ছোটবউমা তাড়াতাড়ি ভাই দুটিকে জব্‌জবে করে জবাকুসুম মাখিয়ে,—পাতকো তলায় কাচতে বললেন। মৃদুস্বর শোনা গেল—

—"বচরকার দিন—একটু সাবান মাখাবার সময় থাকতেও লোক্ ফেরে"……ইত্যাদি।

যাক্,—সে-সব দামী জিনিষ সাজিমাটি মাখিয়ে, ধোপার ভাঁটিতে ফুটিয়ে—পাটায় আছ্‌ড়ালে তবে স্বরূপ প্রকাশ পেতে পারতো, নচেৎ শতধৌতেন…

কাপড় দুখানা আমাকেই কুঁচিয়ে দিতে হ'ল—বড় বৌদির আদেশ মত।

* * *

তারপর—শঙ্খনিনাদে বোধনারম্ভ। সেকি চব্বোর্‌! —আনন্দের আভ্যুদয়িক।

বাইরে এসে শ্রীদুর্গা স্মরণ করে গুড়ুক টেনে বাঁচলুম্। "বুঝলে কানাই,—এ জিনিষটি না থাকলে দেশের হাড়ির হাল হত'। জলপূর্ণ সডাক হুঁকা সহযোগে যিনি সর্ব্বপ্রথমে গুড়কে টান্ দিয়েছিলেন—সেই মহাপুরুষের নাম, ধাম, ভিটে এবং সেই সুমধুর টানের, সন, ক্ষণ, তারিখ যেদিন কোনো ভাগ্যবান্ বার করতে পারবেন, সেদিন আর স্বরাজ রুক্‌বে না! একাধারে পঞ্চভূতের এমন একীকরণ কোনো দেশের কোনো মিঞা হাতে তুলে দেখিয়ে দিতে পারেন নি।

এমন সাহিত্য সুহৃদ আর নেই, বঙ্কিমবাবু সেটা বুঝেছিলেন আর শরৎ বাবু তাতে মজেছেন ও তার মর্য্যাদা রেখে থাকেন।

এই মহতো মহিয়ানই ভারতটাকে বরাবর শাসন করে' এসেছেন। হুঁকো-বন্ধুর চেয়ে আমাদের বড়-সাজা বেরয়নি। আজ বনিকরাজ তাই জাহাজ জাহাজ সিগারেট এনে সেটাকে চাপা দিচ্ছেন। গত বৎসর ভারতবর্ষকে বেজায় হর্ষ দিয়েছেন—যাট্ কোটি পাউণ্ড্ ফুঁকিয়েছেন। castle (কাসল্) আছে, কাঁচি আছে—মাছি মারিতে কতক্ষণ। স্বরাজ্ চাই,—টান্‌চো তো! হ্যাঁ—টেনো, টান্‌বে বইকি…

যাক্—যা বলছিলুম—

—"ভাগ্য Everywhere রে ভাই—এতদূরি হয়ায় সেই গোল্—বৌটি ছেড়েছে—

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে শুপ্ শুপ্ ধ্বনি এবং অ্যাঁ ও প্যাঁ শব্দ উত্থিত হয়ে চিন্তা চম্‌কে দিলে। ছুটে গিয়ে যা শুনলুম তা—

—"আহা মেরোনা মেরোনা ছোটবউ। ঐটুকু ছেলে ও-চন্দ্রপুলি চাগিয়ে সাপ্‌টাতে পারবে কেনো! যা পারে খাগ। এটা তো নয়, এরপর খাবে'খন, তুলে রাখলেই হবে। বচরকার দিন"……

শুঁই মশার শান্তিপুরে কাপড় তার প্রাপ্য অশান্তি—after-math আদায় করে—পাতকোতলায় গিয়ে পড়লো। নেমকম্ম… … সমাপয়েৎ।

বউদির সঙ্গে চকোচুকি হওয়ায় হুইস্পারে বললুম্—

"কি আনন্দ বউদি! বিপুল,—না"?

তিনি কল্পিত ক্রোধ ও উদ্গত হাস্যের সংমিশ্রণে খুঁক্ করে, মুখ ফিরিয়ে নিরাপদ স্থান নিলেন।

* * *

তারপর চণ্ডিমণ্ডপে এসে স্বরাজটানি আর দুর্গানাম জপি। দৃষ্টি সেই পথের প্রান্তে,—কখন কোন্ বন্ধু হাত-চিটে হাতে দেখা দেন!

ক্রমে প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবও পাতলা হয়ে এলো।

সহসা পা টিপে টিপে, বার বাড়ীতে বৌদির অভাবনীয় আবির্ভাব। মুখে গাম্ভীর্য্য, চোখে বিস্ময়।—

—"একি করেছ ঠাকুরপো! মেজবয়ের একখানি গয়না রাখনি!"

অসহায় সপ্রতিভের অর্থশূন্য হাসি টেনে বললুম—"সত্যি বলছি বউদি—সে নিজে রাখেনি।"

"তাই তুমি নিলে।"

"তোমাকে বউদি বলি, কিন্তু মায়ের মত দেখি,—মিথ্যে তো বলতে পারবোনা। কিছুদিন থেকে বন্ধু বান্ধবরা আর তেমন আসে না,—সকাল সকাল শুতে হয়, তাই বোধ হয় ঘুম না,—সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। একদিন উঠতে গিয়ে দেখি—কোঁচার খুঁট ভারি"…

—"গেরোটা বুঝি খুলতে পারলে না"

—যে ডুব্‌চে সে পারে না বউদি, ডুব্-জলে যে পড়েছে—

অলমা শিবের মাথায়ও পা দিয়ে দাঁড়াতে তার বোধ হয় বাধে না বউদি।"

শরতের একখানা উড়ো মেঘ সহসা যেন ছায়া ফেলে তাঁর মুখের সোনালি আভাটা মলিন প্রলেপে ঢেকে দিলে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আনত চক্ষু ভেসে গেল...

যেন শান্তিজল পেলুম।

কল্পনা

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

হে কল্পনে। তুমি আসো জোয়ারের প্রায়,
ক্ষুদ্র চিন্তা, তুচ্ছ স্বার্থ, সব ভেসে যায়
কানায় কানায় পূর্ণ হয় এ অন্তর।
হে সুন্দরী, তুমি জানো অপূর্ব্ব মন্তর
ফুটাও কুসুম রাজি শুষ্ক তরুশাখে,
হৃদয় বসন্ত তুমি! শুনি তব ডাকে
অপরূপ বীণাধ্বনি; শিরায় শিরায়
রক্ত নাচে তালে তালে মাতালের প্রায়।
নিখিল যৌবন তুমি তব আগমনে
অযুত কুসুম রাশি ফুটে মনে বনে।
কিম্বা বুঝি প্রেম তুমি এলে দয়া করি
ভুলাতে বিশ্বের জ্বালা। কিম্বা হে সুন্দরী
স্বরগের স্বপ্ন তুমি এলে মর্ত্ত্য ভূমে;
মানুষের মন বনে রূপ দিতে আকাশ কুসুমে!

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(২১)
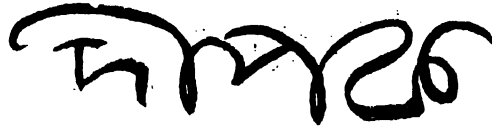
বর্ষার বিরাম আছে। সে একদিন নির্মেঘ আকাশের শূন্য পথ বাহিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু মানুষের মনে এক দুঃসহ মুহূর্ত্তে এমন একটা বাদল নামে যাহা অন্তর বাহিয়া নিরন্তর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়ে। বাহিরের বর্ষা চলিয়া যায়, চোখের জল থামিয়া যায়—অন্তরের বিক্ষুব্ধ অশ্রুর ধারা জীবন ভরিয়া আর থামিতে চাহে না। সে অশ্রু ধারার শব্দ নাই, প্লাবন নাই,—অন্তরের রন্ধ্রপথ ক্ষয় করিয়া অবিরাম স্রোতে জীবনভূমির অন্তরাল দিয়া চলিয়া যায়। এক নির্ম্মম প্রভাতে মানুষ দেখে তাহার জীবনের ভিত্তিমূল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—কোনদিন ধ্বসিয়া পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই।

যথাসময়ে দীপকের কাছে বিহারীকাকাই সংবাদ দিলেন পুষ্পর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে শোভনা বা অন্য কেহ এ সংবাদ আগে দিতে সাহস করে নাই ইহা দীপক বুঝিল। বিহারীর পত্রের সঙ্গেই ছোট একখানি চিঠি—পুষ্প, লিখিয়াছে। শ্রদ্ধা ও বিনয়ে চিঠিটুকু পরিপূর্ণ।—তুমি মহৎ জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তোমার হৃদয়ের উদারতা, তোমার অপূর্ব্ব কার্য্যক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আজও তোমার প্রতি আমার সে শ্রদ্ধা অটুট আছে। বাবার চিঠিতেই সব খবর পাবে। এ সংবাদ পূর্ব্বে দিয়ে বিশেষ কোনও লাভ হবে না ভেবেই আমি তোমাকে আগে জানাইনি।—একটা অনুরোধ, জানি তোমার মত লোক এ অনুরোধের সম্মান রাখবে; আমার যে চিঠিগুলি বা অন্যান্য জিনিষ তোমার কাছে আছে সেগুলি অনুগ্রহ করে ফেরত দিও। ইতি—

দীপক একলা ঘরে চিঠি দুখানা পড়িতেছিল। চোখের উপর কেমন দুই ফোঁটা জল আসিয়া তাহার দৃষ্টি আড়াল করিয়া দাঁড়াইল

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে বলিয়া দীপক একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শ্যামা আসিয়া কখন পাশে দাঁড়াইয়াছিল দীপক তাহা টের পায় নাই।

দীপক যখন চোখ খুলিয়া তাকাইল তখন তাহার সম্মুখে প্রভাতের গাছের ছায়া ফেলা দিঘীর কালো জল অশ্রু সাগরের মত স্থির হইয়া রহিয়াছে। ওপারের ঘনশ্যাম গুল্মকুঞ্জের ভিতর হইতে দুই একটা সাদা বক হঠাৎ উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। দিঘীর পশ্চিম কোণের বিরাট রবার গাছের দুই একটা শুষ্ক পাতা মৃদু বাতাসে টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে শ্যামার নিশ্বাসের শব্দ দীপকের কানে গেল। সে ফিরিয়া চাহিল।

শ্যামা দীপকের কপালের উপর নিজের হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আপনার জীবনের এ আরেকটা পুরস্কার।

দীপক চিঠি দুইখানা হাতদিয়া দেখাইল। শ্যামা বলিল, আমিও এইমাত্র দাদার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

দুজনে আর কেনেও কথা হইল না। শ্যামা দীপকের মাথাটি নিজের বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

দীপক বলিল, এবার তাহলে তুমি বাড়ী যাও। ডাক্তারের বেরুবার সময় হয়েছে।

শ্যামার কণ্ঠস্বরও ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে উত্তর করিল,

তাঁকে আমি বলে এসেছি। আমি এখন আপনার কাছেই থাকব।

দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বেলা বাড়িয়া গেল।

শ্যামা বলিল, এবার স্নান করে চলুন আমাদের সঙ্গে খাবেন।

সমস্ত সকালটা দীপক আর ঘরের বাহির হয় নাই দেখিয়া জুডির মনটাও কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভিতর বাড়ীতে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া গেল। সে যেমন ভাব লইয়া আসিয়াছিল, দীপকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের সে ভাব মিলাইয়া গেল। সে চুপি চুপি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মাঝে মাঝে শ্যামার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইতেও এ অবস্থার কোনও কারণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

জুডির এই অস্বোয়াস্তি দেখিয়া দীপক শ্যামাকে বলিল, ওকে ও ঘরে নিয়ে যাও।

জুডি ও শ্যামা অন্য ঘরে গেল। শ্যামা জুডিকে সকল কথা বলিল। জুডি একটু জোরেই চেঁচাইয়া ফেলিল,—What a dirty trick!

দীপক ডাকিয়া বলিল, জুডি, না বুঝে হঠাৎ কিছু বলো না।

জুডি তাহা শুনিবার পাত্রী নয়। সে রাগে ঘৃণায় যেন জ্বলিয়া মরিতেছিল। দীপকের কাছে আসিয়া বলিল, তুমি এতে আবার কি বুঝতে বল? তোমরা ত জান, আমার চেয়ে খারাপ মেয়ে আর হয় না, কিন্তু আমিও এমন কাজ করতাম না।

দীপক একটা ক্লান্ত হাসির সঙ্গে বলিল, মানুষের মনের স্বাধীনতাকে আমি মুক্তি দিতে আজীবন চেষ্টা করেছি, আমার মনকে জানবার জন্য আমার এ সব আঘাত আসবেই। আমিই তাকে বলেছিলাম, যদি কখনও ইচ্ছে করে তাহলে সে যেন অন্যকে বিবাহ করে।

জুডি আবার জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, তোমার ঐ একটি কথাই সব হোল? আর এতকালের তোমার তার প্রতি নিষ্ঠা, তোমার প্রতি তার অনুরাগ, এতকালের সকল কথা, তার কোনও মূল্য নাই!—লোভ যদি মানুষের হয় তাহলে নিজের মনকে ভোলাবার যুক্তির অভাব হয় না।—পুষ্পকে তুমি ক্ষমা করো না।

দীপক আবার একটু হাসিল। বলিল, তাতে তার কি আসে যায়?

শ্যামা দেখিল জুডি দীপককে বড় যেন উত্ত্যক্ত করিতেছে। সে তাই জুডিকে বলিল, জুডি ভাই, ওঁকে এখন একটু চুপ করে' থাকতে দাও।

জুডি রাগিয়া বলিল, না, কেন? কি হয়েছে? এমন কি শোকের ব্যাপার হয়েছে? সে যে শুধু মাত্র স্ত্রীলোক তার বড় আর কিছু নয় এইত প্রমাণ হয়েছে। এর জন্য ব্যথা আগ্‌লে বসে থাকার ত আমি কিছু দেখি না। একটা মেয়ে গেছে—আরও দশটা মেয়ে পাওয়া যায় পুরুষ যদি ইচ্ছে করে।—

শ্যামা ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু দুঃখ ত তার জন্য নয়। দুঃখ হচ্ছে পুষ্প গেছে এই জন্য। দীপকের কল্পনার পুষ্প আজ একটা সামান্য ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে খান্ খান্ হয়ে গেল এই যা!

জুডি বলিল, কি নিয়ে, কোন্ বিশ্বাস নিয়ে তাহলে মানুষ বেঁচে থাকে বল ত!

দীপক হাত দিয়া বারণ করিল, ওসব কথায় আর কাজ নাই।

জুডি বলিল, আমি তা' ছাড়বনা। আমি তোমাকে তুষের আগুন বুকে করে থাকতে দেব না। এখুনি, এই মুহূর্ত্তে—তোমাকে ঐ কালোপর্দ্দাটা টেনে দিতে হবে। আজ প্রভাতে যেন তোমার মুখের আলো দেখে আমি ভরসা পাই দীপক।

জুডির কথায় আশ্চর্য্য শক্তি ও বেগ ছিল। দীপক সত্যই জুডির মুখের দিকে চাহিল। আবার চাহিল শ্যামার সেই স্নেহসিক্ত করুণ মুখের দিকে। একদিকে ঝঞ্ঝা—অপর দিকে বরাভয়।

দীপক উঠিল।

জুডি বলিল, তোমার অনেক কাজ আছে দীপক। প্রতিদিনের ছোটখাট কাজগুলো পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পার নিজের ওপর তোমার এমন অধিকার নাই। শোক করবে সে, কাঁদবে সে যার প্রচুর অবসর আছে। বিধাতার নির্ম্মান

কার্য্য চলেছে—আমরা তার মজুর মাত্র, এসব কথা তোমার কাছেই একদিন শুনেছি দীপক।

দীপক স্নান করিল, খাইল, সবই করিল কিন্তু ভিতরের ভিত্তিভূমি যে উদ্বেল স্রোতে নাড়া দিয়া গিয়াছিল, দীপকের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কাজের মূলে তাহারই অবসাদ যেন কুলভাঙ্গার চমক্ লইয়া ঘা দিতেছিল।

এই ঘটনার পর কয়েকমাসের মধ্যে জুডি ও শ্যামার সঙ্গে দীপকের যেন নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

শ্যামা কোন কালেই বেশী কথা বলিত না, কিন্তু তাহার ভিতরে যে এতখানি গভীরতা আছে তাহা এতদিন বুঝা যায় নাই। শ্যামা প্রায়ই দীপকের কাছে থাকিত, দীপকের কাজে সহায়তা করিত ইহা ডাক্তারের চোখে ভাল ঠেকিত না। কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া একদিন সে শ্যামাকে বলিয়া ফেলিল, শ্যামার এ রকম স্বাধীনভাবে চলা ফেরা তাহার ভাল লাগে না। একদিন, দুইদিন শ্যামা চুপ করিয়াই রহিল এবং সত্য সত্যই দীপকের কাছে যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ করিয়াই দিল। কিন্তু ডাক্তারের একদিনের ব্যবহারে নীরব শ্যামাও মুখর হইয়া উঠিল।

ব্যাপারটা বাস্তবিকই লোকচক্ষুতে বিশেষ করিয়া স্বামীর চোখে একটু খারাপ দেখাইবারই কথা।

একদিন গভীর রাত্রে দীপক ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবনায় ঘুম হইতেছিল না। শ্যামা ঐ গভীর রজনীতে নিজের শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া দীপকের এই অবস্থা দেখিতেছিল। ডাক্তার তাহা দেখিতে পায় এবং সেই অবস্থাতেই এই ব্যাপার লইয়া শ্যামাকে তিরস্কার করে। শ্যামা তাহা সহ্য করিতে পারিল না। শ্যামা ডাক্তারের মুখের উপরই উত্তর করিয়া বসিল, বিবাহসূত্রে আমার উপর তোমার যে অধিকার তার সবই তুমি পেয়েছ, তার ওপর আর যদি কিছু আশা কর তা' তোমার ব্যবহারের দ্বারাই আমার কাছ থেকে পেতে পার। তোমার এ ব্যবহার আমি সহ্য করতে পারছিনা, আমার শ্রদ্ধা তুমি হারালে।

ডাক্তার আগুনের মত ক্ষেপিয়া গেল। রাগের মাথায় একেবারে দীপকের সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। দীপক ত দেখিয়া অবাক্!

জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার বল ত? স্বরে সত্যই একটা উৎকণ্ঠা ছিল।

শ্যামা তখনও জানালায় দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল, ব্যাপার কি আবার জিজ্ঞেস করছেন, নিজে জানেন না আমার কি সর্ব্বনাশ আপনি করছেন?

দীপক সত্যই কিছু জানিত না, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, কি হয়েছে আমাকে একটু খুলে বল্‌বে?

ডাক্তার চটিয়া গিয়া বলিল, শ্যামা বাড়ীঘর সব ছেড়ে আপনারই কাছে পড়ে থাকে এ কি আপনি জানেন না?—আর আজ রাত জেগে ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে আপনার দিকে চেয়ে থাকা এর অর্থ কি আপনি কিছু বোঝেন না?

দীপক সংযতভাবে উত্তর করিল, না, জানি না। আর না জানার অপরাধ আমার নয়, বিধাতার। মানুষের মনের বৈচিত্র্য সব বুঝে উঠ্‌তে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই, আর দেখ্‌ছি তুমি ডাক্তার হয়েও তুমিও বিশেষ জান না।

ডাক্তার অধীর হইয়া বলিল, জানি না? খুব জানি। শ্যামা আপনাকে ভালবাসে। আপনি তার মনকে চঞ্চল করেছেন।

দীপক বিরক্তিরস্বরে বলিল, ডাক্তার, এ সব ছোট কথা আর ভাল লাগে না। তা যদি সত্যি তোমার মনে হয়ে থাকে, বিধান তোমাদের হাতেই আছে, তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করগে।

ডাক্তার উত্তর করিল, সে বিধানে শাস্তি আপনারও কিছু হওয়া উচিত।

দীপক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, যদি তাই হয়, শাস্তি দাও, আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

ডাক্তার বলিল, আপনাকে আমি জানি, তাই আপনাকে নিয়ে খেলা করতেও ভয় করে।

মানুষের সংসারের মধ্যে আপনার থাকাই বিপদের কথা। তার চাইতে আপনি এখান থেকে চলে যান্।

দীপক কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপর বলিল, ডাক্তার, এতদিনে আমার নিজের সম্বন্ধে একটা খাঁটি কথা শুনতে পেলাম, সেজন্ত তোমাকে ধন্তবাদ। আজ তবে যাও ডাক্তার। আমি তোমারই শাস্তি গ্রহণ করলাম।

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীপক শুইতে গেল। ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্তচক্ষু কখন বুঁজিয়া আসিয়াছিল। ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। জাগিয়া দেখে প্রসাদ আর মালা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

উভয়ে দীপককে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, দীপক বলিল, বহুকাল পরে তোমাদের দেখা পেলাম প্রসাদ, আজ সত্যি আমার সুপ্রভাত।

—ক্রমশ

মাসিক সংবাদ

গত ৯ই জানুয়ারী তারিখের কর্পোরেশনের সভায় শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় কর্পোরেশনের কিউরেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা টাউনহলে এবং কর্পোরেশনে যে সমস্ত তৈল চিত্র রাখা হয় সেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। অনেকের জানা থাকিতে পারে যে, এই পদে পূর্ব্বে মিঃ হ্যারিস্ এবং মিঃ হ্যারিংটন অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক্ষণে কর্পোরেশন এক জন দক্ষ বাঙালী শিল্পীকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ছাগলনাইয়া থানার অধীন শিলুয়া গ্রামে—"শিলুয়া দিঘি" নামক একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পাড়ে তিন খণ্ড বহু পুরাতন প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিয়া মনে হয় ঐ গুলি একটী মূর্ত্তির ভগ্নাংশ মাত্র। মূর্ত্তির ভগ্নাংশ প্রস্তর গুলির ফটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক বেনীমাধব বড়ুয়ার নিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি প্রস্তর খণ্ডে যাহা লিখা আছে তাহা "ব্রাহ্মী" অক্ষরে লিখিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি চারিটি অক্ষরের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যে স্থানে প্রস্তরখণ্ডগুলি পাওয়া গিয়াছে উক্ত গ্রামের নাম ঐ প্রস্তরখণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। যে প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে ঐ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপরিভাগে একটী বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তিটীর মধ্যভাগ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অধ্যাপক বড়ুয়া বলিতেছেন যে, মূর্ত্তিটী কিষাণ যুগের ভাস্কর্য্যের বিশেষ রূপ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মূর্ত্তি ও লিপির আবিষ্কারক মহাশয় শীঘ্রই একটী বিবরণ প্রকাশ করিবেন।

দিল্লী হইতে শিল্পী শ্রীযুক্ত রণদা প্রসাদ উকিল মহাশয়ের বিশেষরূপ চেষ্টায় একটি ত্রৈমাসিক চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের শ্রীযুক্ত মুকুন্দ লাল, বম্বের শ্রীযুক্ত কান্হাইয়ালাল উকিল, মাদ্রাজের মিসেস্, আদিয়ার, দক্ষিণ-ভারতের শ্রীযুক্ত বেঙ্কট চালম্, বাঙালার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, রণদা উকিল ও শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত হইবে। রথেন্‌ষ্টীন্, জেমস্ কজিন্স, ষ্টেলাক্রমরিশ, ডাঃ আনন্দ কুমার স্বামী, অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী, এন, সি, মেটা প্রভৃতির রচনাবলী এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র ঠাকুর, অসিত হালদার, মুকুল দে, নন্দলাল বসু, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, সারদা উকিল, দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী ইত্যাদির চিত্র থাকিবে। মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় টাকা, পরিচালক দিল্লী ফাইন্ আর্টস্ ক্রাফ্‌টস্ সোসাইটী।

বাঙলার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে "সত্যেন্দ্রদত্ত ও বর্ণ

সাহিত্যে তাঁহার স্থান" সম্বন্ধে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, সাহসপুর এস, এস, সাহিত্যসভার সভ্য বৃন্দ, তাঁহাকে একটি স্বর্ণ পদক দিবেন। প্রবন্ধটি বাঙ্‌লা ভাষায় লিখিতে হইবে। আগামী মার্চ্চ মাস ১৯২৯ সালের মধ্যে সেক্রেটারী, এস, এস, সাহিত্য-সভা; পোঃ সাহসপুর, বরিশাল উক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইবে।

দিল্লী বঙ্গীয় সাহিত্য-সভা, সাহিত্যের প্রসারের জন্য দিল্লী প্রবাসী সকল সাহিত্যানুরাগীকে, ছোট গল্প রচনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলে তাহা সাহিত্যসভার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইবে এবং কোনও শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। রচনা প্রতিযোগিতায় যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে তিনি ১০৲ টাকা হইতে২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইবেন। সমস্ত রচনা দিল্লী সাহিত্য-সভার কর্ম্ম সচিব শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য-মন্দির, ১টী স্বর্ণপদক ও একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন একটি প্রবন্ধের জন্য। বিষয়টী হইতেছে—বিবাহে পণপ্রথা (মূল কারণ—প্রতিকার ও সমাজের দায়িত্ব)। যাঁহার প্রবন্ধ প্রথম বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি একটি স্বর্ণ পদক এবং যাঁহার দ্বিতীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইবেন। প্রবন্ধটী স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই লিখিতে পারিবেন। আগামী ১লা চৈত্র উক্ত সাহিত্য-মন্দিরের সম্পাদকের নিকট প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে; এবং উহা আগামী বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় সাহিত্য-মন্দিরের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বার্লিনের ৩১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন গত দশ বৎসর গবেষণা করিয়া একখানি ছয় পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই ছয় পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য এক মার্ক অর্থাৎ দশ আনা করিয়াছেন। এরূপ বিশ্বাস যে, এই পুস্তকখানিতে নূতন গবেষণা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে এবং ঐ পুস্তকখানিতে সৌরদর্শনের নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অঙ্ক প্রভৃতি অত্যন্ত শক্ত। কারণ একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, এই গবেষণার মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

খাঁ বাহাদুর মৌলভী চৌধুরী হাজীমুদ্দিন আহাম্মদ সিদ্দিক্কি—আরবী, পার্শি ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান পুঁথি সকল সংগ্রহ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে দান করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর সিদ্দিক্কি বাঙ্‌লার নবাব, কুতুবদ্দীন খাঁ কোকার বংশধর। নবাব কুতুবদ্দীন খাঁ সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সুবৃহৎ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা তাহার কলেবর ও পুঁথির সংখ্যাও বৃদ্ধি করেন। ১৮৯৮ সালে অগ্নিতে এই পাঠাগারের অনেক পুস্তক ও পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। এই ঘটনার পর খাঁ বাহাদুর সিদ্দিক্কি ইহার ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেন। মুসলমানদের জন্য স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সকল পুস্তক ও পুঁথি দান করিয়া খাঁ বাহাদুর দেশের ও দশের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যগণ এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে আগামী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা মহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আগামী ১৬ই মার্চ্চ (২রা চৈত্র) শনিবার গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সহস্র সহস্র যাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া পর পর নয়দিনে নয়টী দ্বীপ (অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ) পরিক্রমা করিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ বিনাব্যয়ে সমগ্র যাত্রিগণের আহার, বাসস্থান ও দ্রব্যাদি বহনের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে। বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন

হইলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের নিকট পূর্ব্ব হইতে সংবাদ প্রদান করিবেন।

শ্রীমায়াপুর কলিকাতা হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে ই, বি, রেলের "মহেশগঞ্জ" ষ্টেসনের নিকট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে সর্ব্ব ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি প্রবেশ করিবা মাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"ধর্ম্ম মানুষের নিবিড়তম আশা আকাঙ্খার বিকাশ, উহা অর্থহীন আচারের পূজাও নয়, অন্ধভাবে কোন বিষয়ে মন্ত্র মানিয়া চলাও নয়। যে জ্ঞান সমস্ত অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে আমাদের মুক্ত করে, ধর্ম্মের অর্থ সেই জ্ঞানের উপাসনা।" অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার সার কথা—ঈশ্বর এক, সত্য এবং অখণ্ড। ধর্ম্মের নামে যে কলহ ও সাম্প্রদায়ীক বিরোধ চলিতেছে তাহার মূল কারণ অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার ফলে মানুষ একদল গোঁড়া সঙ্কীর্ণমনা পুরোহিত ও মোল্লাদের যন্ত্রের ন্যায় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সত্যের আলোক বিতরণ করিতে হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন্, বঙ্গীয়-সমবায় প্রতিষ্ঠানের হস্তে ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত হাজার টাকায় ৫০০৲ ও ৩০০৲ টাকার এক একটি এবং ১০০৲ টাকার দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—"কিরূপে সমবায় আন্দোলন ভারতে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে এবং দেশময় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।" প্রবন্ধগুলি সম্পাদক বঙ্গীয়-সমবায় প্রতিষ্ঠান, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিন্টো প্রফেসার ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার যামিনী মোহন মিত্র এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার সার জাহাঙ্গীর কয়াজী প্রবন্ধ বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ, উত্তরা, কালি-কলম, কল্লোল ও অন্যান্য পত্রিকার গল্পলেখক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের নূতন উপন্যাস যাযাবর বাহির হইয়াছে। মূল্য একটাকা চার আনা। প্রাপ্তিস্থান—আর, এইচ্, শ্রীমাণী এণ্ড সন্স। ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউইয়র্কের ২৩শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডনের মিঃ গ্যাব্রিয়েল ওয়েলস আমেরিকা হইতে শেলীর স্বহস্ত লিখিত কবিতার পুস্তক "কুইন্ ম্যাব" ১৩৬০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে আনিয়াছেন।

আগামী ৯-১০-১১ই চৈত্র, ১৩৩৫ সন ইং ২৩-২৪-২৫শে মার্চ্চ ১৯২৯—শনি, রবি ও সোমবার হালুয়াঘাট (গারোহিল) হিন্দু-মিশনে সকল শ্রেণীর হিন্দুর এক বিরাট মিলনোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব এই যে ইহাতে হিন্দু-মিশন কর্ত্তৃক দীক্ষিত বহু হিন্দু ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলারা উপস্থিত থাকিয়া পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, সভায় ও উৎসবে যোগদান করিবেন। এই শুভদিনে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভদ্র-মহোদয়গণকে ও ভদ্রমহিলাবৃন্দকে এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

পুস্তক ও পত্রিকা
পরিচয়লিপি

টুটা-ফুটা *

'টুটা-ফুটা' অচিন্ত্যবাবুর প্রথম গল্পগ্রন্থ। বাংলাদেশে অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্য বলে' যে নবতন সাহিত্যকে অভিহিত করা হয়েছে, তার সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও শক্তি এ বইখানির প্রত্যেকটি গল্পে পরিস্ফুট দেখ্‌তে পাই। গল্পগুলি যেম্‌নি ধারালো, তেমনি পরিচ্ছন্ন। এ গল্পগুলি পেয়ে বাংলা সাহিত্য যে সুসমৃদ্ধ হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

এ বইখানিতে ছয়টি গল্প আছে,—প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনো মাসিকপত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি গল্পেই আধুনিক জীবনের সন্দেহ বিক্ষোভ ও সংগ্রামের ছবি আছে, এবং সে-ছবি অচিন্ত্যবাবু তাঁর নিপুণ লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে হতাশা যে-দারিদ্র্য যে-বেদনা আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনকে পীড়িত কর্‌ছে সেই চিত্র এই গল্পগুলিতে মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে,—এবং সমস্ত নৈরাশ্যসত্ত্বেও যে-সাধনা থাকলে বিফলতাও মহিমান্বিত হ'য়ে ওঠে, সেই শক্তির ব্যঞ্জনা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

মোট কথা কৃত্রিম অভিজাত জীবন অতি-আধুনিক সাহিত্যিককে আকৃষ্টই করে নি। তার চোখের সমুখে কেরানীর দৈন্য, দরিদ্র গৃহস্থের নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম, গরীব অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রের ব্যর্থতা করুণ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটি গল্পে এই ট্রাজেডির সুর একান্ত ভাবে হৃদয় স্পর্শ করে।

অথচ এই বেদনার মধ্যে রুগ্নতা নেই। জীবনসৃষ্টির অন্তরালে যে বেদনা নিরন্তর উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে,—এ সেই বড়ো দুঃখেরই ছবি। ভাগ্যের কাছে মানুষ পরাস্ত,—ঘটনার চাকার নীচে মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছে,—দুঃখই তার সমস্ত জীবনযাত্রার পাথেয়, জীবনের প্রলয়ান্ধকারে মৃত্যুই তার আশ্রয়দীপশিখা,—এই বেদনাপূর্ণ আবেদনটি প্রত্যেকটি গল্পে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। এই সুরটি ছিল বলে'ই হয় তো টুর্গেনিভ কে "noble and melancholic Tourgueneff" বলা হ'ত।

গল্পের কথাবস্তুই গল্পের সর্ব্বস্ব নয়—প্রকাশ কর্‌বার ভঙ্গীতেই গল্পের উৎকর্ষ যাচাই হওয়া উচিত। এবং এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় অচিন্ত্যবাবুর প্রকাশভঙ্গী অপরূপ, অভিনব, অনবদ্য। এই প্রকাশভঙ্গীই বিশেষ করে' আধুনিক সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব। অচিন্ত্যবাবুর ভাষায় তীক্ষ্ণতা আছে,—এবং ব্যঞ্জনায় একটি অনির্ব্বচনীয় স্বকীয়তা আছে। ছোট খাটো ঘটনার সন্নিবেশে ও ছোট খাটো রেখাপাতে তিনি আকস্মিকরূপে পাঠকের হৃদ্যতা লাভ করেন,—এবং এইখানেই তাঁর রূপদক্ষতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'য়ে ওঠে। তাঁর লেখায় যে শুধু ধার আছে তাই নয়,—প্রয়োজনবোধে অপূর্ব্ব মিষ্টতাও আছে। 'সন্ধ্যারাগ' গল্পটি এর প্রমাণ। গল্পটি যেন আসন্ন গোধূলিকালের মতই সুকোমল, অবসন্ন বর্ষারাত্রির মত ব্যথাসিক্ত!

অতি-আধুনিক সাহিত্যিক তার সাহিত্যে উলঙ্গ দুঃখের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে ভয় করে না, মৃত্যুকে সে অবাঞ্ছিত শত্রু মনে করে, ঘটনাকে সে তার প্রাপ্য মূল্য দেয়। গোটা জীবনের সে উপাসক, জীবনকে কেটে-ছেঁটে মানানসই করে' নেবার মত দৌর্ব্বল্য তার নেই। এইখানেই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক দৃষ্টির উদারতা লাভ করেছে,—তার সুদূরবিস্তৃত সহানুভূতিতে সে সকলকে স্পর্শ করেছে, সাহিত্যের উৎসব-সভায় সে অস্পৃশ্যতা মানে নি।

'টুটা-ফুটা'-গল্পটিতে যে-জীবনসংগ্রামে পড়ে' কবিকে কেরাণী হ'তে হ'ল, 'অচল-টাকায়' স্বপ্নবিলাসী যুবককে যে দারিদ্র্যের নিপীড়নে চোর হ'তে হ'ল, 'দুইবার রাজা'য় গরীব ছাত্রকে মোটরের নীচে প্রাণ দিতে হ'ল,—তা যেমনি ভীষণ, তেমনি

* শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

মর্ম্মস্পর্শী। এই সব বেদনার চিত্র হ'লেও তার মধ্যে অনন্ত-সুলভ দৃঢ়তা আছে—তাই পাঠকের মনকে শুধু যে স্পর্শ করে তা নয়, দস্তুরমতো সবেগে নাড়া দেয়।

'খাখ্'-গল্পটির বিষয়বস্তু উপন্যাসের। আখ্যানবস্তুর সম্পদে ও প্রকাশভঙ্গীর কৌশলে গল্পটি শুধু যে অতি-আধুনিক হয়েছে তা নয়, সার্ব্বভৌমিক হয়েছে। গাঁ সহর হচ্ছে,—গাঁয়ের সমস্ত শ্যামশ্রী রুক্ষ প্রাণহীন হ'য়ে পড়্‌ছে, রোগ ঢুক্‌ছে, উন্নতির নামে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ মাথা তুলছে, দারিদ্র্য রাজবেশ পরেছে,—অথচ একটি রুদ্ধবুদ্ধি বিফলমনোরথ লোক বিনাশের পথে পা দিল,—গল্পটি মুক্তার মতই উজ্জ্বল ও বহুমূল্য। মোটকথা 'টুটা-ফুটা' গল্পগ্রন্থটি গ্রন্থকারের স্বকীয় সৃষ্টি,—ভাষায় ও ভাবে, বিষয়গৌরবে ও ব্যঞ্জনায়। 'টুটা-ফুটা' বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বাড়ালো এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে ঘোষণা কর্‌তে পারি।

আর্ট-হিসেবে ছোট গল্পের দর যে কত বেশী তা আগে বহু গল্প পড়ে' আমরা যেমন বুঝেছি এ গল্পগুলিতেও সেই ধারণা আরো সুগভীর হ'য়ে উঠেছে। অথচ ছোট গল্পের বইয়ের আদর কমেছে বলে' বাংলাদেশের সাহিত্যসমাজে একটা অভিযোগ আছে। বাংলাদেশের পাঠকেরা সত্যি-কারের খাঁটি ও মৌলিক সাহিত্যকে পছন্দ করেন না, তাঁদের সত্যিকারের রসবোধের দৈন্য ঘটেছে,—এ কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারছি না।

চিত্রবহা

শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

উপন্যাস, মূল্য ২৲০ ; প্রকাশক বরদা এজেন্সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি পড়িয়া কত অজানার সহিত পরিচয় হইল; কত প্রীতির পরশ, কত হিংসার দহন, কত আশার ছলনা, কামনার আগুন, ত্যাগের মহিমা, স্বপ্নের নীলায়িত চিত্র—বিচিত্র রস সম্পদে চিত্রবহা মানবচরিত্রের নানারূপ চিত্র বহন করিয়া চলিয়াছে। অপরূপ সে ছবি—ছায়ার মত স্বপ্নময়, সত্যের মত ঘটনাবহুল মানবজীবনের অবিচ্ছিন্নগতি, বিকাশ ও তাহার বর্ণনা এই উপন্যাসখানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় লেখক যেন কতকাল ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন, বাস্তবের সহিত পরিচয়ে তাঁহার কত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কত স্বপ্ন আশার উজ্জ্বলতায় মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিয়াছে—কতদিনের, কোন্ সাধনলোকের এই অতি সঙ্গোপনের এই কাহিনী আজ বাহিরের আলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। যে আদর্শের প্রেরণায় আজ বাঙ্গালী হইতে সমস্ত চিন্তাশীল জাতি মানুষের স্বাধীনতা আকাঙ্খা করিতেছে, লেখক সেই আদর্শের শিখাটিকে যেন প্রাণপণে আগুলিয়া লইয়া চলিয়াছেন। ইহাতে সকল মানুষের হইয়া লেখকের মনের ভাবনা অতি সুস্পষ্ট ও গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপন্যাসখানি পড়িয়া বাঙ্গালীসমাজ উপকৃত হইবে এরূপ আমাদের ধারণা। যে সকল ত্রুটি সাধারণ পাঠককে আঘাত করিতে পারে, আমাদের বিশ্বাস লেখক তাহা ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছেন। চরিত্রকে পরিস্ফুট করিতে, ঘটনাকে ও বর্ণনাকে সুস্পষ্ট করিতে এরূপ করা হয় ত তাঁহার আবশ্যক মনে হইয়াছিল। যে মেঘের আড়াল হইতে স্বর্ণাভ সূর্য্যের রশ্মি উৎসারিত হইয়া পড়ে, সে রশ্মি-লেখার সে সৌন্দর্য্যের জন্য হয় ত ঐ অন্তরালের কালোমেঘটুকুও প্রয়োজন থাকে।

বার্ষিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষের 'বার্ষিক মোহাম্মদী' দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কিরূপ দ্রুত গতিতে যে সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার এক সুন্দর নিদর্শন। মুদ্রণ পারিপাট্যে প্রবন্ধ গৌরবে ইহা যে বাঙ্গলার সাময়িক সাহিত্যে একটী উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, এ কথা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি।

ইহার অনেক প্রবন্ধই বেশ সুচিন্তিত ও সুলিখিত। মৌলানা আক্‌রাম খাঁ সাহেব লিখিত—"অভিব্যক্তি বাদ ও মুসলমান" মৌলভী আবদুল আলি, এম,এ, বি,এল, লিখিত 'ঈমান', ডাঃ এ, মালেক লিখিত "ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র" প্রভৃতি প্রবন্ধে বহু নূতন তথ্য নিহিত রহিয়াছে। ".বংশ শতাব্দীর কাহিনী" ইহার আর একটী

বিশেষত্ব। সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিংশ শতাব্দী মানব-সভ্যতার কতখানি সহায়তা করিয়াছে, তাহা একাধারে সংগ্রহীত হইয়াছে।

রসরচনার দিক দিয়া "সিন্ধু-বিজয়" ও "মহাযুদ্ধের ফলাফল" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র দেব, গোলাম মোস্তফা, হুমায়ুন কবির প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কবিও ইহার কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রও ইহার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মোটের উপর 'বার্ষিক মোহাম্মদী' আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। মূল্য একটাকা বারো আনা মাত্র। প্রকাশক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী ২৯নং আপার সারকুলার রোড; কলিকাতা।

থার্ডক্লাশ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত, ডি, এম্, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ছোট গল্পের বই, প্রত্যেকটি গল্প নূতন চিত্র, বর্ণনা কৌশলে মনোজ্ঞ, বৈচিত্র্যে রস সমৃদ্ধ।

লেখকের ছোট গল্পগুলির ভিতর সবদিক দিয়া একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইহার একটি গল্পও কষ্ট কল্পনা নহে। যেন কোন প্রত্যক্ষদর্শী কাহিনী-গুলি অতি সহজে ও প্রাণস্পর্শী করিয়া পাঠকের সম্মুখে বসিয়া বলিয়া যাইতেছেন। পড়িতে পড়িতে লেখকের নিজের ব্যক্তিত্বও যেন আমরা অনুভব করিতে পারি। ব্যথার পীড়নে তাঁহার বেদনাকাতর দুঃসহ আলাময় দৃষ্টি; আনন্দে উৎফুল্ল অকাতর হাসি—এ সবই যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। এইখানেই উপলব্ধির সহিত প্রকাশের প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছে।

থার্ডক্লাশ পড়িয়া বাস্তবিকই বড় আনন্দ পাইয়াছি। স্বচ্ছ, সরস বর্ণনায় প্রত্যেক চিত্রটি সমুজ্জল ও পরিস্ফুট হইয়াছে। কোথাও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টায় স্বাভাবিক লাবণ্য নষ্ট করা হয় নাই। অথচ থার্ডক্লাশের যাত্রীর মত জীবনের সব অবস্থাতেই, অসুবিধা, উৎপীড়ন, ব্যথা—কোথাও যেন একটু সোয়াস্তি নাই। অনেক দুঃখেও অনেক সময় হাসি আসে, এ গল্পগুলির ভিতরও এমন সব স্থান আছে যে চোখের জল থাকিতেও হাসিয়া ফেলিতে হয়।

যে সকল পাঠকপাঠিকা ছোট গল্পের বই পড়েন না, হয় ত শুধু 'ছোট' বলিয়া—তাঁহারা এই নূতন বইখানি পড়িয়া অনেক 'বড়' বই পড়ার চাইতে বেশী আনন্দ পাইবেন।

দাম্পত্য রহস্য

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, লেখক কর্ত্তৃক ৪৪ নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য-আড়াই টাকা।

দাম্পত্যজীবনের ভিতর যে আবার কোনও রহস্য আছে বা থাকিতে পারে তাহা বাঙালীঘরে অনেকেরই জানা নাই। যে দেশে অন্যদেশ অপেক্ষা অল্প বয়সে নরনারীর বিবাহ হয় সে দেশে—পুরুষ নারী এবং তাহাদের সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য নরনারী মাত্রেই একটা বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বাঙালী গৃহস্থের সাধারণ স্বাস্থ্য খুব উন্নত নয়, নানা প্রকার বিপাকে পড়িয়া নৈতিক জীবনেরও বিকাশপথ কণ্টকিত, উপার্জ্জন অত্যন্ত কম, খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ও অনেক স্থলে বলবর্দ্ধকগুণ বর্জ্জিত, বাসস্থান অপরিমিত ও অপরিসর, পারিপার্শ্বিক স্থানগুলি অপরিচ্ছন্ন ও রোগ সংক্রামিত—এই অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পক্ষেই সুস্থ, আনন্দচিত্ত ও নির্ম্মল জীবন প্রায় অসম্ভব। তাহারপর সন্ততির প্রাণরক্ষা, তাহার জীবন বিকাশের উপায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই অবস্থায় বিবাহিত জীবন কিরূপে যাপন করা উচিত তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানা আবশ্যক। মানুষের মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না; তাহা প্রকৃতিগত ও বয়সের সঙ্গে মানুষের দেহে মনে বিস্তার লাভ করে, কিন্তু সেই সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রবৃত্তিগুলিকে কিরূপে সঙ্গত ও সংযত উপায়ে ব্যবহারিক

জীবনে স্থান দিতে হয় তাহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। দাম্পত্য রহস্য পুস্তকখানি পড়িলে দাম্পত্য-জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য ও জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা করা যাইবে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙলা ভাষায় এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার ন্যায় সঙ্গত। শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে পুস্তক পড়া যেমন আবশ্যক, এরূপ ধরণের পুস্তক পড়াও তেমনি প্রয়োজন! অজ্ঞানতার জন্য নরনারী নিজের প্রতি ও সন্তানের প্রতি যে সকল অন্যায় করে দাম্পত্য জীবনের কতকগুলি রহস্যের সন্ধান পাইলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা কম হইবে।

এই পুস্তকখানির ভাষা সহজ, বর্ণনা শাস্ত্রসম্মত ও জ্ঞাতব্য বিষয় নরনারী মাত্রেরই উপকারী।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খাইবার সময় সেরাত্রে বিশেষ কোন কথা আর হয় নাই। দুএকবার রসিকতা করিবার চেষ্টা অবশ্য শচীন করিয়াছিল কিন্তু অবশেষে কাহারও দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া সেও চুপ করিয়া গেল।

অকস্মাৎ এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া ফেলিয়া অকারণেই কেমন যেন লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। মনুও যেন মনে হইতেছিল কেমন একটু অস্বাভাবিক ভাবে আমার দিকে চাহিতেছে। ভাত দিতে আসিয়া একবার চোখো চোখি হইতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "আমাদের বিশ্রী রান্নায় বিরক্ত হয়েই বুঝি পালাচ্ছেন।"

"আর যা কিছু বলো ও অপবাদ তুমি রবিকে দিতে পার না মনু। তোমার রান্না ত ছার, জেলের লাপ্‌শির সঙ্গে ফরাসী 'শেফের' রান্নার তফাৎ রবি বুঝতে পারে এত বড় নিন্দে ওর অতি বড় শত্রুও করতে পারে না" বলিয়া শচীন হাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম হইতে উঠিলাম তখন বেলা বেশী হয় নাই কিন্তু সাধারনতঃ বেলা নয়টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা যাহার নীতি বিরুদ্ধ সেই শচীনকে অত সকালেও ঘরে দেখিতে পাইলাম না।

নিজের সামান্য যে জিনিষ পত্র ছিল তাহাই একটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া ফেলিতেছি এমন সময় মনু আসিয়া ঘরের চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ও কি করছ ?'

অকারণে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, "আজকে আমায় যেতে হ'বে।"

আর কিছু সে বলিল না, শুধু খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া নীরবে উঠিয়া গেল। তাহার নূতন সম্বোধনের বিস্ময় তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

জিনিষপত্র বাঁধা তখন হইয়া গিয়াছে। শুধু শচীনের সঙ্গে দেখা না করিয়া এবং আর একবার মনুদের নিকট ভাল করিয়া বিদায় না লইয়া একেবারে চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এক একবার সন্দেহ হইতেছিল শচীনের অপ্রত্যাশিতভাবে সকালে উঠিয়া অন্তর্দ্ধানও বোধ হয় আমায় ধরিয়া রাখিবার একটা ছল।

কিন্তু খানিক পরেই মনু আবার ফিরিয়া আসিল এবং দরজা হইতে আমার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে এবেলায় খাওয়া দাওয়া না সেরে যেও না। আমি রান্না চড়িয়ে দিয়েছি।"

কিন্তু মনুর কথাতে সঙ্কল্প আমার যেন হঠাৎ স্থির হইয়া

গেল। আর বেশীক্ষণ থাকিলে এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার মত মনের জোর থাকিবে কিনা সে বিষয়ে একটু ভয়ও বুঝি মনের ভিতর ছিল।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না না এবেলা খাওয়া আমার আর হবে না মনু; আমায় এখনি যেতে হবে।" পুঁটলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

মনু হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এত ভয় পাচ্ছ কেন। আমরা জোর করে ধরে রাখব না।"

শচীন হইলে একথায় জবাব বোধ হয় কিছু একটা দিতে পারিত। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলাম না।

মনু আবার হাসিল, বলিল, "ভদ্রতার খাতিরেও আমার কথার একটু প্রতিবাদ করতে ত হয়! এমন মুখচোরা লোক আসে দেশ উদ্ধার করতে? তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাও, বুঝেছ!"

বোবা সত্যই নই, কিন্তু সেদিন এই মেয়েটির সামনে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত অপরাধীর মত পুঁটলিটি লইয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনু প্রথমে দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু এক পা যাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া খপ্ করিয়া ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। একী অদ্ভুত ব্যবহার! আমার বিমূঢ় সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনু আবার হাসিয়া উঠিল।

"এখন যদি জড়িয়ে ধরে রাখি!" এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় বলিবার মত কিছু ভাবিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আবার বলিল, "ভাবছ, কি বেহায়া নির্লজ্জ এই মেয়েটা,—না? ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ছে বোধ হয়!"

তাহার পর হাতটা আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল "নাঃ তোমার মত লোককে নিয়ে ঠাট্টা করাও পাপ।" এবং বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দরজায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমায় যা খুসী মনে কোরো কিন্তু আমার ব্যবহারে সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাকেই যেন বিচার করে বোসো না, তোমার মত লোকের পক্ষে তা যদিও স্বাভাবিক!"

তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই। শুধু দেখিয়াছিলাম তখনও সে হাসিতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের মত পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল এ হাসি তাহার মুখে কখনও যেন দেখি নাই।

কোথায় যাইব ঠিক কিছুই করি নাই। লক্ষ্যহীন হইয়াই পথ চলিতেছিলাম।

শচীন কখন হইতে পিছু লইয়াছে লক্ষ্য করিনাই। পিছন হইতে অকস্মাৎ পিঠে চাপড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি এত ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিস বলত! আমি যে পাঁচ মিনিট তোর পেছু পেছু আস্‌ছি!"

যাহা ভাবিতে ছিলাম তাহা শচীনকে বলিবার নয়, নিজের মনের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এমন কথাও বলিতে পারি না। তাই তাহার দিকে ফিরিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম "এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?"

সে কথার জবাব না দিয়া শচীন বলিল, "তাহলে সত্যিই চল্লি! ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে শেষ দেখা না করে অন্ততঃ যেতে পারবি না, কিন্তু তোরা হলি ভীমের জাত সব পারিস।"

মনুও যেন এমনি কথাই বলিয়াছিল। উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলাম।

সঙ্গে যাইতে যাইতে শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু চলেছিস্ কোন চুলোয়? তোর যে আগের আস্তানায় ত ওঠবার উপায় নেই জানি।"

সত্য কথাই "বলিলাম—এখনো ভেবে কিছু ঠিক করিনি।"

সে হাসিয়া বলিল, "ঠিক করবারই বা কি আছে? কলকেতার রাস্তায় ফুটপাথগুলো যথেষ্ট চওড়া, ভালো দেখে একটা গাড়ী বারান্দা বেছে নিলে দেখেছি ঝড়বৃষ্টিও গায় লাগে না। মাথায় দিবার জন্ত একটা ইট? তাও দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং ভালোই থাকবি।"

তাহার কথার ধরণে হাসিয়া ফেলিলাম।

সে আবার বলিল, "আমার সংশ্রবে থাকতে ত আর পারিব না; কিন্তু আমার একটা কথা শুনলে তেমন মহাভারত অশুদ্ধ বোধহয় হবেনা, কি বল?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কথা।"

"ফুটপাথের চেয়ে সামান্ত একটু ভাল জায়গা আমার

জানা আছে। একান্তই ফুটপাথে শয়নের পথ না নিয়ে থাকলে যেতে পারিস। বেশী কিছু নয় একটা মেস। তবে নেহাৎ খারাপ লাগবেনা, শুনেছি দেশের সেবায় অন্ততঃ তিনবার যে না জেলে গিয়েছে তার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং সানইয়াৎ সেন, ডি ভ্যালেরার দলে ভালই থাকবি বলে আশাকরি।"

মেসের ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত সে বলিয়া দিল। প্রস্তাবটা মন্দনয়, কিন্তু তবুও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম।

শচীন নিজে হইতেই আমার মনের কথা বুঝিয়া বলিল, "না না, টাকা কড়ির জন্যে ভাবতে হবে না। যখন সুবিধে হবে তখন দিলেই চলবে। শুধু নগদা চাই দেশ প্রেম। তা যে তোর আছে সে তারা দেখেই বুঝবে। আচ্ছা আসি তাহলে।" বলিয়া হঠাৎ বিদায় লইয়া শচীন চলিয়া গেল।

পথ খুঁজিয়া সে মেসে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন দুপহর হইয়া গিয়াছে। খদ্দরের গান্ধী টুপি পরিহিত একটি খর্ব্ব ক্ষীণকায় ছেলে মেসের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম মেসে থাকিবার জায়গা আছে কিনা।

পুরু চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া আমায় ক্ষাণিকক্ষণ সন্দিগ্ধ-ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ছেলেটি বলিল, "আপনার নামই কি রবীন বাবু।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম 'হাঁ'

পরমুহূর্ত্তেই সহসা অভ্যর্থনা করিয়া ছেলেটি বলিল, "বাঃ আপনার জন্তই ত অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলাম, দেরী হল যে?"

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিল, "আসুন এই ওপরেই। আপনার সীট্ ঠিক হয়েছে;" এবং পুঁটলিটি আমার হাত হইতে একপ্রকার কাড়িয়া লইয়াই নিকটের সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল।

বাধ্য হইয়াই তাহার পিছু পিছু গেলাম কিন্তু রহস্যের তখনও সমাধান করিতে পারি নাই। একমুহূর্ত্তের পরিচয়ে বুঝিয়াছিলাম ছেলেটি কথা বলে বড় বেশী। সে অনর্গল বকিয়া চলিতেছিল। "সিঙ্গ্‌ল্ সীটের রুম ত আর এ মেসে নেই। ডব্‌ল সীট্ ও এই একটি; আপনি থাকবেন বলে নরেশকে জোর জবরদস্তি করে তুলে নীচে পাঠিয়ে দিলাম। সে কি সহজে যেতে চায়! জানেনত, ওই খানেই ছিল রজনীবাবুর সীট্, রাজবন্দী রজনী মুখুজ্যে, বুঝেছেন ত?…

তাহার এ বাক্য স্রোতের ভিতর সামান্য একটু প্রশ্ন করিবার ফাঁক পাওয়া অসম্ভব জানিয়াই চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কথাতেই রহস্য শেষে পরিষ্কার হইয়া গেল।

সে বলিতেছিল,—"আপনি আবার একটু নিরিবিলি ভালবাসেন শুনলাম কিন্তু কি করবো বলুন, ঘর ত আর নেই, সব ঘরেই পাঁচ ছজন করে লোক। শেষকালে শচীনবাবু বল্লেন, "তাহলে আর কি হবে এই সীটটাই তাকে দিও। তিনিত একেবারে পুরো মাসের চার্জ্জই দিচ্ছিলেন, আমরা বল্লাম তাকি হয় এখানে কি আমরা ব্যবসা করতে বসেছি……

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10/2 Patuatola Lane, and printed by same at the Calcutta Printing Works, 29, Ramkanta Mistri Lane, Calcutta.

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

নবীন সাধক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ;
ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গ হ'তে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধু সনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্ব্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া,
প্রভাত সূর্য্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্ব্বাদ-নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হ'তে
নির্জ্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্ব্বারিত স্রোতে
সঙ্গীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ-সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগাবে উৎসাহ॥"

৩১ ডিসেম্বর
১৯২৮ —বঙ্গধারা

শব

শ্রীফণীন্দ্র পাল

নদী নয় নদীর কঙ্কাল, শুধু বালুর শীর্ণ দীর্ঘ প্রান্তর। শোনা যায়, ইহাই তাহার আদি জীবন নয়, একটি স্বচ্ছ প্রবাহ পল্লীবালাদের শূন্য কুম্ভ পূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের মন্থর পদশব্দে অতৃপ্তির উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে—সেও কতদিন হইল!

কিছুদিন পূর্ব্বেও নাকি ছিল ফল্গু। দুইহাত খুঁড়িলেই জল মিলিত। হইবেও বা। এখন শুধু চৈত্রের উত্তপ্ত রৌদ্রের তলায় পড়িয়া বিস্তীর্ণ বালুকারাশির বুকে অনির্ব্বাপিত তৃষ্ণার আগুন জ্বলে। আর তাহার উপর একটি বিবাগী পথ উদাস সঙ্গীটির মত শুভ্র বালুর সুদূর সীমানা পর্য্যন্ত সমানে ছুটিয়া গিয়াছে দেখা যায়। প্রতিদিনের অসংখ্য পদচিহ্ন পড়িয়া কোনটির সুস্পষ্ট রেখা আর রাখে নাই। সে পথের বাঁধা পথিক তো আছেই আর গেছে নিরুদ্দেশ পথিক—যাহারা পিছনের স্মৃতিজড়িত বিষণ্ণ জীবনের দিকে কোনকালে আর চোখ ফিরাইবে না।

উদয়গ্রাম।—লজ্জাভীরু বালিকার মত সে স্নিগ্ধ, কিন্তু বিধবার চেয়েও বিষণ্ণ।

বাঁশঝাড়ের ভিতর বাতাসের শব্দে মনে হয় যেন কতকগুলি মা-হারা শিশু ককাইয়া কাঁদে। দূর ব্যবধানে ছোট গৃহগুলি যেন পথহারা শ্রান্ত পথিকের মত হাঁপায়।

গ্রামের সীমানায়, বালুপ্রান্তরের পাশেই একটি বৃদ্ধ জীর্ণ বাড়ী যেন ভুরু কুঁচকাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া। তাহার ভিতরের মালিকটি বাড়ীর মতই বৃদ্ধ।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী। একটুকরা প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া ঘরগুলি। তাহাতে তাঁহার দেশ বিদেশের শিক্ষার্থীগুলি থাকে। সংখ্যায় তাহারা একুশজন। ছোট উঠানটির কোণ ঘেঁষিয়া বেলগাছের সম্মুখে একটি ভিন্ন ঘরে থাকেন পণ্ডিত ও তাঁহার কন্যা গায়ত্রী। ঘরটির সাম্‌নে দালান গোছের স্বল্পপরিসর একটু স্থান; সেইখানে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া তিনি শিষ্যদের পাঠ দেন।

প্রভাত-সূর্য্যের খানিকটা আলো গাছের ভিতর দিয়া গড়াইয়া ঘরে আসে। তাহারই আলো-ছায়ার সন্ধিস্থানে গৃহকর্ম্মনিরতা গায়ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রায় সকল শিষ্যগুলির নিকট ব্যাকরণে দুইটি মাত্র বিষয় ও শাস্ত্রে একটি মাত্র সমস্যা ব্যতীত সমস্তই যেন ঝাপ্‌সা হইয়া যায়।—সন্ধি ও সমাস ব্যাকরণে আর শাস্ত্রে বিবাহ।

শুধু একজন পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া চায় না। এখানে সে নবাগত।

সুপ্তপল্লীর ভগ্নগৃহে দুইটি প্রাণী পাঠে আর তর্কে মগ্ন হইয়া থাকে, আত্মহারা গুরু আর শিষ্য। স্তূপীকৃত অন্ধকারের ভিতর ক্ষীণ আলোর পুঁজি লইয়া মাটির প্রদীপটি জ্বলিতে থাকে।

শিষ্য পুঁথির দিকে চাহিয়াছিল হঠাৎ শ্যামাদাস পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন,—'বুঝ্‌লে নিশি, হিন্দুশাস্ত্রটা একদিক দিয়ে যেমন জটিল আবার সরলও তেমনি।' তাঁহার শুভ্র দাড়ির ভিতর ঘন ঘন আঙুল চলিতে লাগিল।

নবাগত নিশিকান্ত তাঁহার প্রিয় শিষ্য। গুরু আরও কিছু বলিবেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ তুলিয়া দেখিল পুঁথির ভিতর শ্যামাদাস আবার আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছেন আর তাঁহার ম্লান মুখে তৃপ্তির একটি প্রশান্তি ভাসিয়া উঠিয়াছে। জগতের অপরিসীম দুঃখ-বেদনার ছায়া সেই বৃদ্ধের মনটিতে ক্ষণিকের জন্য একটি রেখা ফেলিতে না পারার লজ্জায় যেন তাঁহার নিকট বিদায় লইয়াছে।

ঘরের ভিতর গায়ত্রী জাগিয়া থাকে। প্রদীপের ম্লান আলোয় তাহার মনে হয় নিশিকান্তের মুখখানি বিষণ্ণ

পাণ্ডুর। ব্যথা ওখানে রহস্য হইয়া আছে। ওর দৃষ্টিতে যেন জল ঝরিয়া পড়ে।

কিন্তু গুরু শিষ্যের কথোপকথন ততক্ষণে আবার সুরু হইয়া গেছে। শ্যামাদাস তখন বলিতেছেন, 'এই যে মনু বলেন, মানুষ,—ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতা হ'তে উদ্ভূত; গণ্ডগোলটা তো ওইখানেই—তা হ'লে মানুষ দেবতা নয়ই বা কিসে? নিশ্চয় এমন কোন একটা সূত্র আছে যা' দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব বিভাগ করে' রেখেছে।'

নিশিকান্ত ধীরে ধীরে বলিল, 'ঈশ্বরের সৃষ্টি-পদ্ধতি সবই তো বেদ, উপনিষদ, মনুতে ব্যাখ্যাত।'

শ্যামাদাস আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ভিতর হইতে গায়ত্রী ডাকিল, 'বাবা, রাত যে অনেক হোল।' গায়ত্রীর কোন কথাই তাঁহার নিকট পৌছাইল না, তিনি তখন আলোচনার উদ্যোগ করিতেছিলেন। গায়ত্রী দরজার পাশে আসিয়া ডাকিল, 'বাবা—'

তিনি সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, 'এই উঠি মা।—কিন্তু বুঝ্‌লে নিশিকান্ত, মানুষের সঙ্গে দেবতার যে কি একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ যে অনেক দর্শন শাস্ত্রকার অস্বীকার করেন।'

তাহার পর বাহিরের দুস্তর অন্ধকারের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'শাস্ত্রে কত যে অমীমাংসিত সমস্যা আছে—বিরাট সমুদ্রের স্রোতের মত তার মতামত নিয়ে সংঘর্ষ, কিন্তু এর শেষ যে কোথায় তা' এতখানি প্রাচীনতা নিয়েও তো বুঝলাম না। এই যে উঠি মা; নিশি, আজ তিথিটা——?'

নিশি বলিল—'কৃষ্ণা একাদশী।'

'—ও একাদশী, কিন্তু পরাশর বলেন—'হঠাৎ তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। একটা উচ্ছল ধারা কোথায় যেন বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।

নিশিকান্তকে বিদায় দিয়া শয্যার উপর শুইয়া তাঁহার ভাবনার অন্ত রহিল না। মনে হইল কাতর শিশুর মত তিনি অসহায় আর এই মাতৃহারা মেয়েটির চিন্তা চোখের বালিটির মত থাকিয়া থাকিয়া কচ্‌ কচ্‌ করিয়া ওঠে। তাহার শান্তি নাই, হইবেও না।

চিন্তা অবসন্ন মন লইয়া পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িলেন। গায়ত্রী ঘুমাইয়া। নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর তাহার ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যায়।

বাহিরে একটি পেঁচা ক্রমাগত কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছিল। পণ্ডিত বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, হঠাৎ চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'গায়ত্রী মা, তোর আজ একাদশী, কিন্তু পরাশরের মতে—'

পরাশরের মত যেন তিনি কাহাকেও শোনাইতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাই শুধু কতকগুলি অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহা সম্পূর্ণ বোধ্য তো নয়ই সুসম্বদ্ধও নয়। অনুক্ষণ চিন্তান্বিত ব্যক্তিটি স্বল্প সময়ের ভিতর নিদ্রায় আবার বিভোর হইয়া গেলেন।

যাহার উদ্দেশ্যে এই উক্তি তাহার বাহ্যিক চেতনা তখন বিন্দুমাত্র সজাগ ছিল না। অন্তরতম স্থানে বসিয়া চির-জাগরূক আত্মার হাহাকার, ঘুমন্তের একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে ঘরের বদ্ধ বাতাসে শুধু ছড়াইয়া গেল।

বৃদ্ধ শ্যামাদাস শাস্ত্রের জটিলতা সমাধানে আত্মহারা হইয়া যান—একটি গুপ্ত অঙ্কুশের আঘাতে সান্ত্বনার প্রলেপের মত।

গৌরীদানের পুণ্যলোভের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে কন্যা গায়ত্রীর বৈধব্যে। সেদিন অনুশোচনায় স্নেহসিক্ত মানুষটি মেয়েটিকে বিধবার বেশে দেখিতে ভয় পাইয়াছিল। তাহার পর দিনগুলি সহজ ছন্দে অবিরাম চলিয়া গেছে।—ভবিষ্যতের চিন্তার অবকাশ সেখানে ছিল অল্প। যৌবনের উদয় যখন গায়ত্রীর জীবনের সর্ব্বপরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা-চাঞ্চল্যকে জাগাইয়াছে তখন বৃদ্ধের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন, এ গোপনতার ক্রমশঃতে আছে অসীম অশান্তি আর অপযশ। কিন্তু উপায়ও তখন কিছু ছিল না।

চারিদিকে ছড়ানো পুঁথি-পত্রের ভিতর বসিয়া নিশিকান্ত ব্যাকরণ পড়িতেছিল। তখন বেলা অনেকখানি। সবদিকে

খেয়াল না রাখাটাই নাকি ভাল—সেটাই উন্নতির সূচনা।

মানুষটি যেন একটি দুরূহ সংস্কৃত উচ্চারণ। অনেকবার তোৎলাইয়া পড়ার মত তাহাকে বুঝিতে হয়। না-বোঝার দাবী যেখানে বেশী সেইখানেই মানুষের কৌতূহল ও আকর্ষণের সীমা নেই।

চতুষ্পাঠীর রন্ধনের ভার ছিল গায়ত্রীর। শিক্ষার্থীদের ভিতর পালা করিয়া এক একজন তাহাকে সাহায্য করিত। সেদিন ছিল নিশিকান্তের, কিন্তু অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত তাহার দেখাই মিলিল না।

সকলে খাইয়া চলিয়া গেছে। গায়ত্রী আহারে বসিয়া ভাবে একটি লোক হয়তো এতক্ষণ ব্যাকরণে সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমর্পণ করিয়াছে। অনুমান তাহার মিথ্যা নয়। গায়ত্রীর পদশব্দ তাহার ধ্যান ভাঙাইতে পারে না।

ক্রোধের কৃত্রিম ভঙ্গীতে সে বলে, 'খাওয়া-দাওয়া আজ্‌কে কি হবে না, আর এতবেলা অবধি একজনকে উপোস করিয়ে রাখার উপদেশ কোন্ শাস্ত্রে আছে বল্‌তে পারেন?

গায়ত্রী যে হঠাৎ এমনভাবে আসিয়া হাজির হইবে সে কথা নিশিকান্ত ভাবিতে পারে নাই। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলে, 'ওঃ এত-বেলা! বড় ভুল হ'য়ে গেছে কিন্তু, ব্যাকরণের এই খানটা—'

গায়ত্রীর হয় অভিমান। লোকটির অন্তরে কি এক-ফোঁটাও কৃতজ্ঞতা নেই। অন্য কাহারও ভাত আগলাইয়া উপোস সে করে না তা' এ লোকটি জানে—তার জন্য ক্ষমা চাওয়া অন্ততঃ ছোট একটি বিনীত ধন্যবাদ। রাগ করিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া যায়।

নিশিকান্ত অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

সে যে নিরপরাধ তাই শুধু ভাবিতে চেষ্টা করে।

অকারণেই আবার গায়ত্রীর চুড়িগুলি বাজিয়া ওঠে; এতদূরে, যেখান হইতে শব্দ নিশির কাণে বাজিয়া যেন হাতছানি দেয়।

গায়ত্রী রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছে। নিশিকান্ত বিনীত অপরাধীর মত পিছনে যাইতেছিল,—যেন ক্ষমা চাহিবার জন্য উৎসুক। রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গায়ত্রী তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই হাসি। বলিল,—'খিদে পেয়েছে বুঝি? ডাকলুম যখন তখন এলেই হ'ত। আজকে পালা ছিল কার মনে আছে কি? শাস্ত্র ঘাঁটলে কি হবে, একটি আস্ত বোকা আপনি।'

নিশিকান্ত কথার উত্তর দিবে কি, সে তো গায়ত্রীর ব্যবহারে বা আলাপে সঙ্গতি খুঁজিয়াই পাইল না। পালা যে তাহার সে কথা স্মরণ করানো নিষ্প্রয়োজন, বিলম্বে খাইতে আসার হেতুও তাহার অজ্ঞাত নয়। তাহা অপরাধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণ দেয় না নিশ্চয়।

দুর্ভোগের তখনও কিছু বাকী ছিল।

রান্নাঘরের অবস্থা দেখিয়া গায়ত্রী রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিবার যোগাড় করিল। তাহার ও নিশিকান্তের ভাত ঘরের মধ্যখানে ঢাকা ছিল। সমস্ত তছ্‌নছ্‌ করিয়া কুকুর খাইয়া গেছে।

'দেখুন দিকিনি এখন করি কি? দিন আজ্‌কে উপোস আপনার জন্যে আজ আমারও খাওয়া জুটল না। বিদ্যের যদি এতই দরকার তো বুদ্ধিটাই বা এত কম কেন?—হতবুদ্ধি নিশিকান্তকে গায়ত্রী খুব একচোট ধমকাইয়া দেয়।

সমস্তদিন না খাইয়া থাকার ভাবনা অস্বস্তিকর গায়ত্রীর আবার মনে হয়, উপোস সে নয় করিতে পারে কিন্তু ওই শান্ত লোকটি যার কোনও অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ পায় না তাহার অনাহারের কথা ভাবিতে পারে না।

উনান ধরাইতে ঘরের আলো ধোঁয়ায় কালো হইয়া ওঠে। নিশি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চলিয়া যাইবার সাহস তখনও সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই।

গায়ত্রী গম্ভীর ভাবে বলে, 'যাওয়া হবেনা এখন আপনার আমার কাজে যোগাড় দেবেন।'

আশ্চর্য্য এই মানুষের মন, উপকার জিনিষটা কত সহজে সে নিতে পারে কিন্তু ভুলিয়া যায় যেখান থেকে সেটা আসে সেখানে একটা লাজুক আকাঙ্ক্ষা আছে।

হঠাৎ রূঢ় ভাবে বলে, 'বল্‌তে পারেন নিত্যিই এই যে অতগুলো লোককে রেঁধে খাওয়াই, অসুখে সেবা করি, তারা আমার নিজের কেউ নয়, যাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাবার আশাও নেই—নেবার ইচ্ছেও নেই।—আমা

এতখানি নিঃস্বার্থ জীবনে আনন্দ কি? তার তৃপ্তির উদয়াস্তের কোনো সীমা আছে কিনা, বলুন আপনি?'

গায়ত্রী উনানে ফুঁ দিতে দিতে থামিয়া থামিয়া কথাগুলি বলে আর ধোঁয়ায় তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া ওঠে।

একটা কিছু উত্তর তখন না দিলেই নয়। কিন্তু ওই লোকটির কোথাও বুঝি এতটুকু চাঞ্চল্য ছিল না। নিজেদের সম্বন্ধে এই কঠোর অপযশের প্রতিবাদের উষ্ণতাও তাহার কণ্ঠে ফুটিল না। মৃদু হাসিয়া নিশিকান্ত বলিল, 'এইতো আপনাদের কর্ত্তব্য, মনু যা' নির্দ্দেশ করে' গেছেন। আর আনন্দ, তৃপ্তি, কথাগুলো নিরর্থক, ওর কোনো চুলচেরা ব্যাখ্যা হয় না, ওটা মানুষের মনের সকল অবস্থাতেই মানুষ যা উপভোগ করিতে পারে। শাস্ত্রেই তো বলে—'

মাঝপথেই নিশিকান্তকে বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে গায়ত্রী বলিয়া ওঠে'—শাস্ত্রে বলে! শাস্ত্র তৈরী করেছে কে—সে তো মানুষ, আপনাদেরই মত পুরুষ, যারা মেয়েদের প্রশস্ত পথে চলতে দেয়নি, যারা নিজেদের জন্য অপর্য্যাপ্ত সুখের আয়োজন করেছে।'

গুরু-কন্যার তীক্ষ্ণ কথাগুলি নিরীহ নিশিকান্তের নিকট এক একটি যেন বিস্ময়ের স্ফুলিঙ্গ, যার স্ফুরণে শুধু বেদনা জাগায়।

গায়ত্রীর শেষ প্রতিবাদের উত্তর নিশি উচ্চারণ করেনা কিন্তু তাহার মুখের অস্বাভাবিক ভাবে মনে হয় মুখের উত্তরের চেয়েও এ যেন বেশী মর্ম্মস্পর্শী।

খোঁচা খাইয়া উনানের অর্দ্ধসুপ্ত আগুন প্রবল তেজে জ্বলিয়া ওঠে। ঘরময় তাহার রক্তাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

গায়ত্রী কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিশির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। নিশিকান্তের বিরূপ মন তাহার দৃষ্টির সহিত ঘরের বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চায়।

আশ্চর্য্য এই গায়ত্রীর ভঙ্গী-পরিবর্ত্তন। মৃদু হাসিয়া বলে, '—ক্ষিদেয় মুখ যে শুকিয়ে গেছে দেখছি, কি আর করব বলুন দোষ তো আমার নয়। আচ্ছা আপনি এর আগে কোথায় ছিলেন?'

আকস্মিক প্রশ্নে নিশিকান্ত বিস্মিত হয়। কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'ছিলাম্ আগে আমাদের গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে, সেখানে পড়ার সুবিধা হ'ল না। একচক্ষু রামহরি বাচস্পতি, বিদ্যে যত না, বচন তার চতুর্গুন। বলত, উপনিষদ পড়তে লাগে তিন দিন, আর মুগ্ধবোধ আড়াই ঘণ্টা। হিন্দুশাস্ত্রটা যে কতখানি ব্যাপক তা' কল্পনা করতে পারা যায় না। অসীম জ্ঞান আপনার বাবার, পরাশর, মনু, ভৃগু,—'

পড়িতে বাকী যে কিছুই নাই তা গায়ত্রী জানে আর এও জানিতে পারে তাঁহার অধ্যয়নপিপাসু এই শিষ্যটি একবার পাঠ্য সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলে তাহাকে শান্ত করা কঠিন।

গায়ত্রী কথার মোড় ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল,'—আচ্ছা এখানকার শিক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরবেন—না?

নিশিকান্তের প্রবল উৎসাহ কমিবার নয়, বলিল'—বাড়ী! বিদ্যাশিক্ষাটা কি এতই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ মনে করেন; এখান থেকে যাব কাশী, ব্যাকরণে উপাধি-পরীক্ষা দিতে, তারপর নবদ্বীপ—'

গায়ত্রী জুড়িয়া দেয়, 'বোষ্টুমীর খোঁজে?'—বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

নিশি প্রবল আপত্তি করিতে যাইবে এমন সময় আসিলেন শ্যামাদাস ন্যায়রত্ন নিজে। আসিয়া বলিলেন,—'চল নিশি, বেদান্ত ভাষ্যের কিছু আলোচনা করা যাক্।'

নিশিকান্ত যাইবার জন্য উঠিতেই গায়ত্রী পিতাকে বলিল,—'তোমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই; এঁর যে এখনও খাওয়া হয়নি, আর উনি চলে' গেলে আমার রান্নার জোগাড়ই বা দেবে কে!'

কুণ্ঠিত হইয়া শ্যামাদাস বলিলেন,'—ওঃ—তোরা দুজনে বুঝি গল্প করছিলি। কি বলছিলি, নিশি এখনো আহার করেনি,—অন্যায়, অন্যায়, এতবেলা অবধি উপবাস করে' থাকা। নিশিকে খেতে দে গায়ত্রী। আমি চললাম, কামাখ্যাকে ডেকে নোব।'—বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

নিশিকান্ত হতাশভাবে পুনরায় জলচৌকীর উপর আসন গ্রহণ করিল।

গায়ত্রীর সহিত নিশিকান্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এই প্রথম পরিচ্ছেদ। প্রারম্ভেই মুখর মেয়েটির নিকট তাহার সমস্ত যুক্তি, সকল ব্যক্তিত্বই যেন এক অনিচ্ছুক অপটুত্ব লইয়া হাজির হইয়াছে।

পাশের দালান হইতে শ্যামাদাসের শান্ত কণ্ঠ ছাপাইয়া

কামাখ্যার গম্ভীর স্বরে তর্ক শোনা যাইতেছিল।—কি তাহার উচ্চারণের স্পষ্ট ও দৃপ্ত ভঙ্গী, গুরুগম্ভীর ভাষা, কথা বলিবার পদ্ধতিতে একটি গর্ব্বিত বিজ্ঞতা।

চতুষ্পাঠীতে কামাখ্যার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কামাখ্যা পুরাতন ছাত্র। পণ্ডিত তাহাকে বহুযত্নে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ যত্নে শিক্ষা দেওয়ার মূলে একটি অঙ্কুর, যাহার পরিণত উদ্গমে আছে একটি সামাজিক সমস্যা; শাস্ত্রীয় বলিলেও ক্ষতি নাই। গায়ত্রীর সহিত কামাখ্যার বিবাহ এবং যৌতুক হিসাবে চতুষ্পাঠীর শিক্ষকতা—তাহার ভবিষ্যৎ সাংসারিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্বরূপ।

কামাখ্যার নিকট বোধ হয় গুরুর মনোগত ইচ্ছা অজ্ঞাত ছিল না।

বিবাহ সম্বন্ধে কামাখ্যার কিছু নব্য মত। বলিত, 'পরিণয় বা প্রণয় যার সঙ্গে হবে, সে আমার গুণকে শ্রদ্ধা করবে আর ভালবাসবে আমার প্রাণকে, তবেই তো দুটো হৃদয়ের যে সমাস সেটা হবে অচ্ছেদ্য।'

তাহার নিজের দিক হইতে সে বাস্তব জীবনে এই বিধি অনুসরণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখে নাই। শ্যামাদাসের সহিত শাস্ত্র বা সমাজ সম্বন্ধে আলোচনার সময় তাহার পাণ্ডিত্যের অভিনয় চলিত। সে মনে করিত এই নির্জীব প্রাচীরগুলির যে কোন একটির অন্তরালে সজীব একজন আছেন যাঁহার নিকট নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া শ্রদ্ধা আদায় করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত করা বিজ্ঞতা-পরিচায়ক।

ইতিমধ্যে গায়ত্রীর রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছিল। নিশিকান্ত আহার করিতে বসিয়াছে। গায়ত্রী হঠাৎ বলে, 'মানুষের জীবনে অসম্পূর্ণতা অনেক কিন্তু কি দরকার তাকে চাপা দেবার? দুর্ব্বলতা জিনিষটা যে কত চমৎকার, মধুর, আর প্রয়োজনীয় তা' শুধু তারাই জানে যারা সেটাকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিতে পেরেচে। আশ্চর্য্য হচ্ছেন—না? আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে খাওয়ার কাজটা তো এগোয় না। আপনার খাওয়া শেষ হ'লে যে আমার আরম্ভ হবে এরমধ্যেই ভুলে গেলেন, বড় অন্যমনস্ক আপনি!'

নিশিকান্ত লজ্জিত হয়। গায়ত্রীকে দেখাইয়া সে দ্রুত আহার করিতে লাগিল।

নিজে সে নির্ব্বাক। অথচ মনযোগ দিয়া গায়ত্রী বক্তব্য না শুনিলে সে রাগিয়া আগুন হইবে। ওই অদ্ভুত মেয়েটির পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়; নিশির তাই বিশ্বাস।

গায়ত্রী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়াই কুটি। বলে, 'থাক অত তাড়াতাড়ি খাবার বাহাদুরী আর দেখাতে হবে না।'

কিছুক্ষণ পরে টিপিটিপি হাসিয়া আরম্ভ করে, 'ওই শুনুন কামাখ্যাবাবু কেমন গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিচ্চেন চেঁচিয়ে, ও যে কতখানি মেকী, কত বড় অভিনয়! অক্ষমতাকে উনি চাপা দিতে চান শ্রদ্ধা পাওয়ার লোভে।' বলিতে বলিতে সে গম্ভীর হইয়া যায়।

'—কিন্তু কামাখ্যাবাবু বেশ রসিক, আপনার মত মুখ গোমসা করে থাকেন না। বলেন, সমস্তরাত ঘুম হয়না ভয়ে। বিয়ে হবার আগে মরেই যাই যদি তা হ'লে কাঁদবে কে আমার জন্যে? বেচারীর দুঃখু দেখে মনে হয় বিয়ের মন্ত্র কটা ওর সঙ্গেই পড়ে নিই।'—হাসিয়া গায়ত্রী বলে ও একবার চকিতে নিশির মুখভাব লক্ষ্য করিয়া লয়।

নিশিকান্ত তখন আহার শেষ করিয়াছে। গায়ত্রীর নির্লজ্জতা তাহাকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল।

অকস্মাৎ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহার চলিয়া যাওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকুণ্ঠিত। এতক্ষণ পরিচয়ের আত্মীয়তার পর একটি বিদায় সম্ভাষণও নয়।

গায়ত্রী আহারে বসিয়া ভাবে তাহার অনতিদীর্ঘ জীবনে কত ছাত্রের সহিতই না পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এমন একটি নিস্পৃহ নিরাকুল বন্ধুর সঙ্গে বুঝি কোনোদিন দেখা হয় নাই।

ম্লানায়মান সন্ধ্যালোকে বসিয়া গায়ত্রী এক অকথিত ব্যথায় বিবর্ণ হয় আবার পুলকে শিহরিয়া ওঠে।

বিধবা বিবাহ লইয়া তর্ক। একা নিশিকান্তের বিরুদ্ধে পণ্ডিত এবং কামাখ্যা। শ্যামাদাস ও কামাখ্যা বলেন, 'বিধবা

বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের বিভিন্ন মত সত্য কিন্তু অসম্মতি যাদের তাঁরা থাকুন আলাদা। সংসার বলে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী তার পরিপূর্ণ সার্থকতার দাবী অধিকার করতে আসবেই। সেই হচ্ছে শাস্ত্র যা মানব মনস্তত্ত্বের সত্যকে ভিত্তি করে দাঁড়ায়।

নিশিকান্তের আপত্তি অন্য প্রকারের। সে বলে, 'বৈধব্যে আত্মার তৃপ্তি আছে, বিকাশ আছে। দ্বিতীয় বিবাহ আত্মার শুচিতার শ্বাস রুদ্ধ করে, স্ত্রীর শুচিতাকে হত্যা দিতে হয়; দেহের বন্ধন-ক্ষোভ মনের সকল বিস্তারকে ছাপাইয়া যায়।'

কামাখ্যা হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে বলে, 'বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে ব্যক্তির কোন ভিন্ন শুচিতা নেই, আছে সমাজের, পরাশরের কাছে মানবের আপত্তি নিরর্থক। আর একটা কথা, নারী চায় শাসন, স্নেহ, ভালবাসা—একটি সমর্থ অবলম্বন।' উদাত্ত কণ্ঠে বলে এবং ঘরের ভিতর ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করে।

তর্ক চলিতে লাগিল। শ্যামদাস নির্ব্বাক থাকিয়া তাঁহার দুই শিষ্যের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন। শান্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'বুঝলে নিশি, অন্ধ-মমতা আর সংস্কার মানুষকে চিরবন্দী করে রেখেছে, যুগের ধারা পরিবর্ত্তন না হ'লে মুক্তি তার নেই জানি। কিন্তু মনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের একটা স্তরে নারী চায় স্বামী, সন্তান, সংসার এই চিরন্তন নীতির বিপক্ষে কোন শাস্ত্রোক্তি থাকৃতে পারে না।'

হঠাৎ শ্যামাদাস যেন স্বপ্নে কথা কহিতে লাগিলেন, 'আমি শুনতে পাচ্ছি বিধবার আর্ত্তনাদ, নিপীড়িতার আশ্রয়-ভিক্ষা, আর শুনতে পাচ্ছি দ্বিধাহীন, বলদৃপ্ত বিদ্রোহীর পদধ্বনি —যারা আসবে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে।'

পণ্ডিত নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, ধ্যানে সমাহিত ঋষির মত নির্ব্বাক।

কামাখ্যা জানে শ্যামদাসের আকস্মিক আবেগ-বন্যার ছিদ্র কোথায়! সে বিদায় লইল। নিশিকান্ত কিছু না বুঝিলেও তাহাকে বিদায় লইতে হয়।

নিস্পন্দ অন্ধকার রাত্রের বুকের উপর বসিয়া নিশি জাগিয়া থাকে। আর জাগে তাহার ব্যাকরণ এবং একটি দুর্ব্বল প্রদীপশিখা। উন্মুক্ত দুয়ার দিয়া নিদ্রাতুর অবসন্ন বাতাস ঘরে আসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে।

নিশিকান্তর মনে হয় পণ্ডিতের কোথায় যেন একটি রহস্য আছে। অপরিমেয় বেদনা, অনন্ত প্রশ্ন লইয়া সে শুধু তাঁহাকে পাহারা দিয়া চলিয়াছে। সেই বন্দী জীবনের আর্ত্ততা কণ্ঠে দুর্ব্বিনীত ভাষা চায়; তাহার চঞ্চল শব্দ ক্লান্তির লজ্জায় ক্ষীণ হইয়া আসে।

কিন্তু গায়ত্রী! দুর্ব্বোধ্য ব্যবহার, বিদ্রোহ, প্রশান্তি, সেবার আগ্রহ লইয়া কি অপূর্ব্ব ওই মেয়েটি! নিশিকান্তের উদ্বিগ্ন চিন্তায় গায়ত্রী সম্বন্ধে একটি বৃহৎ জিজ্ঞাসার চিহ্নই আসিয়া দেখা দেয়। শাস্ত্রের চেয়েও জটিল এই মেয়েটি!

থাক্ গায়ত্রীর চিন্তা। নিশি ব্যাকরণে মনোযোগ দিতে যায়। অসম্ভব!—আজ অধ্যয়নের বিরুদ্ধে সমস্ত মন যেন বিদ্রোহ করিয়াছে।—সন্ধিহীন বিদ্রোহ।

পরদিন আহার শেষে নিশিকান্ত চলিয়া আসিবে এমন সময়ে গায়ত্রী আসিয়া হাজির। বলিল, 'রাত্রে আলো জ্বেলে পড়বেন যখন, দোর যেন বন্ধ থাকে।'

'কেন?'—নিশি বলে।

চলিতে চলিতে গায়ত্রী প্রথমে বলে,'জানি না।' কিছুদূরে গিয়া বলিল, 'এই এখানকার নিয়ম।'

আপত্তির অবকাশ ছিল না, অনুযোগের ভাষাও কণ্ঠে আসিল না, যেমন তাহার অকস্মাৎ উদয় তেমনি তাহার স্থিতির অনবকাশ। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে সে কত বড় করিয়া জানাইয়া গেল।—নিশি ভাবে, এ যেন সমুদ্রের ঢেউ, অকস্মাৎ বিদায়ের ভিতর তাহার আবির্ভাবের চিহ্নগুলি রাখিয়া যায়।

গায়ত্রীর আদেশ অমান্য হয় নাই।

জীর্ণ দুয়ারের ভিতর দিয়া কয়েকটি শীর্ণ আলোর রেখা পিছ্‌লাইয়া পড়ে। বিস্তীর্ণ অন্ধকারে অনভিজ্ঞ অবাক শিশুর মত তারা পথহারা। রুদ্ধ দুয়ারের দিকে চাহিয়া গায়ত্রীর চোখে ঘুম আসে না; ভাসিয়া ওঠে একটি পাঠরত যুবকের প্রশান্ত কমনীয় মুখ, তার উপর প্রদীপের বিষণ্ন আলো নামিয়া আসিয়াছে। দুয়ার রুদ্ধ করার আদেশ অভিশাপের মত তাহার বুকে বাজে।

পর দিন। রাত্রির বয়স তখন অনেক। চতুষ্পাঠীর একটি ঘরে নিশি আজ পাঠে আত্মহারা। দুয়ার আজ বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেছে।

গায়ত্রী সন্তর্পণে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নিশির পড়ার বিরাম নাই। গায়ত্রীও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া নিশির দৃষ্টি বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, 'এত রাত্রে! পণ্ডিতমশাই কি ডেকে পাঠিয়েছেন?'

গায়ত্রী গম্ভীর ভাবে বলে, 'না। এত রাত্রি অবধি আলো জালবার নিয়ম এখানে নেই, তাই জানাতে এসেছি।'

নিশির নিকট হইতে ক্ষীণ প্রতিবাদ আসিল, 'কিন্তু আগে তো ছিল।'

'এ যে বর্ত্তমান,—'গায়ত্রীর জবাব।

সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নিশিকে অগত্যা বন্ধ করিতে হয়। আলোয় ফুঁ দিবে এমন সময় গায়ত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'কেউ চায়না যে তার অকাল মৃত্যু হয়, যতক্ষণ মেয়াদ আলোটার, ততক্ষণ বাঁচুক না ও। আর আমরা গল্প করি।'—বলিয়া নিশির সম্মুখে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ব্যাপারটা নিশি এতক্ষণে বুঝিতে পারে। বলে, 'গল্প—কিসের?'

উত্তর আসে, 'ভূতের। যে ভূত মানুষের মনকে খেয়ালী হবার খোরাক দেয়!'

গায়ত্রী বিষয় হইতে বিষয়ে ছুটিয়া বেড়ায়। অসংলগ্ন, অবান্তর।

নিশির হঠাৎ মনে হয় ব্যাকরণ আর শাস্ত্রের পুঁথি-বিদ্যার চেয়ে জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য আছে। শুধু তাহাই নয়, বিদ্যা হচ্ছে মানুষের বিক্ষোভ; জীবনের প্রার্থিত বস্তুর বিরুদ্ধে এক না-পাওয়ার ইঙ্গিত।

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'টোপর মাথায় দিয়াছিলেন কখনো?'

'অর্থাৎ?'—নিশি গম্ভীর হইয়া বলে।

'ন্যাকা! কিছু যেন জানেন না। বিয়ে করেছেন? বিয়ে করবেন?'—গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করে।

নিশি বিরক্ত হইয়া বলে—'আপনি এখন ঘুমুতে যান, আমার পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে।'

গায়ত্রীর দুই চোখ জ্বালা করিয়া ওঠে। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

আজও নিশি আহার-স্থানে অনুপস্থিত। গায়ত্রী ঘরে খোঁজ করিতে গিয়া দেখে নিশির উদাস গম্ভীর দৃষ্টি উর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন সুদূর অবধি যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। সে দৃষ্টির অর্থ আছে, ভাষা নাই। ভাবে, আজিকার আকাশ বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন, নির্জ্জীব। উদয়ের পুলক তাহার প্রাণে জাগে না, বা দ্বিপ্রহরের প্রখরতা ও সন্ধ্যারাগ!

গায়ত্রীকে দেখিয়া নিশি বলিয়া ওঠে, 'আমায় ক্ষমা করো গায়ত্রী!'

জীবনের মাধুর্য্য-সিন্ধু শুধু স্রোতহীন নয়, কার অভিশাপে যেন শুকাইয়া গেছে!—বিধাতার না মানবের!

•

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা শ্যামদাস গায়ত্রীকে নিশির ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। নিশি নাই। তাহার পুঁথি-পত্র ঘরময় বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। তিনি ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'মা বিশেষ প্রয়োজনীয় একটা কথা তোমায় এতদিন বলা হয় নি। পৃথিবীতে আমি অনেক দিন বেঁচেছি; ঈশ্বরের সবচেয়ে কঠোর অভিশাপ বোধ হয় অনাগতদের পরমায়ু চুরি করে এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা।'

একটু থামিয়া আরম্ভ করিলেন, 'কিন্তু কি বলছিলাম—হাঁ বুঝেচিস্ মা, শাস্ত্রে বলে নারীজীবনের পরিপূর্ণতা হচ্ছে স্বামীর সংসারে। কামাখ্যার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়ে তবে আমার বিশ্রাম।'

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'তোর একবার বিয়ে দিয়েছিলাম গায়ত্রী কিন্তু এখন তুই বিধবা।'

গায়ত্রীর নিকট হইতে শুধু একটি ক্ষীণ আর্ত্তস্বর বাহির হইয়া আসিল, সে যেন বিস্ময়ের চীৎকার। ক্ষণিকের জন্য তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভাব অস্বাভাবিক হইয়া গেল।—সে মুখে কাতরতা নাই, বিদ্রোহ নাই, জগতের সুখ-দুঃখের আলো-আঁধার সেখানে খেলে না।

শ্যামদাস বলিয়া উঠিলেন, 'যাই একবার কামাখ্যার কাছে, আয়োজনের সমস্তই তো এখনও বাকী।'

নিশির শূন্যঘরের মত গায়ত্রীও যেন নিঃস্ব হইয়া গেছে। শুক্লা রাত্রি! একাদশীর উপবাসের পর দ্বাদশীর চাঁদ ম্লান-মধুর হাসিয়া ওঠে। বিবর্ণ জ্যোৎস্না বালুচরের উপর পড়িয়া মনে হয় যেন শবের উপর একটি শুভ্র আচ্ছাদন। দুই ধারে অস্পষ্ট গাছগুলি অসহ্য শোকে স্তব্ধ হইয়া আছে। নব-পরিণীতা গায়ত্রী দেখে আর ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া বুঝি মৃত প্রণয়ের শব তাহার চোখের সম্মুখে অমনি ভাবে পড়িয়া থাকিবে। তাহার দাহ নাই, তাহার চিতা সাজাইবার বিরাট শ্মশান পৃথিবীতে মিলিবে না।

কামাখ্যা আসিয়া তাহাকে আদর করে। কিন্তু গায়ত্রীর নিজের কোন চাঞ্চল্য নাই, ইচ্ছাও নাই, চেতনাহীন জড়ের মত।

কামাখ্যা যেন একটি শবের সহিত দাম্পত্যজীবনের অভিনয় করে।

বাঙ্‌লার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ

আবদুল কাদের

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—উপক্রমণিকা—

ঘাটু-গানের মজ্‌লাশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর উপস্থিত সকলে বন্দনা-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে ;—

"কৃষ্ণ বন্ধু, কৃষ্ণ সখা ডাকি তোমারে।
কৃপা করে আইস আসরে॥
আমার এ আসরে এসে গান কর হে কণ্ঠে বসে
অধম জানিয়া ক'রো দয়া আমারে আমারে।
সখা আমারে॥"

অতঃপর গাওয়া হয় গুরু-ভজনা :—

"বিনয়ে বন্দন করি এসো কৃষ্ণধন।
দূর করো দুঃখের কাল-স্বপন॥
এসো ভাষার অধিপতি কণ্ঠে আমার কর স্থিতি
শিরে বন্দি শ্রীগুরুর শ্রীচরণ॥

সাধারণতঃ প্রত্যেক গানের সংলগ্ন 'সম'ই সাধারণতঃ সমস্বরে গাওয়া হয়। উপরোক্ত ভজনাটীর সম :—

"ভজ ভজ ওরে মন শ্রীগুরুর শ্রীচরণ।
এই ভব সংসারের মাঝে দিন গেল বৃথা কাজে
না ভজিলাম শ্রীগুরুর শ্রীচরণ।
কেন ভুলে রৈলৈ ওরে মন॥"

তারপর গীত হয়—'সালাম'। সেইখানে ঘাটুর দলের লোক আত্ম-পরিচয় প্রদান করে, গুরুর প্রশংসা প্রচার করে, এবং সভাকে প্রণতি জানায়। তথা-কথার সমাপ্তি এইখানেই। তারপর আসল গান। ঘাটুর ছেলে সুললিত সুরে যন্ত্র সহযোগে গান ধরে।—

—প্রথম অঙ্ক—

শ্রীরাধিকা জল-ভরণে চলিয়াছেন; ঘাটের পথে দূর হইতে গোষ্ঠের কৃষ্ণকে দেখিয়া কহিতেছেন :—

"সুন্দর সুরত রে গৌরা।
দুই নয়নে জ্বলিছে তারা॥
সঙ্গে লয়ে রাখাল গনে, নাচে কানাই গোষ্ঠে বনে,
বাহু তুল্যা নাচে, রসে হেল্যা পড়েরে গৌরা॥"

—সম—

"দধির বরণ গতর আমার নব কিশোরা।
কহ, শিশির কিবা বেশে দুই নয়নে ঝলে তারা॥"

কানুকে দেখিয়া রাইয়ের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; তিনি যেন অন্তর-তলে কিসের সঞ্চার অনুভব করিতেছেন, আর ক্রমে উতলা হইয়া উঠিতেছেন, গাহিতেছেন,—

"সুন্দর গৌরা রে নারীর মন-চোরা।
মনের রসে নাচে গন্থরা॥
জলের ছলে এসে দেখ্‌তে পাইলাম প্রাণ-বন্ধু সে,
আচানক ছটক্‌ লাগে; আমি নারী, চিত্ত বাথরা॥"

—সম—

"গউর রূপ আমি কি হেরিলাম গো হইলাম পাগলিনী।
কুক্ষণে জল ভর্‌তে আইলাম,—হারাইলাম পরাণ-ই॥"

জল লইয়া রাধা গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 'রান্ধন-ঘরে' বসিয়া তিনি সুদূরাগত কানুর বেণু-রব শুনিতে পাইতেছেন; তাঁহার অন্তর ঘরের কর্ম্ম হইতে দূরে উদাস হইয়া ছুটিয়া যাইতে চলিতেছে:—

(১)

"ওরে সখি রে, মোর নিজ নাম লইয়া
কেমন নাগর বাজায় বাঁশী নিগূঢ় বনে।
বংশীর শবদ শুনি
বাহির হৈল কাল-সাপিনী এ ভরা যৈবনে।
মানা করগো তারে
বাজায় না যে মোহন-বংশী জয় রাধা ভনে॥"

—ছওম—

বংশীর শবদ শুনি সমঝ্‌ নাই মনে।
ওরে, বংশী বাজে কোন্‌ বনে॥
বসে থাকি রান্ধন-ঘরে অস্থির ঘাম ঝরিয়া পড়ে
প্রাণ মন বংশী হরিয়া গো নিল; বংচিব কেমনে॥"

(২)

"—বংশী গরজে রে কোন্‌ বনে।
চিত্ত সমঝ না মানে॥
কোন্‌ বনে বাজে বাঁশী সই গো, জিওরা উদাসী,
বাঁশীর ব্যথা যেই শুনে সে জানে॥"

—সম—

"এ হেন বংশী বাজিল কোন্‌ বনে
গো বিন্দে, জিউরা না মানে।
বংশীর রবে ঘরের বাহির হৈতাম লাগে মনে
গো বিন্দে, জিউরা না মানে॥"·····

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

গোপাল-কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতে প্রস্তুত হইয়া বলিতেছেন:-

"দধি মথন করো সকালে, ক্ষীর ননী দে গো মা খাইতে।
ক্ষীর সমা ছানা ননী
খাইতে দে গো নন্দরাণী
পিতা নন্দ রইলো ধেনু-বাতানে তে॥"

কৃষ্ণ-সখারা তখন কহিতেছেন:—

"কানুকে সাজাইয়া দেও মা যতনে।
গোষ্ঠে যাইবার বেলা হৈছে গগনে॥
ধেনু রৈল দূরের বনে
চাইয়া চাইয়া পন্থ-পানে
মোদের যাইতে হৈল গহনে,—
গোষ্ঠে যাইবার বেলা হৈছে গগনে॥"

—ছওম—

"শুন রে নন্দের কানু—
বাজাইয়া মোহন বেণু
ফিরাইয়া নেই চলো ধেনু।
তমাল তালের বনে চলো যাই ভাই গো-চারণে
ফিরাইয়া নেই চল ধেনু॥" *

—তৃতীয় অঙ্ক—

দিবসে কখন একটু তন্দ্রার আবেশে রাই কাণুকে গোচারণ করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, এখন তাঁহার কথা ভাবিয়া বিচঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ-সখা বলাইকে কাছে পাইয়া কহিতেছেন:—

"দৈবাৎ দিবা-যোগে দেখ্‌লাম স্বপ্নাবেশে
ব্রজ-রাখালের সনে মোর গোপালের ঠাঁই।

---

* সংগ্রহের সময় আমি গানগুলি যে ভাবে পরে পরে গীত পাইয়াছি, সে ভাবেই বিন্যস্ত করিলাম। মনে হয়,—এখানকার দ্বিতীয় অঙ্কটী প্রথম অঙ্ক এবং ১ম অঙ্কটী ২য় হইলে পালার ক্রমঃবিকাশটি বুঝিতে শ্রোতাগণের পক্ষে সহজ হইত।

—একা বনে না যাইও বলাই।—
আজি হৈতে ডুব্যাছে আমাতে প্রাণের কানাই॥"

—সম—

"কানাইর সোনার রূপ লাগিয়াছে যার নয়ানে।
চিত্ত না মানে, চিত্ত না মানে, তার চিত্ত না মানে॥"

কানুর বিরহের বেদনায় রাইয়ের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। নানা ভাবে, নানান্ কথায় বিনাইয়া বিনাইয়া নানা জনকে তিনি তাঁহার বেদনার পশরা বিলাইতেছেন :—

(১)

"মুই বিরহিণী নারী"
প্রিয়-বিনে দহে চিত্ত—প্রেমে বাখরী॥
প্রিয় প্রিয় করে আমি গুঁয়াইলাম সারা আন্ধারি
সাজাইয়া ফুলেরি সজ্জা গো—ঘরে নাই গো বন্ধু আমারি।
পূবা বাতাসে ওঠে বাজিয়া গো—মোর চিত্ত যায় বাহিরি॥"

—ছওম—

ওরে সখিরে, কই ওরে—কঠিন শেল, বিরহ-কা বাত্তিয়া।
মুই বিরহিণী রে, জনম ছাপিয়া॥
প্রিয়-বণে মুই মরি আগুনে ঝাপিয়া।
ওরে সখিরে, কইওরে তারে এ বাত্তিয়া॥"

(২)

"—দহিচে রে ওরে রামা, বিরহ-অনল চিত্ত দহিচে।
একে আমি বিরহিণী, প্রেম জালায় জ্ব'লে মরি
বলগো সখি, আমি কার ঠাঁই দুঃখ,—
প্রিয় পর-গাঁয়ে, রে রামা॥"

—ছওম—

"বিরহে ছাড়িয়া গেল— বন্ধুয়া ছাড়িয়া গেল গো
প্রাণ আমার থির হয় না॥
(আমি) মরি বন্ধু বন্ধু ক'রে বন্ধে দেখা না দেয় মোরে
কালার পিরীতির জ্বালা চিত্তে সয়না॥"

এই বিরহের কান্না কাঁদিয়াই রাধার আঁধার রাত্রি কাটিয়া যাইতেছে; "নিন্দুয়া" আসিতেছে না। বিরহিণী রাধাকে ছাড়িয়া কোথায় কৃষ্ণ, আজি কাহার সনে রাত্রি যাপন করিতেছেন—ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখে ও অভিমানে রাধা ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদিতেছেন :—

"রাত্তির গুজারা, ওরে সখি—নিন্দুয়া নাহি আওয়ে।
কেমন কামিনীর সনে সখা নিশি গুয়ায় যে॥
আমি নারী বিরহিণী কেমনে কাটাইবাম রজনী
ওরে সখিরে, আক্ষে নিন্দুয়া নাহি আওয়ে॥"

—ছওম—

"পিরীতি বিষম জ্বালা, প্রাণ সই।
মরি মরি মনের দুঃখ কারে কই॥
একেলা রাত গুজারার বেদনা ব্যথী বিনে কেউ জানেনা
বন্ধের লাগি আঁখি মেল্যা
রাত্তির ভর্য্যা চাইয়া রই॥"

কাঁদিতে কাঁদিতে কখন রাধার চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে; স্বপ্নে তিনি কৃষ্ণকে কাম-কেলিতে লাভ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আনন্দ অধিকক্ষণ তাঁহার ভাগ্যে নাই; তিনি জাগিয়া পড়িয়াছেন, আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতেছেন :—

"নিদ্রায়ে চৈতন্ত হৈনু পিয়ারী :—
কাল-নিদ্রা হৈল গো রাধের বৈরী॥
নতুন মন্দির-ঘরে
ফুলেরি পালঙ্ক-পরে
স্বপ্ন-যোগে মধু খাইয়া ভোমোর গেল ছাড়ি॥"

—খেয়াল—

"আমি স্বপন দেখ্যা জাগিয়া না পাইলাম তারে॥
রূপার পালঙ্কে শুইয়াছিলাম হায়
আমার শিয়রে বসিয়া প্রিয় যায়।
আমার এ সোনার যৈবন সপিলাম যারে—
সই গো, না পাইলাম তারে॥"

যাহা হউক, রাধা যে স্বপ্নে কৃষ্ণকে 'কেউয়ারী' (বন্দী) করিতে পারিয়াছিলেন, সেই অনুভবের আনন্দাতিশয্যেই তাঁহার দেহ মন কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে :—

"আজু নিশি হৈল অপরূপ পিয়ারী।
স্বপনে মোর পিয়া কেওয়ারী॥
শ্যাম সুন্দর বেশে বসিয়া সে মোর পাশে
গলে ধরে ব'লে গেলো—জাগো লো পিয়ারী॥"

—ছওম—

"ও সই, স্বপনে দেখ্যাছি পুরুষের সে নীল রতন।
একেলাতে চলছি আমি
সে হয় যদি নাগর স্বামী
প্রেম-ডুরি দিয়া তারে বাইন্ধা রাখো মন॥"—

ভোর হইয়া আসিতেছে। কোকিলের কুহু-রব শুনা যাইতেছে। কুহু কুহু ধ্বনি রাধার প্রাণের বিরহ-জ্বালাকে দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া দিতেছে, তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন:—

(১)

"কোয়িলের মধুর স্বরে চিত্ত বেয়াকুল।
ওরে বসন্তের কোয়িল, তুই নিলি জাতি কূল॥
গৃহ-বাস না লয় মনে—
মন যেতে চায় বনে বনে,
নিলি জাতি কূল রে কোয়িল, নিলি জাতি কূল॥"

—সম—

"পতি বিনে যৈবন দিলাম কারে।
রে কোয়িল, বলি রে তোমারে॥"

(২)

"—কোইল রে, তোর কু-উ বোলে সদাই চিত্ত জ্বলে।
ওরে কোইল, ডাইকো না তমালে॥
তোর ও ডাকের জ্বালা লাইগ্যা—জাইগ্যা জাইগ্যা
কূলে কূলে বিরহিণীর প্রেম-সাগর উথলে॥"
ওরে কোইল, ডেকোনা তমালে॥"

—সম—

"একে ত কোইল কাল
আর ত বসন্ত-জ্বালা
আমি নারী,—হৃদে রইল শেল রে
ওরে কোইল, ডেকোনা তমালে॥"

নিশীথের দেশ পার হইয়া প্রভাত আসিয়াছে। শ্রীরাধিকার মনে যেন কোথা হইতে কিসের একটা আনন্দের ঢেউ ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি অনেকটা স্বস্থ চিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রভাতের বন্দনা-ভৈরবী তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে:—

"ভোর বয়ে নিশি, রে সখি, আইল—
রয়ে জিতা হিয়া আমারি।
প্রিয়োরা বেগারি বাসকে মোহিনী সাজকে
আজি সাজাও আমারি।
সখির মণ্ডলে মুয়ে নিয়ে যাই ডারি॥"

—ছওম—

"নিশি গুজারা গিয়া ভোর বইল রে।
আপনা মহলে সখি চল্যা যাওরে॥
কোয়িলার কূউ-রাগে
পাড়া পড়শীয়া জাগে,
কাল-ননদী ঘরে জাগিল, জাগিল সখি, জাগিল রে॥"

প্রভাতের এই অজানা আনন্দের আতিশয্যে বাস্তবিকই রাধার মন যেন কেমন শান্ত ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। বিরহের বেদনা গানের পরিবর্ত্তে তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিতেছে, একটা বাঞ্ছিত-প্রাপ্তির আনন্দ-সুর।—তিনি সখিদের ফুল-তোলায় যাইবার কথা কহিতেছেন:—

"চলো সখি ফুল-তোলা যাই বদনে বদনে।
আমরা দু'জনে॥
ফুল তুলিয়া আইবাম ঘরে বিনি সুতে গেঁথবো গো তারে
গেঁথিয়া ফুলেরি মালা দিব শ্যাম-বন্ধুয়ার গলে।
গোপনে বিজনে আমরা দু'জনে॥"

ফুল তুলিয়া গৃহে আসিয়া মালা গাঁথিয়া পুনরায় রাধা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন—কৃষ্ণ-বিহনে সে মালা কাহার গলে দিবেন ভাবিয়া:—

"গেঁথিয়া ফুলেরি মালা আমার একি জ্বালা হৈল।
গেঁথিয়া ফুলেরি মালা
দিবাম শ্যামব-ন্ধুয়ার গলা,
বন্ধুয়া নাই কাছে, তারে ভাবিয়া মোর একি জ্বালা হৈল॥"

প্রভাতকাল কাটিয়া গিয়াছে। বেলা হইয়াছে। শ্রীরাধিকা এক্ষণে সখি-বৃন্দকে লইয়া জলের ঘাটে যাইবেন,—ঘরের সখিকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার কৃষ্ণ আসে কি না দৃষ্টি রাখিতে:—

"অনসিক্ত হয়ে যমুনামে গিয়ে
কলসী বুড়াইতে চলিলাম ধীরি।

এ্যায়সে সময়ে হ্যাদে গো সজনী
সখিরা চলো লো লিয়ে গাগরী।
ত্বরা যমুনামে চলো লো পিয়ারী॥"

—সম—

"তোমরা দেখো চাইয়া আসে না আসে মোর বিনোদীয়া রে
কাঁখে কলসী লিয়া মুই গেলা যমুনা ধাইয়া রে॥"

—চতুর্থ অঙ্ক—

রাধা সখিদের লইয়া যমুনায় যাইতেছেন। কি করিয়া কৃষ্ণও যেন সেই পথে তাঁহাদের পিছু পিছু চলিয়াছেন। সখিরা গাহিতেছেন :—

"সোনার নুপূর পায় গো—সাজিল সুন্দর রাধে।
সই, জল ভরিতে যায় গো রাধে
কৃষ্ণ যায় গো পাছে ;
এক সখি আইল্যা পড়ে আর এক সখির গায় গো—
সোনার নুপূর পায় গো॥"

—সম—

"ছোট ছোট নাগরী কোমরেতে গাগরী
তারা যায় যমুনার জলে।
কেমন নাগর তাদেরে পাঠায়েছে জলে॥"

শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের চোখে যেন সুন্দর ঠেকিল, তিনি যেন রক্তে কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন। সুবলকে শুধাইয়া কহিলেন :—

"সিনান করিতে সে যে চল্যা যাইতে ঢল্যা পড়ে,
রুণু ঝুণু নুপুর বাজে পায়।
সুবল ভাই রে, এ কার রমণী জলে যায় রে॥"

—সম—

"একে ত সুন্দর রাধে
সর্ব্ব লোকে চিত্তে বাধে,
চিত্তের রঙ্গে দেহা তার রসায় রে॥"

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীরাধাকে সহসা শুধাইয়া কহিতেছেন :—

"মাথা খাও, ফিরে চাও, কথা কও, লো চাঁদ বদনী।
আড়-নয়নে চাও
আঁখিটী মিলাও
নাথেরে ভুলাও—
নাথেরে পাইয়া বুকে নাও
হৈয়া উন্মাদিনী॥"

—সম—

"লো কিশোরী, চলো উদাসনে যাই।
আমার নয়ন পাগল কেন করলে বৃথাই
লো কিশোরী॥"

অস্থির-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-সম্বোধনে রাধা কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অবমানিত মনে করিতেছেন। রাধা স্নানের ছলে জলে নামিয়াছেন, কৃষ্ণ উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন :—

"সিনান করো চন্দ্রবালী
আওলাইয়া মাথার বেণী—
দেখে চিত্ত না মানে।
কুক্ষণে জল-ভরণ দেখ্‌তে আইলাম,
আপনা মান-কে আপনি দিলাম,
মান কূল সব গেলো যমুনায় ডালি
রে বালী, চিত্ত না মানে॥"

* * * *

এই খানেই এই পালার সমাপ্তি। অতঃপর পঞ্চম অঙ্ক, অর্থাৎ তখন আসরে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছেদের খেয়াল-গান গাওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঘাটু-গানের প্রত্যেক পালা একই ভাবে আবশ্যকতঃ আরম্ভ ও সমাপ্ত হয় না। আমি এইখানে একটি মাত্র পালার প্রারম্ভ, ক্রমঃবিকাশ ও পরিনতি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

(৪)

বস্তুতঃ বৈষ্ণবের লীলা-রস বাঙ্‌লার সমস্ত প্রকার পল্লী-সঙ্গীতের অনু পরমাণুতে সংমিশ্রিত হইয়া আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত কাজরী-গানের মতন বাঙ্‌লার ফকিরী গান, মুর্শীদি-গান, ঘাটু-গান, কোনো কিছুরই সুন্দর স্বাভাবিক সৃষ্টি ও বিকাশ এই লীলা-মাধুর্য্য ভিন্ন সম্ভব হয় নাই॥ *

* "ঢাকা"—মুসলিম সাহিত্য-সমাজে পঠিত।

একখানি হাসি

জসীম উদ্‌দীন

দিন ভর তার বহু কাজ ছিল, এখানে ওখানে ফিরি,
যত্নে ও স্নেহে কাজের মধ্যে ফুটাইতেছিল ছিরি।
মোরে ডাকি কথা বলিবে কখন? ব্রজের পথের পরে
সারদিন মান আঁট ঘাঁট বেঁধে জটিলা কুটিলা ঘোরে।
এ দেশের সব উল্টো ব্যাভার, হাটে হাটে দাও ঢোল,
কেউ শুনিবে না, কেউ আসিবে না বাধাইতে তাহে গোল।
কাণে কাণে কথা বলিবে যখনি অমনি সকলে আসি
না শুনেও তার টীকা টিপ্পনী বানাইবে রাশি রাশি।
জোরে যাহা বল, কারো ভ্রূক্ষেপ হইবে না শুনিবারে
চুপি চুপি তাহা, ব'লে দেখ দেখি, ক'জন না শুনে পারে?
জগৎ জুড়িয়া করে কোলাহল মল্লিনাথের মিতা,
গোপন কথার ভাষ্য লিখিছে লইয়া নীতির ফিতা।
তবু এরি মাঝে এক কোণে সে যে দাঁড়াল আমারে দেখি
গোলাপের মত দুটি রাঙা ঠোঁটে একখানা হাসি লেখি'।
একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেয়ে
পূর্ণ চাঁদের জোছনার জল পড়্‌ছিল বেয়ে বেয়ে।
যেন প্রভাতের সোণালী আলোক বাঁধিয়া পাখার গায়
এক ঝাঁক পাখী উড়ে চলেছিল আকাশের কিনারায়।
যেন গাঁর বধূ প্রদীপ ভাসায়ে গাঁয়ের ঘাটের জলে,
কাঁকণ বাজায়ে কলস হেলায়ে গাঁর পথে গেল চ'লে।

আজিকে তাহার বহু কাজছিল, মোরও ছিল ব্যস্ততা,
সবগুলি তার জড়াইয়া দিল একটি হাসির লতা;—
সেই লতা'পরে ফুল ফুটেছিল, তাতে ব'সে মধুকর,
কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল বেদনার তাজ ঘর।
একখানি হাসি দেখেছিনু তার, যেন বহুদিন পরে
দূর দেশ হ'তে অতি চেনা কেউ চিঠি লিখিয়াছে মোরে
একখানি হাসি! আকাশ হইতে একটি পাখীর গান

দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে জুড়াল চাষীর কাণ।
একখানি হাসি! গংকিণীজলে যেন বেহুলার ভেলা
লখীন্দরের শবদেহ ল'য়ে কোথায় করেছে মেলা।
যেন আকাশের বুকে ভেসে যায় একটী রঙীন ঘুড়ি
তারি' পরে যেন বক্ষ রাখিয়া কোথা যাওয়া যায় উড়ি'।
একখানা হাসি! নহে বহুকথা, নহে প্রিয়, প্রিয়তম,
প্রাণবল্লভ যদিও লেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।
ও-যেন কথার গীতগোবিন্দ! হাফেজের বুল বুলি
ওরি মাঝে বসি পাখায় মাথায় তারা গুঁড়ো-করা ধূলি।
একখানি হাসি! বাঁকা তরী বেয়ে এসেছে ঈদের চান্
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফর্‌মান।

———

সংস্কার

শ্রীসুনীল কুমার ধর

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই...

কিন্তু এত বড় একটা প্রবাদকে এড়াইয়া তাহারা তিন ভাই এক সঙ্গে বাস করিতেছে।

বড় হরিচরণ, মেজ রাইচরণ ও ছোট শ্যামাচরণ।

হরিচরণ রাজমিস্ত্রী, মেজ তবলচী———

আর ছোট ভাইটি মামার বাড়ীর ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িত, কিন্তু বার বার তিনবার মাষ্টারদের এক চোখোমিতে ক্লাস না পাইয়া আজ সাড়ে তিন বছর বাড়ী বসিয়া আছে।

সারা বাংলায় তখন অসহযোগের মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছে। তাহার একটু আবহাওয়া এই স্কুল বাড়ীতেও আসিয়া লাগিল। বড় ছেলেরা যুক্তি করিয়া ছোটদের ভয় দেখাইয়া একদিন সকলে জোট বাধিয়া—"মহাত্মা-জী কী জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আর তাহারা গোলাম হইতে শিখিবে না।

কিন্তু তাহার পরদিনই কেহ কেহ বাপ-মা খুড়ো-পিশের তাড়নায় আবার সেই গোলাম-তৈরী কারখানায় গেল, কেহ কেহ ভয়ে এবং লজ্জায় দু-এক দিন এ-দিক ও-দিক পালাইয়া বেড়াইয়া তিন দিনের দিন নেহাৎ শান্তশিষ্ট ছেলের মত গিয়া হাজির হইল। আবার কেহ কেহ যাতায়াত একেবারেই শেষ করিয়া দিল, আমাদের শ্যামাচরণ এই শেষের দলের পাণ্ডা।

তাহার মগজে তখন ঘুরিয়া ফিরিতেছে, বিদেশী বর্জ্জন, পল্লীসংস্কার, নন-কো-অপারেশন, নন-ভায়ওলেন্স—আর চোখের উপর ভবিষ্যতের যবনিকায় ভাসিয়া উঠিতেছে স্বরাজের স্বর্ণ সিংহাসন......

তাই ছয় মাস পরে মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া যেই দেখিল যে তাহার দুই বৌঠানের পরণে বিলাতী লাল পাছা পেড়ে শাড়ী আর হাতে এক হাত করিয়া রেশমি চুড়ি—অম্‌নি তাহার মাথা বিগড়াইয়া গেল।

রাগিয়াই আগুন, বলিল—'কি সর্ব্বনাশ, তোমরা এখনও এগুলি ফেলে দাওনি!' নিজেদের অঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিবার মতো কোন অনাবশ্যকীয় জিনিষ দেখিতে না পাইয়া উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি?'

'—এখনও কি...ঐ যে পরণের পাছা পেড়ে শাড়ী আর হাতের রঙ-বেরঙের চুড়ি!'

উচ্চারণটা একটু সুর করিয়াই হইয়া গেল।

বৌঠানরা তো হাসিয়াই খুণ!

বড় বৌঠান কহিল—'এ্যাতো ন্যাকা পড়া শিখে শেষে এই বিদ্যে···কাপড় ছেড়ে কি কালীদাসের চোপড় পড়ব—'

মেজ বৌঠান ইহার উপরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া বড় বৌঠানই কহিল—'আর এয়োস্ত্রী মানুষ চুড়ি ফেলবো কি······তবে তুমি যদি সোনারূপোর দিতে পারো—তাহলে না হয়...'

এই সোজা কথা কয়টির মধ্যে যে এতখানি বিপদ প্যাচানো আছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে শ্যামাচরণের একবারও মনে হয় নাই।

বাড়ী পৌঁছাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহার হাতে রেশমি চুড়ি দেখিবে তাহার হাতের জল পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করিবে না। দূর হইতেই মনে করিয়াছিল যে এই বিদেশী বর্জ্জনের কথা এতদিন নিশ্চয় তাহার দাদাদের কানেও গিয়াছে—কিন্তু......

বৌঠানদের এই কথা খণ্ডন করিবার মত তাহার না আছে বিদ্যা-বুদ্ধি না আছে অর্থ-সামর্থ; অথচ উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কিছু বলবারও প্রয়োজন, তাই সে কোনরকমে আমতা আমতা করিয়া কহিল—'আহা···আমি কি তাই মানে কোরে বলছি যে, ···তবে কিনা স্বদেশী...'

ইহার উত্তরে তাহার বৌঠানেরা যাহা বলিল তাহাতে সে তাহাদের সামনে কান না মলিলেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এমন কষ্ট আর সে জীবনে কোনদিন করিবেনা।

এর পূর্ব্বে বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া একখানা খদ্দরের কাপড় ও একটা খদ্দরের পিরাণ কিনিয়া ছিল, তাহা এখন ভাল করিয়া জড়াইয়া একেবারে বাক্সের নীচে সেঁধাইয়া রাখিল।

এই খানেই হইল তাহার স্বদেশী প্রভাবের শেষ।

ইহার পর মাস কয়েক সে বেশ শান্ত শিষ্ট ভাবে ঘরের অন্নধ্বংস করিয়া বাইরে ঝাপ্টা মারিয়া কাটাইয়া দিল। কিন্তু দ্বিতীয় বছরের পয়লা বৈশাখেই সে পল্লী সংস্কার আরম্ভ করিল।

বলিল—'না, আজ কালকার দিনে চুপ কোরে বসে থাকা কোন কাজের কথাই নয়।'

প্রথমে রাস্তা।

যে রাস্তার যেখানে বর্ষার স্রোতে ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই খানেই পাড়ার ছেলেদের ভুলাইয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের চোখের সামনে রূপকথার মত ভবিষ্যতের অনেক রঙীন ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া, সংস্কার করিতে আরম্ভ করিল।

মাস ছয়েক লাগিল এই রাস্তা সংস্কার করিতে।

তাহার পর পানীয়-উদ্ধার।

একদিন রাত্রিতে লুকাইয়া-ঘোষেদের পুকুরে নামিয়া কতকগুলি টোকা শেওলাও তুলিল।—

কিন্তু তাহার পরদিন জল লইতে আসিয়া ছোট বড়ো সকলেই একবার করিয়া চোরের উদ্দেশ্যে গালি-তো পাড়িলই, উপরন্তু তাহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নির্ব্বংশ এবং অভোজ্য ভক্ষণ করাইতেও কসুর করিল না।

'—নিব্বংশের ব্যাটারা মাছত'নিয়েছেই সঙ্গে সঙ্গে জলটা যেন একেবারে দই-ঘোলা কোরে রেখে গেছে···তোদের···'

সংস্কারবন্দের একজন সেই সময় ঘাটে উপস্থিত ছিল। চোর অপবাদে রাগিয়া উঠিয়া কহিল—'হ্যাঁ, মাছ নিতে বয়ে গেছে—তোমাদের ভালর জন্তই করা হয়েছে—ম্যালেরিয়া—কলেরিয়া...'

খ্যান্তপিসির মুখ হইতে ক্রমে গাঁয়ের সকলেই জানিল যে—এর মূলেও আছে ঐ শ্যামাচরণ!

মাতব্বররা তো রাগিয়া আগুন!

ঘোষ বাবুদের সান্ধ্য বৈঠকে নিধি ভট্‌চায্যি কহিলেন—'দেখলে ব্যাপারখানা—ছোট লোক ব্যাটার পেটে দুটো হিজির বিজির গেছে কি না গেছে অম্নি মাথাটা বিগড়ে গেছে! ব্যাটার না আছে চাল—না আছে চুলো—আজ ভাইরা বাড়ী থেকে বার করে দিলে, কাল লোকের দোরে দোরে ধন্না দিতে

হবে—উনি যাচ্ছেন পল্লী-সংস্কার করতে—পল্লী-সংস্কার না ওর গুষ্টির শ্রাদ্ধ...

যগু ওরফে যোগেশ ঘোষ, জমিদারদের মেজ ভাই বিরক্তির সুরে কহিলেন,—'আরে যা করার আমি কোরব—আমি গাঁয় থাকৃতে তো-ব্যাটার এত মাথা ব্যথা কেন...ব্যাটা যে আমার প্রজা নয়, নইলে...'

সেইদিন হইতে রাত্রিতে গাঁয়ের প্রতি পুকুরেই চৌকি দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। এবং তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দেওয়া হইল যে হাতে-নাতে ধরিতে পারিলেই যেন বেশ দু'চার ঘা উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেওয়া হয়। পানীয় উদ্ধার বন্ধ হইল, এইখানেই।

কিন্তু শ্যামাচরণ দমিবার ছেলে নয়।

সে পুরো উদ্যমে বন-জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। কাজের সে কি উৎসাহ!

কেহ বাধা দিতে আসিলেই সে বেশ জোর করিয়া বলিত—'নিজেদের আর এই গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আট্‌কে না রেখে বাহিরে ছেড়ে দেও, দেখ্‌বে চারিদিকে কিসের সাড়া পড়ে গেছে...'

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সে জিলায় গিয়া এক স্বদেশী নেতার মুখে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছে।

বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই বন-জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে-ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে একদিন রাত্রিতে খাইতে বসিয়া হরিচরণ বলিল—'পরের তো খুব ব্যাগার খাট্‌ছিস্ শ্যামা—এদিকে গরুতে এসে যে নিজেদের পুঁইগাছ সাবাড় কোরে দিয়ে গেল—লঙ্কা গাছগুলো মুড়িয়ে খেলে, তার খোঁজ রাখিস্ নে...কাল অবিশ্যি অবিশ্যি পুঁইগাছের একটা মাচা আর লঙ্কা গাছগুলো একটু ঘিরে দিবি।'

শ্যামাচরণ তখন মুখে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার পরদিন হইতে কেহ আর শ্যামাচরণকে দা-কুড়ুল হাতে করিতে দেখে নাই।

বলে—কোথায় নাকি একটা ব্যথা উঠিয়াছে।

এই খানেই শেষ হইল তাহার পল্লী-সংস্কার।

তাহার পর তৃতীয় বারে সে প্রেমে পড়িল।

এক বাইজীর সঙ্গে!

বড়, মেজ দুভাইয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, হয় নাই কেবল তাহার। বৌঠানেরা বয়সের কথা স্মরণ করাইয়া বিবাহের কথা পাড়িলেই, সে বুক ফুলাইয়া বলে—'কি দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে, বিয়ে কোরলেই ছেলে পুলে—তারপর রোগ ব্যামো, সাবু বার্লি...ও সব আমার ধাতে সহ্য হবে না। তা ছাড়া খেঁদি পাঁচিকে আমি কিছুতেই বিয়ে করচিনে...'

বেশ জোর দিয়াই সে কথা বলিত।

তাহার বৌঠানরা ভাবিল সত্যিই-বা। লেখা-পড়া জানা ছেলে কেনই বা ও সব করবে...

তাহাদের ঠাকুরপো যে চিরকালই আইবুড়ো কার্ত্তিক থাকিবে একথা ক্রমে ক্রমে সারা গাঁ-ময় প্রচার হইয়া গেল।

বিবাহ না করাটাই পাড়াগাঁয় একটা মস্ত বড় আশ্চর্য্যের জিনিষ, তাই সে চিরকালই এমনি করিয়া কাটাইবে কিনা এই আশ্বাস বাক্য পাইবার আশায় অনেকেই প্রশ্ন করিল—কিন্তু সদুত্তর কেহই পায় নাই।

কাহাকেও বলিয়াছে—'আগে আলাদা একখানা ঘর বাঁধি, দুখানা মাত্র ঘর, একখানা বড় বৌঠানের একখানা মেজ বৌঠানের...'

আবার কাহাকেও নাকি বলিয়াছে—'আমার যাকে বিয়ে করার ইচ্ছে সে আমাকে মোটে আমোলই দেবে না—হয় তো বা—'

কথাটা একটু ঘোরালো হইয়া দাদাদের কানে উঠে।

সেই কবে গাঁয় বারোয়ারীর সময় এক বাইজী আসিয়া-ছিল, তাহার উপরই নাকি তাহার ঝোঁক।

কিন্তু শ্যামাচরণের বাহিক ব্যবহারে তাহার জন্য কোন-দিনই কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নাই, উপরন্তু কাহারও মুখে ও সব শুনিলে সে হাসিয়া বলে—'তোদের তো সাহস কম নয়—বলে কার সঙ্গে কি...কিন্তু সাকরের সঙ্গীরা ছাড়ে না, বলে না হয় দু-পাতা ইংরাজী-ই পড়েছিস্—তা বলে কি আমাদের এমন ঘেন্নার চোখে দেখা ভাল দেখায়—'

হাজার হোক ন্যাঙ্‌টা বেলার সাথী তবুও এই দুঃসাহসের কথা সে কাহাকেও বলিতে সাহস পায় না, লজ্জাও করে, কিন্তু তাহাদের হাত এড়ানো তো সহজ নয়!

সে তাহাদের হাত এড়াইতে চাহিলেও তাহারা তাহাকে ছাড়ে না, বলে—'ছেলে বেলার কথা যে, মানুষে দু-পাতা ইংরাজী হরফের চাপে এমনি ভাবে ভুলে যায়—'

তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে তাহাদের মনের মতো দুইটা কথা বলিতে হয়।

বলে—'তাকে ভালবাসিনে, অতো সাহসও আমার নেই—তবে কিনা—'

সঙ্গীরা এইটুকু শুনিয়াই পরম আনন্দে হাততালি দিয়া উঠে, বলে—'তা তোর ভালবাসা শোভা পায়, নামেও শ্যাম, দেখ্‌তেও ঠিক……'

* * *

মেজ বৌঠান হাসিয়া বলিল—'আমি বাঁচ্‌লাম যে, আমার আর কারো দরকারী অদরকারী ফাই-ফরমাস খেটে মরতে হবে না—কেউ আর আঁচল ধরেও টান্‌বেনা—'

বলিবার সময় তাহার সারা মুখ দুষ্টু হাসির আলোয় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

বাধা দিয়া শ্যামচরণ কহিল—'যা ভেবেছ তানয়—তিনি শ্যামচরণের ঘর করতে আসছেন না—ঘর তোমাকেই করতে হবে—ফাই-ফরমাস্ এমন কি পা-মাথা টিপে দেওয়া…সেরা শুশ্রূষা…'

'ইস্—বয়ে গেছে।' এই বলিয়া কাণ্ড জ্ঞানহীন শ্যামাচরণের সুমুখ হইতে পালাইয়া মালতী কোনরকমে নিজের মর্য্যাদা বাঁচাইল। কিন্তু শ্যামাচরণ তাহার পলাতকা গতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—'মনে নেই মেজদা বলেছিলো যে, আমার যখন যা দরকার সব তোমাকেই করতে হবে—কেননা আমার মা-বোন নেই, এমন কি…'মাথার উপর অল্প একটু ঘোমটা তুলিয়া দিয়া মালতী তখনই ফিরিয়া আসিল। বলিল—'আচ্ছা—গো আচ্ছা আর অতো আব্দারের কাজ নেই! এখন ভাল ছেলেটীর মতো হাটে যাও-তো—বেলা যে আর নেই—'

* * *

মাছ তরি-তরকারি কিনিয়াও সওয়া-ন'আনা পয়সা রহিল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্যামচরণ মনে করিতে পারিল না তাহাকে আর কি কি আনিতে বলিয়াছে। অবশেষে পানওয়ালার নিকট হইতে এক বাণ্ডিল 'মোহিনী' বিড়ি কিনিয়া তাহা হইতে একটি বাহির করিয়া দড়ির আগুণে ধরাইয়া টানিতে টানিতে পুঁটিরামের ছোট 'মনোহারী' দোকানের সামনে গিয়া হাজির হইল।

পুঁটিরাম ফিট্-ফাট্ শ্যামচরণকে বেশ একটু খাতির করে। হাজার হোক এ দিগরে তাহাদের হাতের মধ্যে এই শ্যামাচরণই যা একটু-আধটু ইংরাজী শিখিয়াছে, আর তা ছাড়া বাছা বাছা জিনিষ কিনিতেও এই শ্যামচরণের মত…

হাজার হোক কথায় বলে—লেখাপড়া শিখ্‌লে নজরটা একটু উঁচু হয়। জিজ্ঞাসা করিল—'কি চাই—আয়না, চিরুনী—সাবান…এই দেখুন নূতন ফ্যাসানের রুমাল—এই কামাখ্যানাথের নেবু তেল, খুব সুন্দর গন্ধ…হাটের ভিতর সেরা জিনিষ যদি থাকে তো এই পুঁটিরামের দোকানে…'

ছোট বেলায় এই পুঁটিরামই তাহাকে শ্যাম বলিয়া ডাকিয়াছে। আর আজ সে দু'টা ইংরাজী কথা শিখিয়াছে বলিয়া একেবারে আপনি মশায় হইয়া গেছে। তাহার মনে মনে ভয়ানক দুঃখ হইতে লাগিল—যদি কোন রকমে একটা পাশও করিতে পারিতাম!

পুঁটীরাম অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু শ্যামচরণ তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া দোকানের প্রতি জিনিষ-টির উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল এবং কাহার কি ট্রেড্‌মার্ক—কাহার কতো দাম এইগুলি নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিল। "সুন্দরী আল্‌তা"—লাল কাগজের উপর একটা অস্পষ্ট মেয়েলি ছবি—তাহার পাশে লেখা আছে "ট্রেডমার্ক।" মূল্যমাত্র।১০। তাহার পাশে অজচ্ছল প্রশংসা।

"সুন্দরীর" উপর হইতে নজর তুলিয়া লইয়া শ্যামচরণ জিনিষটা দেখাইবার জন্য পুঁটিরামকে অনুরোধ করিতে গিয়া দেখিল—

পুঁটিরাম একটা পুরাণো হারমোনিয়াম-বাঁশী কাপড়ের খুঁট্ দিয়া মুছিতেছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে পুঁটিরাম বলিল—'এইটা নিয়ে যান, ছেলে-মেয়েরা খুব খুসী হবে। খাঁটি জার্ম্মানীর তৈরী, চালাকি নয়…দামও কম, সাড়েসাত আনা—'

অস্থির পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া পয়সাগুলি নাড়িতে নাড়িতে শ্যামচরণ বলিল—'না, ও দরকার নেই…ঐ আল্‌তাটি একবার দেখি।'

আশে পাশে হাটুরেরা সসম্ভ্রমে যেন দু-চার হাত সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছে। একে পরিষ্কার

জামা-কাপড় পরা—জুতা পায় দেওয়া—তাহার উপর আলতা কিনিতেছে।

একজন, পাশের একটি লোকের কানে কানে বলিল—'ছোট বাবুর মতো মনে হচ্ছে না?'

ছোটবাবু মানে গাঁয়ের জমীদারদের ছোট ভাই। তাঁহার সহিত যে শ্যামচরণের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে একথা অনেকেই অনেকবার বলিয়াছে। একজন বলিল—'তা হতে পারেন...ঠিক সেই রকম এ্যালবার্ট ক্যাসানে তেড়ী কাটা...'

তাহারা তিনজনে সামনে আগাইয়া আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভাল আছেন তো বাবু—'

শ্যামচরণ তো অবাক। কোনরকমে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া শুধু একবার তাহাদের মুখের দিকে তাকাইল; কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চারিপাশ হাতড়াইয়া সে বলিবার মতো কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না।

এই সময়ে শ্যামাচরণের গাঁয়েরই একটা লোক সেই দিকে আসিতেছিল, ইহাদের কথার একটুকরা খেই ধরিয়া বলিল—'আরে ছোঃ—'ওযে রাই তবলদারের ভাই...'

কথাটা যেন পুঁটিরামের কানেই বেশী বেখাপ্পা ঠেকিল। বলিল 'তা হলেই বা...এরকম বিদ্গে...

বক্তা লোকটি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল—'সে কথা একশো-বার, লাখবার, এই দ্যাখোনা আমাদের...'

হাটের হট্টগোলের মধ্যেই তাহারা সমালোচনার আখ্‌ড়া খুলিবার উপক্রম করিল দেখিয়া শ্যামচরণ "সুন্দরী" আলতা, এক ডজন মাথার কাঁটা ও তিন গজ চুলবাঁধা ফিতে পকেটে পুরিয়া পুঁটিরামকে জিজ্ঞাসা করিল—'তা হলে মোট কত হলো?

হাতকচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে পুঁটিরাম বলিল—'এই আলতা—পাঁচ আনা—কাঁটা সাত পয়সা, আর, ফিতে—ধরুন ছ'পয়সা—পাঁচ আনা, সাত পয়সা আর ছ'পয়সা, পাঁচ আনা আর সাত, আর ছয় তেরো—তিন আনা এক পয়সা—মোট আট আনা এক পয়সা...তা আপনি না হয় একটা পয়সা কম দিন'।

শ্যামচরণ বেশ বুঝিল যে পুঁটিরাম তাহাকে এই আপনি একটা পয়সার আড়াল দিয়া অন্ততঃ পাঁচটি পয়সা ঠকাইয়া লইতেছে—।

কিন্তু তাহার পাশে অপ্রীতিকর সমালোচনার যে একটা ধূম উঠিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে তাহার ভয়ে এবং পোষাক পরিচ্ছদের খাতিরে সে আর কোন বাকবিতণ্ডা না করিয়া ঐ আট আনা এক পয়সা দিয়াই বিদায় লইল।

বাড়ী আসিয়া গামছা বাঁধা ছোট পুঁটলিটা নামাইয়া রাখিতে না রাখিতেই তাহার পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিলোচন আসিয়া জামার খুঁট্ ধরিয়া দাঁড়াইল।

উদ্দেশ্য তাহার জন্য কাকা হাট হইতে কি আনিয়াছে।

শ্যামচরণের চোখে এখনও হাটের সেই অপ্রীতিকর দৃশ্যটি বেশ পরিস্কার ভাবে লাগিয়া আছে। মেজাজ্‌টাও সেই জন্য ভাল ছিল না।

ধমক দিয়া বলিল—'ছাড়্—তাড়াতাড়ি এসে যে জামার খুঁট্ ধরে দাঁড়ালি—কিছু আনিনি...'

একবার মা এবং একবার খুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদ কাঁদ সুরে ত্রিলোচন বলিল—'কিছু না—এক পয়সাল্ কুচো গজা—'

তাহার বাজে কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে না করিয়া শ্যামচরণ পকেট হইতে আলতার শিশি, মাথার-কাঁটা ও ফিতে বাহির করিয়া মেজ বৌয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—'ধরো তো এগুলো—'

হাট হইতে ত্রিলোচনের জন্য এক পয়সার গজাও আনা হয়নি দেখিয়া মেজ বৌ মনে মনে বেশ একটু রাগিয়া গিয়াছিল, তাই একটু জোর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি?'

শ্যামাচরণ বলিল—'আগে ধরেই দ্যাখো, তারপর জিজ্ঞাসা কোরো।' কিন্তু মেজবৌ হাত বাড়াইল না। ঘাড় উঁচু করিয়া শ্যামচরণের হাতের জিনিষ এক ঝলক্ দেখিয়া লইয়া ঝাঁঝাল সুরে বলিল—'দূর কোরে ফেল ওসব আদাড়ে—কে ব'লেছে তোমায় পরের পয়সায় ফোঁপর দালালী কোরে ওসব আনতে?—'

শ্যামচরণ কেবল কাঁদিল না। কিন্তু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—'তোমার জন্যেই এনেছি......'

আর যাইবে কোথায়...।

মালতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে—যখন যে পয়সাটি হাতে পারে তা-তো বাজে খরচ

কোরবেই, আর তার দোষ চাপাবে আমার ঘাড়ে...আমার জন্যে না...'

শ্যামচরণ খপ্ করিয়া তাহার পায় হাতদিয়া কহিল—'এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—'সত্যিই তোমার জন্যে।'

বড়বৌ একটু দূরে উনুনের পাশে নির্জীব কাঠের খুঁটির মতো নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, আর মনে মনে আলোচনা করিতেছে—'কালে কালে হলো কি ?'

হাত বাড়াইয়া মালতী বলিল—'তবে দাও—'

অপ্রত্যাশিত ভাবে এতখানি অনুকম্পা পাইয়া শ্যামাচরণ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া এক একটি করিয়া জিনিষ কয়টি মেজ-বৌ-এর হাতে দিল।

জিনিষ কয়টি হাত পাতিয়া লইবার মতো ধৈর্য্যটুকুই মালতীর ছিল, তাই মাথার কাঁটা কয়টি একটি একটি করিয়া গুণিয়া দিয়া শ্যামচরণ হাত তুলিয়া লইবামাত্রই—সে সেই খানে দাঁড়াইয়া আঁস্তাকুড়ের উদ্দেশ্যে জিনিষ গুলো ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—'যাক্।'

কোন্ হইতে বড়বৌ সসব্যস্তে বলিয়া উঠিল—'আহা, তাই বলে সত্যি সত্যিই ফেলে দিলি......'

ত্রিলোচনকে কোলে উঠাইয়া লইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে চড়া সুরে যেন বলিল—'আমি তো আর বড় লোকের মাগ নই যে ওসব পরে বিবি সেজে বসে থাকব—'

তাহার চলনের গম্ গম্ আওয়াজের শেষ শব্দটুকু মিলাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত শ্যামচরণ সেইখানে আ-কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শোবার ঘরের দোর ভেজানোর শব্দ কানে আস্তেই—বড়বৌ-এর দিকে ফিরিয়া বলিল—'এ্যাতো অহঙ্কার ভাল নয় বড় বৌঠান—এইযে সতী-শিরোমণী 'সুন্দরী আলতা' তামাক কোরে ফেলে দেওয়া হলো—আর মাথার কাঁটা ঐলোহা দিয়েই তো যিশুখৃষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল......'

ভাতের হাঁড়ি উপুড় দিতে দিতে বড়বৌ নির্ব্বিকার ভাবে কহিল—'জানিনে বাপু—, তোমাদের কাণ্ড-মাণ্ড...কবে যে মরবো হাড় জুড়ুবে—'

রাত্রিতে খাইতে বসিয়া রাইচরণ বলিল—'শুনছ দাদা, গোপাল তো আমায় ভয়ানক পাকড়াও কোরেছে—'

আশ্চর্য্যের সুরে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল—'কেন ?'

আর তাহার পাশে শ্যামচরণ আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিল—'তা হলে সন্ধ্যে বেলার লঙ্কা-কাণ্ডর কথা এখনও এঁদের কানে যায় নি...বাঁচা গেল।'

'ঐ যে ওর একটা ভাই-ঝি আছে না—বলে তোমাদের শ্যামাচরণের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে। তা আমি বোল্লাম. আমি আর কি বোলব,আমার পির দাদা আছেন, তিনি যা ব'লবেন তাই হবে। তবে শ্যামার তরফ্ থেকে যে কোন আপত্তি হবে না একথা আমি জানিয়ে এসেছি।

ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল—'তা দেবে-থোবে কেমন ?—

ঐখানেই তো গোল। বলে "গরীব মানুষ, শুধু মেয়েটিকে দেখে যদি নেও"। তা বাপু আমিও বলি—মেয়েটি কিন্তু পরম রূপসী—আর বড় সড় আছে—আমাদের শ্যামার সঙ্গে—

এক গাল ভাত পুরিয়া রুদ্ধ আক্রোশে হরিচরণের পাশ হইতে শ্যামাচরণ বলিয়া উঠিল--'আমি তো আর মেয়ে দেখিনি—আরো যদি চোখ কটা না হোতো—'

আরও হয় তো কিছু বলিতে যাইতেছিল।

কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া ধমকের সুরে রাইচরণ বলিল 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইতো খুব রূপ চিনিস্। সেদিনকার ছেলে মুখ টিপলে দুধ বেরোয়, ও এসেছে রূপের বিচার কোরতে। আমিই তো মালতীকে পছন্দ কোরে বিয়ে করে এনেছি, বলুক তো দেখি, কে ব'লতে পারে যে আমার ই-স্ত্রী দেখতে খারাপ...'

ইহার উপর শ্যামাচরণ জোর করিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। তবে আস্তে-আস্তে একেবারেই যে কিছু বলিল না এমন নয়—নিজের বেলায় এমন প্যার্শেলিটি (Parsiality—পক্ষপাতিত্ব) সকলেই ক'রে থাকে।'

তখন বিবাহের আর কোন কথাবার্ত্তা না হইলেও বড় দুভায়ের মধ্যে ঠিক হইয়া গেল যে ঐ ক্যামাক্করীকেই ভ্রাতৃবধু করা হইবে। এবং বিবাহের দিন ঠিক করিয়া সমস্ত পাকা পাকি করিয়া তখন শ্যামাচরণকে জানাইলে চলিবে। হাজার হোক সোমত্থ ছেলে, বিয়ের নামে এমন একটু-আধটু মোচড় দিয়াই থাকে—তাহার উপর দু-পাঁচখানা ইংরাজী বই পড়িয়াছে।

কাজ করিতে গিয়া গোপালের সঙ্গে দেখা হইলে রাইচরণ

কহিল—'ভাখো ভাই, আপত্তি আমাদের নেই। এই আমাদের ভাইদের মধ্যে শেষ কাজ, সুতরাং মেয়েটী আমরা ভাল চাই—তা তোমার ভাইঝিটিও বেশ দেখ্তে শুন্তে—তবে কিনা কনেটিকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে আর বরশয্যেটা একটু দেখে শুনে বিবেচনা করে দিও। শেষে যেন তোমার জামাই দুঃখু না করে যে, এত লেখা-পড়া শিখেও বিয়েতে একটা আধলাও নগদ পেলাম না। আর বুঝ্ছো কিনা—পাশা-পাশি গাঁ, মানে এবাড়ী ও-বাড়ী। ও-গাঁয়ের কেউ এসে যে আমার নামে তোমাকে দুকথা বলে যাবে বা তোমার নামে আমাকে দু-কথা শুনিয়ে আস্‌বে—সেটা আপনা-আপনির মধ্যে……'

গোপাল আশ্বাস দিল যে, সে তাহার মেয়ে-জামাইকে যথা সাধ্য দিবে। তবে বেশী খরচ করিতে পারিবে না বলিয়াই না তাহাদের হাতে পায় ধরা। তাহার পর বিবাহের দিনও ঠিক হইয়া গেল। গায় হলুদের মাত্র আর তিন দিন বাকী, কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাইল ঐ শ্যামাচরণ।

সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, কর্সা জামা কাপড় পরিয়া মেজ বৌঠান যেখানে ঘর লেপিতেছিল, সেখানে গিয়া বলিল—'আমি সহরে যাচ্ছি। আস্‌তে দু'একদিন দেরী হবে—বুঝেছ ?'

কিন্তু মেজ বৌ বুঝিল না কিছুই, উপরন্তু আশ্চর্য্যের সুরে বলিল—'ওমা সেকি! পরশু যে তোমার গায় হলুদ আর তার পাঁচদিন পরে বিয়ে—'

কাপড়ের কোঁচা দিয়া জুতার ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাচ্ছিল্য ভরে কহিল—'রেখে দাও তোমার গায় হলুদ, ও তার পরের দিনও হলে চল্‌বে। কিন্তু আজ এগারটার গাড়ীতে আমাকে সহরে যেতেই হবে—'

—'সহরে এ্যাতো কি তোমার দরকার যে দুদিন থাকতে হবে ?'

'—কি দরকার ? যাচ্ছি, গান বাজনা কোরতে…ঐ যে মনে নেই, যে বাইজী গেলবার বারোয়ারীতে এসেছিল তাকেই। পরশু যে মেজ বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন তাই গান দেওয়া হবে। বাবু বল্লেন, শ্যামাচরণ তুমি যদি একবার যেতে—' তাই না যাচ্ছি। বুঝছনা—একটু তেল-টেল তো দিতে হবে—'

'—তা এ্যাতো লোক থাকতে তুমি কেন ?'

মালতীর সারা মুখ তখন রাগে কাল হইয়া গিয়াছে। শ্যামাচরণকে, এতদিন যাহা ভাবিয়া সে স্নেহের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা সে মোটেই নয়। উপরন্তু অধঃপাতের পথে বেশ খানিকটা নামিয়া গিয়াছে। শ্যামাচরণের এ স্পর্দ্ধা ও লজ্জাহীনতা যেন তাহাকেই বেশী করিয়া বিঁধিল।

কিন্তু শ্যামাচরণ বেশ গর্ব্বের সহিত বলিল—'তা-ও জানোনা! সেই যে প্রথম দিন হারমোনিয়াম বাজন্দারের অসুখ করাতে গান প্রায় বন্ধ হয় হয়, তখন আমি বিজয়বাবুকে বল্লাম যে যদি অনুমতি হয় তো আমি কাজ চালানোর মতো বাজাতে পারি। তাই বাইজীর সঙ্গে চেনা পরিচয় ত আছে, বাবু বল্লেন যে যদি কিছু সস্তায় হয়……'

মালতীর মুখের পানে তাকাইয়া শ্যামাচরণ তখনও হাসিতেছিল।

মালতী আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে সেইখান হইতে বড় বৌর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ভাইরা বাড়ী আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তো রাগিয়া খুন। বলিল—'ঝকমারী করেছি ভাইকে লেখা-পড়া শিখিয়ে, এখন মান ইজ্জত সবই যায়। আগে আসুক সে বাড়ী—লোক ডেকে তার পৈতৃক অংশ যা আছে ভাগ কোরে নিয়ে আলাদা হয়ে থাকুক।'

কিন্তু সত্য সত্যই শ্যামাচরণ দুই দিনের মধ্যে গাঁয় আসিল না। তিন দিনের দিন ভোরের গাড়ীতে একেবারে বাইজী সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

বাবুদের সঙ্গে হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল তখন বেলা, প্রায় দশটা।

বাড়ী আসিয়াই দেখিল সকলেই মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে, আর দাদারা সেদিন কাজেও যায় নাই।

কেমন একটা ধোঁকা লাগিল, কিন্তু অদূরে ত্রিলোচন ও মানদাকে খেলা করিতে দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। যাক্ তা হ'লে বাড়ীর কেউ মরে যায় নি।

বড় বৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—'বাঃ, সব যে বেশ নিঝুম মেরে বসে আছো, গায় হলুদের যোগাড় কই ?—'

বড় বৌ কথা কহিল না, কহিল রাইচরণ, এবং বেশ একটু মরিয়া হইয়াই—'লজ্জা কোরলো না ও কথা কইতে—

বাউণ্ডুলে বদমায়েস কোথাকার, দুদিন দু-রাত্তির নটীর বাড়ী কাটিয়ে এসে এখন বলা হচ্ছে—গায় হলুদের যোগাড় কই—বেরো আমার বাড়ী থেকে—বেরো বল্‌ছি—' উঠিয়া বাহির করিয়া দিতে যায় আর কি!

বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল—'আহা চট্‌ছো কেন—রাই, তার চেয়ে বরং ওকে বলে দাও যে, গাঁয়ের দু-একজন মাতব্বরদের—এই নিধু ভট্‌চায্যি—গোবিন্দ খুড়ো—এঁদের ডেকে এনে নিজের যা পাওনা গণ্ডা ভাগ কোরে বুঝে নিক্‌...'

শ্যামাচরণ এই কথা বার্ত্তার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তবে এইটুকু বুঝিল যে গোলমাল বাধিয়াছে তার সহরে যাওয়া এবং ঐ বাইজীকে লইয়া—

গাঁয়ের মাতব্বরদের ডাকার কথায় কান না দিয়া সে আস্তে ঘরে ঢুকিল। জানে যে দাদাদের রাগ হইতে যতক্ষণ—যাইতেও ততক্ষণ। অনেকক্ষণ ধরিয়া হরিচরণ, রাইচরণ এমন কি সুশীলা, মালতী পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিল না। উঠানের মলম খুঁটির পাশে বসিয়া ত্রিলোচন ও মানদা দুইটা কুকুরের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করিতেছে। মালতী এক দৃষ্টিতে তাহাদের খেলা দেখিতেছিল।

হুকায় সুখ টান দিয়া—একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া হরিচরণ কহিল—'তা যখন এসেছে তখন হাত নেড়ে গায় হলুদের ব্যবস্থাটা কোরে ফ্যাও বড় বৌ। আমি যাই, একবার গোপালকে খবরটা দিয়ে আসি—আর তুই রাই, বরঞ্চ পায় পায় একবার মুচিবাড়ীর দিকে যা। বল্‌গে যে ঢোল কাঁশি নিয়ে তারা যেন এখুনি আসে; হাজার হোক্ শুভকর্ম্ম...'

গায়ে হলুদও শেষ হইয়া গেল। বিবাহের এখনও পাঁচ দিন দেরী। তাই শ্যামাচরণ বেশ কায়েমী ভাবে গিয়াই গানের আসর জাঁকাইয়া বসিল। ঠিক একেবারে—বাইজীর সামনে।

বাইজীর সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই দুইজনেই মুচ্‌কাইয়া মুচ্‌কাইয়া হাসিল।

বাইজী হাসিল—শ্রোতা দর্শক মাতাইবার জন্য, কিন্তু শ্যামাচরণ মনে ভাবিল যে তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়াছে। হাজার হোক গেল বছরের পরিচয়—তাহার উপর বায়না দিয়া আনিয়াছে।

বাইজীর পায়ের ছন্দ, গানের সুর তাহাকে যেন মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার লীলায়িত অঙ্গভঙ্গি, আঁখির দীপ্ত শিখা শ্যামচরণের দেহের প্রতি শিরা উপশিরাটিকে চেতাইয়া জাগাইয়া তুলিল। এতদিন যাহা তাহার নিকট মুক্ত ও দূরের ছিল, আজ তাহা তাহার সুমুখে জাগ্রত ও সত্য হইয়া উঠিল।

গান আর তাহার ভাল লাগিল না। নৃত্য আর তাহাকে আকৃষ্ট করিল না। সে উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন গান শেষ হইবে, হইলেই সে সোজা তাহার ঘরে গিয়া প্রেম নিবেদন করিবে।

করিলও তাই।

গান শেষ করিয়া বাইজী কেবল নিজের নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে আসিয়া শয্যার উপর গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, সাজ, পোষাক-ও খোলা হয় নাই। দাসী একগ্লাস জল আনিতে বাহিরে গিয়াছে, এমন সময় চোরের মতো পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শ্যামারণ তাহার তাঁবুর পরদার দোর উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।

ক্লান্তির আমেজে বাইজীর সমস্ত অঙ্গ তখন এলাইয়া আসিয়াছে, চোখে তন্দ্রা। কোন রকমে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কে?' এই ছোট প্রশ্নটুকুতেই শ্যামাচরণ সমস্ত বলার কথাই ভুলিয়া গেল, এমন কি মুখ ফুটিয়া উত্তর দিতেও পারিল না।

চোর সন্দেহ করিয়া বাইজী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া পাশের তাঁবুর লোকদের নাম ধরিয়া ডাকিতেই শ্যামাচরণ বলিল—'এজ্ঞে—আ—মি—'

'—আমি কে?'

'—আমি শ্যামাচরণ—'

'—শ্যামচরণ!'

এই সময় পাশের তাঁবু হইতে দুতিন জন লোক আসিয়া হাজির হইল। দোরের সামনে শ্যামাচরণকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া কহিল—'আরে বায়নাদার মশায় যে! তা এত রাত্তিরে কি মনে কোরে? ভিতর হইতে বাইজী জিজ্ঞাসা করিল বায়নাদার মশায়?...আরে এস এস, তা বলতে হয়, শ্যামচরণ...আমি কি শ্যামচরণকে চিনি— জানি শুধু তোমাকে—'

আগত লোকদুটি ফিরিয়া বলিল—'তোমরা যাও।

তাহারা চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও শ্যামাচরণ সেইখানে ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাইজী গা দোলাইতে দোলাইতে উঠিয়া আসিয়া শ্যামাচরণের হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল। বলিল, অতো লজ্জা কিসের—আমি কি তোমার লজ্জার মানুষ!

শ্যামাচরণ কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অনভ্যস্থ দেহমন এতখানি নির্লজ্জতা সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তবু কোন রকমে জবু থবু হইয়া বিছানার একপাশে গিয়া বসিল।

শ্যামচরণকে বাইজী একজন পেশা বায়নাদার বলিয়াই মনে করিয়াছে। তাই খাতির জমাইবার জন্য পানের ডিবা হইতে দু'টা পান শ্যামাচরণের মুখে পুরিয়া দিল। তাহার পর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—'এবার কোথায়?—

সোহাগভরে মুখে পান পুরিয়া দিতে দেখিয়া শ্যামচরণ মনে ভাবিল যে এ নিশ্চয় তাহাকে ভালবাসিয়াছে, নইলে...'

আস্তে আস্তে সাহস করিয়া বলিল—'আমি ভালবাসি।'

হাসিতে হাসিতে শ্যামাচরণের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া বাইজী কহিল—'পান, না আমাকে?—'

স্পষ্ট কথাটি বলিতে গিয়াও শ্যামচরণ কোন রকমেই উচ্চারণ করিতে পারিল না। উপরন্তু সে আনমনে বলিয়া ফেলিল—'ধ্যেৎ—'

বাইজী তাহার পাশ ঘেসিয়া বসিয়া হাত দিয়া গলা জড়াইয়া কহিল—'ধ্যেৎ কি গো, এত রাত্তিরে চুপি চুপি এসেছো—নামটিও শ্যামচরণ, অথচ ভালবাস না—'

এইবার শ্যামচরণ অনেক কষ্টে বলিল—'হাঁ ভালবাসি—খু—ব—তবে?'

বাইজী দুহাত দিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিল। মুখে একটা চুমুও দিল।

বলিল—'এবার—কোথায়?—'

বাইজীর বাহু পাশে শ্যামচরণ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর এই চুমু! সে মরিয়া হইয়া কহিল,—'কেন আমার ঘরে—'

বাইজী মনে ভাবিল শ্যামাচরণ বুঝি রহস্য করিতেছে, তাই একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—'সে তো যাবই, তবু, জায়গার নাম কি?'

শ্যামাচরণ ভাবিল শিক্ষিতা বাইজীকে—আমার ঘর বলাটা হয়তো রুচিসঙ্গত হয় নাই, তাই ভুল শোধরাইয়া লইয়া বলিল 'আমার হৃদয়ে—'

কথা কাটাকাটিতে বাইজীর শ্রান্ত দেহ-মন ভিতরে ভিতরে বেশ একটু তাতিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে পাছে বায়না হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, বায়না কোথাযও নাই, শ্যামচরণ শুধু তাহাকে ভালবাসিয়া প্রেম নিবেদন করিতে আসিয়াছে; তখনই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দরজার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—'আমার একটা চাকরের দরকার—জুতা পরিষ্কার করার জন্যে, যদি সে কাজ পার, কাল সকালে এসে আমার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা কোর'। এখন—এক্ষুনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—নইলে দোবে কে ডেকে—'

শ্যামচরণ তবুও উঠিল না। ভাবিল, এও বুঝি তাহার একপ্রকার প্রেম নিবেদন। কিন্তু যখন বাইজী সত্য সত্যই দোবের নাম ধরিয়া দু-তিন বার ডাকিল, তখন শ্যামাচরণ বুঝিল যে ব্যাপার ততো সোজা নয়।

তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'শিক্ষিত লোককে অপমান করার ফল কালই পাবে—

দোরের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে, থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বাইজীর দিকে ফিরিয়া বলিল নিশ্চয়—কালই; কালই; বাবুকে বলে দিয়ে—'

বাইজীর ঠোঁটের উপর মৃদু হাসির ছোট একটি টুকরা।

ঐ রাগে রাগে বাড়ী গিয়া অত রাত্রিতেই মেজবৌঠানকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'বিয়ে কালকেই করা যায় না মেজবৌঠান?—'

—

টমাস হার্ডি

শ্রীসারদাচরণ রায়চৌধুরী

অফুরন্ত চিত্তরসে ফুটাইয়া রক্ত-শতদল
সাজাইলে বাণীকুঞ্জ, অনিন্দ্য-অমল।
গাঁথিলে মনের মালা অজানার অমরতা মাগি,
তবু কেহ রহিলো না জাগি
কাল-নিশীথিনী তলে। মানুষের কত ছবি
তপস্যার যজ্ঞহবি,
পুড়ে হয় ছাই।
ধূলিকণা ভেদি তাই,
উঠে ক্রন্দনের রোল, কাঁপাইয়া বনভূমি
চলে গেছে বলে তুমি।—
গৃহহারা, দুর্ভাগ্যের ডোর,
এড়াইয়া নিয়তির অভিশাপ, বিপদের ঘোর
চলিয়াছ রাত্রিদিন। বিপুল-সংগ্রাম
নিষ্ঠুর দারিদ্র্যতরে। বিদ্রোহের অভিযান,
মানবের বিশাল পতন—
দৈবের খেলায় এরা জোগায় ইন্ধন।
নাহি কালাকাল
তাহাদেরি তরে বন্ধু ধরেছিলে লেখনী তোমার
আজো তাই ভেদি' অন্ধকার
ফুটিয়াছে বৈজয়ন্তী বাণী।
ওগো বেদনার কবি! জানি তাও জানি
তোমার সে নরনারী, পানকরি' কল্পলোক মধু
সাজে নাই প্রেমময় নব বরবধূ;
মাটির উৎসবে তা'রা এলো ফিরে ফিরে
মৃত্তিকার অবলেপে অঙ্গ ঘিরে ঘিরে।
ওগো প্রকৃতির কবি! উষর সে শয্যা'পরে
অতর্কিতে দেহপাত ক'রে
বিদেশীগো—মহামানবের প্রিয়জন
মৃত্যুরে করিলে বরণ।
বাণীর পূজারী যত আজো ধীরে
ফেলে অশ্রুভার
অনাগত যুগ-ঋষি, বিদেশীর লহ নমস্কার।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পল্লীগ্রামে একের বিপদে দশজনে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। কথাটা সত্য। কিন্তু জঙ্গলের পাশে শুক্‌নো একটা পুকুরের পারে শ্মশান। নেহাৎ কাছে নয়। তায় আবার কলেরার রোগী।

জয়রামকে কাঠ-কয়লার জোগাড় করিতে বলিয়া অক্ষয় নিজে গেলেন লোক ডাকিতে।

আসিত সকলেই; কিন্তু কি করিবে, দৈবের বিড়ম্বনা। অন্ততপক্ষে দশটা লোকের বাড়ীতে বৌ পোয়াতী, সুতরাং মড়া পোড়াইতে যাওয়া তাহাদের নিষেধ। চার-পাঁচ জন লোক মাদুলী ধারণ করিয়াছে, এবং এমন মাদুলী যে, মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছে কি মাদুলীর সব গুণ মাটি।

কাজেই যাওয়া অনেকেরই হইল না। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোকের স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা হইলে লোকে পাগল বলিবে। মাদুলী ধারণ করার অজুহাতটা সোজা হইলেও চট্ করিয়া মাথায় আসে না।

লোক জনকতক জুটিল বটে, কিন্তু জীবন্ত দেহের তুলনায় মৃতদেহ নাকি ভারি হইয়া উঠে; সাতজন লোকের কিছু বেশী হইলেই ভাল হইত। অক্ষয়কে লইয়া আটজন। তিনি বুড়া মানুষ, মৃতদেহ বহন করিবার ক্ষমতা নাই,—অতখানা পথ শুধু তাঁহার হাঁটিয়া হাঁটিয়া যাওয়া আর আসা। জয়রাম নিষেধ করিল। তাঁহার না গেলেও চলিত। কিন্তু তিনি শুনিলেন না। গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত থাকিলেনও। আবার ফিরিবার পথে সকলের সঙ্গে স্নান করিয়া আসিতেও ভুলিলেন না।

এত অত্যাচার সহিবে কেন? পরদিন দেখা গেল, অক্ষয় শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। হাত দিয়া শুধু গলার কাছটা দেখাইয়া দেন।

সকলেই বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। উমা নুনের পুঁটুলি করিয়া সেক দিতে লাগিল।

রাত্রে জ্বর আসিল। গা যেন আগুন! পরদিন দেখা গেল, জ্বর ত' কমেই নাই, চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে বলিয়া বোধ হইতেছে। মুখে রা নাই।

জয়রাম বলিল, 'ডাক্তার আনিগে যাই।'

উমার মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। জয়রামের মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ যান আপনি।'

কথাটা অক্ষয় বোধকরি শুনিতে পাইয়াছিলেন হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। এবং পরক্ষণেই হাত ও মুখের ইঙ্গিতে এই কথাটাই যেন বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে, আর ডাক্তার ডাকিয়া কি হইবে, দিন তাঁহার শেষ হইয়া আসিয়াছে।

উমা আরও ভয় পাইল। অক্ষয় তাহাও বুঝিলেন। হাত বাড়াইয়া তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া একদৃষ্টে মেয়েটার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। উমা কাঁদিয়া ফেলিল। অক্ষয়ের চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

জয়রাম তখন পিছনে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে। তাহার মনে হইতেছিল, এ অপরাধ যেন তাহারই। তাহারই স্ত্রী কন্যাকে পোড়াইতে গিয়া তাঁহার এই দশা।

অক্ষয় চোখ তুলিয়া তাহাকে কাছে ডাকিলেন। জয়রাম

কাছে আসিলে আঙুল বাড়াইয়া অদূরে টেবিলের নীচে কাঠের একটি বাক্স দেখাইয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে কি যেন আনিবার ইঙ্গিত করিলেন। ভাল করিয়া ব্যাপারটা কেহই বুঝিল না। জয়রাম বাক্সটা তাঁহার কাছে আনিয়া ডালাটা তুলিয়া ধরিল। অক্ষয় কম্পিত হস্তে কতগুলা কাগজপত্রের তলা হইতে পোষ্টাফিসের একটি 'পাশ-বই' বাহির করিয়া উমার হাতের কাছে ধরিয়া দিলেন এবং প্রাণপন চেষ্টায় কি যেন বলিতে গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাক্সটি পুনরায় সেইখানে রাখিয়া দিয়া জয়রাম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেক কষ্টে নিজের অশ্রু নিরোধ করিয়া বলিল, 'ছি, কাঁদবার কি আছে? এ তোমার দুদিনেই সেরে' যাবে দেখো।' বলিয়া হেঁট হইয়া কাপড় দিয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে গেল। অক্ষয় তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এদিকে উমার হাতের কাছে লইয়া আসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। একবার উমার মুখের পানে একবার জয়রামের মুখের পানে তাকাইয়া আবার ঠোঁট নাড়িয়া কি যেন তিনি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কথা বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তখন তিনি চুপ করিয়া একবার চোখ বুঁজিলেন। তাহাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। কিয়ৎক্ষণ পরেই চোখ খুলিয়া একবার এদিকে চাহিয়া একবার ওদিকে চাহিয়া, ঠোঁট নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়া কেমন যেন একটা প্রাণান্তকর উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করিতে সুরু করিলেন। উমা তাহার নিজের অবস্থা কল্পনা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। জয়রামের চোখের জল কোনো প্রকারেই বাগ মানিতেছিল না। চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'জল দেব?'

অক্ষয় হাঁ করিলেন।

উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিয়া জল আনিল।

কতক খাইলেন, কতক বা পড়িয়া গেল। বিছানায় রৌদ্র আসিবে বলিয়া পাশের জানালাটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হাত হইতে গ্লাস নামাইয়া উমা ধীরে-ধীরে জানালাটা খুলিয়া দিতেই অক্ষয় সেই দিকে পাশ ফিরিলেন সারি সারি কয়েকটি আমগাছের আড়ালে দূরে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত একটুখানি আকাশ দেখা যাইতেছে। সূর্য্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল। বাগানে পাখীর কোলাহল। অক্ষয় এমন ভাবে একদৃষ্টে বাহিরের পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইতে লাগিলেন যে, মনে হইল যেন ইহারই জন্য এতক্ষণ তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসেই বোধকরি তাঁহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদ্বেগ অনেকখানি শান্ত হইল। অতিকষ্টে হাত দুইটি একত্রিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কপাল পর্য্যন্ত উঠাইয়া অত্যন্ত ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া তিনি যেন কাহার উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিলেন।

জয়রাম সেদিন আর ঘরে গেল না। প্রমথ রান্না করিল। কোনোরকমে চারটিখানি মুখে দিয়া কখনও জয়রাম কখনও উমা কখনও প্রমথ—তিনজনে জাগিয়াই কাটাইল। অক্ষয় সেই যে চুপ করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর একটি বারের জন্যও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রভাতের দিকে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

গ্রামের কয়েকজন লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তিনি কাহারও দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন না। সকলেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া উমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া চলিয়া গেল।

দুপুরে খাইতে বসিয়া জয়রাম বলিল, 'বিহারী এলেই ডাকটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি একবার শহরে যাই—ডাক্তার নিয়ে আসি।'

হেঁটমুখে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উমা জবাব দিল, 'কী হবে ডাক্তার! গলা দিয়ে জল পেরোচ্ছে না ওষুধ পেরোবে কি?'

জয়রাম, 'বলিল তাহ'লেও। যদি কোনও উপায়......'।

'দেখুন।' বলিয়া উমা সেখান হইতে সরিয়া গেল।

জয়রাম মুখ তুলিয়া দেখে নাই। বলিল 'অমনি তোমার মামাকে একখানা টেলিগ্রাম........'

জবাব না পাইয়া জয়রাম তাকাইয়া দেখে, উমা চলিয়া গেছে।

বিহারী-রাণার রোজ একবার করিয়া বাবুকে দেখিবার জন্য যেখানে আসিয়া দাঁড়ায়, আজও তেমনি তাহার সংস্রব বাঁচাইয়া পায়ের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্যদিন 'বাবু' বলিয়া ডাকিবামাত্র তিনি চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতেন। আজ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিহারীর মুখ

দিয়া কথা সরিল না। উমাকে সে কোনদিন দেখে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে মা?'

উমা মুখ তুলিতেই জয়রাম বলিয়া দিল, 'ওঁর ভাইঝি।'

উমেশকে বিহারী ভুলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'মামাবাবু এসেছেন?'

জয়রাম বলিল, 'না।'

এদিকে তাহার ডাক লইয়া যাইবার সময় হইয়া গেছে। বিহারী একদৃষ্টে বাবুর মুখের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে তাহার নড়িবার ইচ্ছা করিতেছিল না। আজ চোদ্দটি বৎসর তাঁহার সঙ্গে পরিচয়! একটি দিনের জন্যও কোথাও সে তাঁহাকে যাইতে দেখে নাই। এইবার হয়ত তিনি চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবেন। আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই কথা ভাবিয়া সে অশিক্ষিত অসভ্য 'রাণারের' চোখেও জল আসিল। খাটিয়া তাহার স্পর্শ করিবার উপায় নাই। সেইখান হইতেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কম্পিতকণ্ঠে বিহারী ডাকিল, 'বাবু—!'

বাবু নির্ব্বিকার।

আর-একবার সে বাবু বলিয়া ডাকিতে গেল, কিন্তু ঠোঁট দুইটি তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেই ছেলেমানুষের মত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া বিহারী কাঁদিতে লাগিল।

ডাকের থলি বন্ধ করিয়া ঘড়ির পানে তাকাইয়া জয়রাম ধীরে-ধীরে বলিল, 'ওঠ্ বিহারী!'

বিহারী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, 'আর ত' দেখা হবে না বাবু—!' বলিয়া সে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকের চিঠিপত্র বেশি কিছু আসে নাই। ভিন্ন গ্রামের খান চার-পাচ চিঠি, গ্রামের চিঠি দশ-বারো খানি, আর একটি মণি-অর্ডার পনর টাকার। সেগুলি হাতে লইয়া বিলি করিয়া দিবার জন্য জয়রাম উঠিল। উমাকে বলিল, 'বসো তুমি। চট্ করে' এগুলি হাতে হাতে বিলি করে' দিয়েই আসছি।'

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল, এবং আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ী হইতে চাদরটি কাঁধে ফেলিয়া হাতে একটি লাঠি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দরজার কাছ হইতে বলিল, 'যাই ডাক্তার নিয়ে আসি।'

উমা বলিল, 'দেখে যান আগে।'

জয়রাম রোগীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, অক্ষয়ের তখন শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, বুকের পাঁজরা ঘন-ঘন ওঠা-নামা করিতেছে। চোখ দুটি অর্দ্ধনিমিলিত।

কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিয়া জয়রাম বলিল, 'নীচে একটা বিছানা করে' দাও।

মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া উমা জয়রাম ও প্রমথ তিনজনে ধরাধরি করিয়া রোগীকে খাটিয়া হইতে নীচে নামাইয়া দিল।

সজল চক্ষে জয়রাম কহিল, 'ভট্চাজ্ ডাকি।'

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি একটা কার্য্যোপলক্ষে প্রসাদপুর গিয়াছিল, তখন সবে তিনি ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়াছেন। পোষ্ট-মাষ্টারের অন্তিম অবস্থা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া, বৈতরণী প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া বলিলেন, 'চল।'

জয়রাম আগে আগে আসিতেছিল। ডাকঘরের চৌকাঠ ডিঙাইয়া দেখে, মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উমা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। অদূরে অক্ষয়ের মুখের উপর চাদর টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশ—

বিরাজ বৌ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত রচনা পাঠ করিয়া পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল 'বিরাজবৌ' তাহাদের অন্যতম নহে। অপরপক্ষে কাহারো কাহারো মুখে শুনিতে পাইয়াছি বইখানির একঘেয়েমী দোষ আছে। যাঁহারা এ মতের পোষকতা করেন তাঁহাদের নেহাত দোষ দেওয়া যায় না,—কারণ বইখানি আগাগোড়া একটানা দুঃখের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী—ইহার মধ্যে সুখদুঃখের ওঠাপড়ার ইতিহাস নাই—আর কোন ঘটনাবৈচিত্র্যের সমাবেশ নাই—যাহা আছে তাহা ঐ দুঃখ-বৈচিত্র্যেরই এপিঠ ওপিঠ। সমস্ত বই খানির মধ্য দিয়া নিলাম্বর এবং বিরাজবৌ-এর অপরিসীম দুঃখের করুণ কাহিণী স্বচ্ছ বর্ত্তিকার মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই একটানা দুঃখের বেদন-কাহিনী পড়িতে পড়িতে মন হাঁপাইয়া উঠে, কিন্তু সেজন্য গ্রন্থকারের কোন অপরাধ নাই। যদি অপরাধ কাহারও থাকে তবে সে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের ভাগ্য বিধাতার—যিনি এর ঘরে ঘরে এমন অকাতরে দুঃখের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন।

তাই আমার মনে হয় এই বইখানি একেবারে খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় (eastern)—ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শবাদের অথবা ঘটনা বিন্যাসের কোনরূপ ছায়াপাত নাই। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমার কথা পরিস্ফুট হইবে:—'গাঁয়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে নীলাম্বরের যখন জ্বর হইল বিরাজবৌ সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল—পাঁচদিন পরে নীলাম্বরের জ্বর ছাড়িলে মা শীতলার পূজা পাঠাইয়া দিয়া তবে জল গ্রহণ করিল। মা শীতলার নিকট মানস করিয়াছিল, 'ভাল যদি কর মা তবেই আবার খাব দাব, না হলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবো।' মনে ভাবিয়াছিল, 'সিঁথের এ সিঁদুর তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেলবো।'

অবস্থা বৈগুণ্যে নীলাম্বরের যখন আর দিন চলাচলের উপায় রহিল না তখন সে কিছুদিনের জন্য বিরাজকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় যাইতে চাহিয়াছিল—বিরাজ ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখাইয়া প্রতিবাদ করিতে পারিল না কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া যাওয়ার বিরুদ্ধেও তাহার মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল—অবশেষে "অসুখ কচ্চে" "বড্ড অসুখ কচ্চে" বলিয়া দুয়ারের গাড়ী ফিরাইয়া দিল। তাহার মনের ভাব গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, 'ঘুম ভেঙে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না।'

উপরের যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম তাহা পাশ্চাত্যদেশীয়দের চক্ষে হাস্যকর—তাহারা ইহার যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না—ইহাকে নারীত্বের যুক্তিহীন লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়া এতদ্দেশীয় নারীজাতির প্রতি তাহারা কৃপাকটাক্ষ করিবে। বস্তুতঃ তাহাদেরও দোষ নাই। সতীত্বের এ আদর্শ ভারতবর্ষের জলহাওয়া ব্যতীত অন্যত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ভারতবর্ষের নিজস্ব—যুগযুগান্তের ঐতিহ্য এই আদর্শকে পরিপুষ্ট করিয়াছে—তবে নারী স্বামীত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে।

আরও একটি কারণে এই বইখানিকে আমি খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় বলিতে চাই—ইহার আখ্যান বস্তুর ভিতর দিয়া ভারতবর্ষীয় ভাগ্যবাদ (Fatalism) স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজ স্বামীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি? নীলাম্বর উত্তর দিয়াছিল, 'যিনি ভাব্‌বার তিনি ভাব্‌বেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে!' থামিয়া বলিয়াছিল, 'তা ছাড়া ভাব্‌তে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে?' কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া

বলিয়াছিল, চেয়ে দেখ্ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা মহারাজাকে গাছ তলায় বাস করতে হয়েছে—আমি ত অতি তুচ্ছ।'

ইহাই ভারতবাসীর চরম ভাগ্যবাদীত্ব—তাহার সকল দুঃখের মূল, তাহার সকল দুঃখের কারণ। বুদ্ধিবৃত্তির দোহাই দিয়া মানুষ আবহমান কাল সুখ দুঃখের কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—কত দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে, কত বিচার করিয়াছে, কত বিশ্লেষণ করিয়াছে কিন্তু সেই উত্তমং রহস্যং সেদিনও যেমন সুদূরে ছিল, আজও তেমনি সুদূরে আছে।

মাত্র তিন চারিটি চরিত্র এই আখ্যায়িকার সম্পদ—কিন্তু ইহারাই তাহাদের জীবনের ধারা দিয়া বইখানিকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নিলাম্বর আর বিরাজবৌ-এর চরিত্রের চারিপাশে ঘটনা পরম্পরা পাক খাইয়া ফিরিয়াছে—এই দুইটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্য বুঝিতে পারিলে বাঁকি অংশটা স্বচ্ছ হইয়া যায়।

নীলাম্বর মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে পারিত। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। সে যেমন গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনি অখ্যাতিও লাভ করিয়াছিল। ইহা বোধহয় অতিরিক্ত শক্তিরই অপরাধ—শক্তির আতিশয্যকে সকলে সহ্য করিতে পারে না গোঁয়ার্ত্তুমির নাম দিয়া নিজেদের অক্ষমতাটুকু ঢাকিয়া লয়। এই বিংশ শতাব্দীতে নীলাম্বরের মত লোক আর জন্মগ্রহণ করিতেছে না—এ যুগে সকলেই কাজের লোক—নীলাম্বরের মত do-nothingsদের এযুগে স্থান নাই। গ্রন্থকার বলিতেছেন 'নীলাম্বরের মা সাত বৎসর পূর্ব্বে তিন বৎসরের শিশুকে বউ ব্যাটার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। 'সেই দিন হইতে নীলাম্বর সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন করিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবহেলা করে নাই। নীলাম্বর যদি বিংশ শতাব্দীর আদর্শ কাজের লোক হইত তবে ঠিক ইহার উল্টাটাই করিত অর্থাৎ রোগীর সেবা করিত না, মড়া পোড়াইত না, কীর্ত্তন গাহিত না, গাঁজা খাইত না কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু অবহেলা করিত।

এই নীলাম্বর অতিরিক্ত সোজা ধরণের লোক ছিল। নিজের স্বভাবসিদ্ধ সরল বুদ্ধি দিয়াই জগৎটাকে বুঝিতে চাহিত। মা ছোট বোনটির ভার তাহার মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন—নগদ যাহা কিছু ছিল, বিরাজের গায়ের অলঙ্কার, দুইখানি বাগান বিক্রয় করিয়া এবং বদ্ধ মোড়লের দরুণ ডাঙ্গা বাঁধা দিয়া, এক কথায় অবস্থার অতিরিক্ত করিয়া ভাল ঘরে বোনটির বিবাহ দিল। নিজের কি করিয়া চলিবে এ কথাও যেমন একবারও ভাবিল না, হরিমতি তাঁহার মত পীতাম্বরেরও বোন, তাহারও এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করা উচিত, একথাও একবার মনে পড়িল না। অধিকন্তু জামাই-এর মাসে মাসে পড়ার খরচ জোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিল, তাহার পর উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হইল—ভদ্রাসন বাঁধা পড়িল—হালের গরু মরিল—পুকুর শুকাইয়া রৌদ্রে ফাটিতে লাগিল তথাপি নীলাম্বর ধার করিয়া যতীনের পড়ার খরচ জোগাইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, 'পুঁটির শ্বশুর বড়লোক, সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে আমরা পড়াব কেন? যা' হয়েছে তা, হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পার না।' নীলাম্বর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেছি যে। তার কি হবে? একথারও উত্তর বুদ্ধিজীবিনী বিরাজ দিয়াছিল, 'শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন তিনি আমার কষ্ট বুঝ্বেন, কিন্তু অদৃষ্টবাদী সত্যনিষ্ঠ নীলাম্বরের তাহা কোন কাজেই লাগিল না। সে নিজেকে ধ্বংশ করিয়াই শপথের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ হতভাগ্য নীলাম্বর জড়াইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িল, অদৃষ্টের লেখায় তাহার অসীম বিশ্বাস ছিল—তাই মনে মনে কাহাকেও দোষ দিল না—কাহারও নিন্দা করিল না। সে লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজকর্ম্ম জানিত না—জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিল না। এই বুদ্ধিভ্রংশের অবস্থায় সে নেশার ঝোঁকে এক মারাত্মক ভুল করিয়া বসিল।

মা বাঁচিয়া থাকিতে একদিন তিনি শপথ দিয়াছিলেন

বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। একদিন এই শপথ সে ভুলিয়াছিল—অমনি কোথা হইতে কি হইয়া গেল! তিনদিন এক গঙ্গাযাত্রীর নাড়ি ধরিয়া সে ত্রিবেণীতে বসিয়াছিল—বিরাজ তখন ঘরে একাকী জ্বরে ভুগিতেছে—তবুও সে নিরুপায়ের অনুরোধ এড়াইয়া চলিয়া আসিতে পারে নাই। কিন্তু এই তিনদিন অবিরত গাঁজা খাওয়ার ফলে নীলাম্বর আর প্রকৃতিস্থ ছিল না। বাড়ী ফিরিয়া অন্ধকার রাত্রে স্ত্রীকে ঘরে না পাইয়া বহুদিন-বিস্মৃত এক সন্দেহ অকস্মাৎ তাহার বুকের ভিতর মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। বিরাজ ও অতিরিক্ত অভিমানিনী—সে তাহার অনুপস্থিতির কোন সদুত্তর দিতে চাহিল না। নীলাম্বর পানের ডিবা ছুঁড়িয়া মারিল—দেখিতে দেখিতে রক্তে মুখ ভাসিয়া গেল। বিরাজের আত্মসম্মানবোধ অতিশয় তীব্র ছিল। এই আঘাত last straw on the camel's back হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, এই এক বছর যাই যাই কর্‌ছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি নি। চেয়ে দেখ দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখ্‌তে পাইনে, এক পা চল্‌তে পারিনে—আমি যেতুম না; কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নীচে মরবার লোভ আমার সব চেয়ে বড় লোভ, সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়্‌তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম।" ইহা অপেক্ষা আর কোন করুণ-কাহিণীর করুণতর বর্ণনা পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না।

বিরাজ ত চলিয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নিরক্ষর মূর্খ গোঁয়ার নীলাম্বর তাহা লইয়া হৈ চৈ বাধাইয়া কুরুক্ষেত্র করিল না—ইহার জন্য বিরাজকে মনে মনে এক বিন্দুও দোষ দিল না। অত্যন্ত ব্যথার সহিত অন্তর্য্যামী ঠাকুরের পায়ে নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'সে যখন এতটুকু অপরাধ করে নি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে আর তাকে দুঃখ দিও না।' যখন জানিতে পারিল বিরাজ মরে নাই, কুলত্যাগ করিয়াছে, তখনো তাহাকে অপরাধী করিতে পারিল না। মনে মনে এই কথাই বলিতে লাগিল যে, সে যাহা করিয়াছে ক্রোধের বশে জ্ঞান হারাইয়াই করিয়াছে, 'দেহে তখন তার প্রাণ ছিল না, ভাল করে জ্ঞান বুদ্ধি হবার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল।' আর তাহার উপর আমি যে অত্যাচার, যে অপমান করিয়াছিলাম তাহা সহ্য করিতে বোধ হয় স্বয়ং নারায়ণও পারিতেন না—সে ত মানুষ। ইহাই আকাঙ্ক্ষাহীন ক্ষমার অপ্রমেয় মহিমা, ইহাই গভীরতম প্রেমের অনির্ব্বচনীয় হীরকদ্যুতি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ইহাকে হয়ত নিস্পৌরুষ আখ্যায় অভিহিত করিবেন।

তাই তারকেশ্বরের পথে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত পরপারের যাত্রী মুমূর্ষু বিরাজের ভঙ্গুর দেহখানি যখন দৃষ্টিগোচর হইল তখন নীলাম্বর একবার দ্বিধা করিল না, ইতস্ততঃ করিল না, 'স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাসার দিকে চলিয়া গেল।' মনে মনে এই কামনাই করিতে করিতে গেল যে 'নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম—ভগবান করুন যেন পরজন্মেও তাকে পাই।'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে। নীলাম্বর এই রকম করিয়া বুঝিয়া ঠকিয়াছিল কিনা একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ যে মনে মনে তাহাকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত এ কথা নিঃসন্দেহ। তাই দাসী সুন্দরী পর্য্যন্ত তাহার নামে অপবাদের ইঙ্গিতটুকু সহ্য করিতে পারিল না, তাহার ভালবাসার লোককে বলিয়া বসিল, 'বরং তোমার মুখ? মলে পুড়বে না, আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।' ঐ নীলাম্বরের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের তেজ বিদ্যমান ছিল, তাই সুন্দরী বলিয়াছিল, 'বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না, যেন আগুন জলচে।' শিল্পীর কথায় এক একটি আঁচড়ে নীলাম্বরের চরিত্র যেন পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় দল খুলিয়া খুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর বিরাজবৌ। একটা কীর্ত্তন গানে শুনিয়াছিলাম, 'প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর'—বিরাজের স্বামীপ্রেম ঐ ধরণের। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিরাজের প্রেমের সব চেয়ে বড় কথা, 'তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি।

নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাওনা যে আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?'

এই বিরাজের সতীত্বের বড় অহঙ্কার ছিল। একদিন লীলাচ্ছলে বলিয়াছিল, 'অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখ্‌তে সাধ হয় তারা কি রকম।' আরও বলিয়াছিল যে সতীত্বে সাবিত্রীই হউন বা আর যেই হউন কাহারও চেয়ে সে এক তিল কম নয়। বিধাতা তাহার এ দর্প সহ্য করেন নাই। তাই তাহাকে অসতীর কলঙ্ক-কালিমায় লাঞ্ছিত হইতে হইল। কিন্তু এত বড় দর্পিত সতীকেও কি কারণে বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে পা বাড়াইতে হইল তাহা বুঝিতে হইলে বিরাজের সেই সময়কার মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করা আবশ্যক।

তিন দিন জ্বর ভোগের পর বিরাজ তখন ক্ষুধায় আকুল। জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে জ্বরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্পা স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া রাখিয়া নীলাম্বর পরোপকারে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ঘরে আসিয়া অভুক্ত থাকিবে স্মরণ করিয়া বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁড়ালের বাড়ী চাল ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া আসিলে সন্ত গৃহপ্রত্যাগত গঞ্জিকা-রক্তচক্ষু স্বামী অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। তর্ক বিতর্কের ফলে স্বামী তাহাকে মারিয়া বসিলেন—তখন তাহার জ্বর বিকারে দাঁড়াইয়াছে। সেই বিকারের ঝোঁকে কেবল মনে হইতে লাগিল, স্বামী বলিয়াছে—তাহার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে না। এই চিন্তার পাশাপাশি কে তাহার ছোঁয়া জল খাইলে ধন্য হইয়া যাইবে তাহার কথাও মনে পড়িল। যেমন চিন্তা অমনি কাজ। তাহার পর সমস্ত ঘটনাটা ছায়াচিত্রের মত তাহার Subconscious mind এর সামনে enacted হইয়া গেল—তাহাতে সে যেন কোন Party নয়। যে মুহূর্ত্তে এই বিকারের ঝোঁক কাটিল সেই মুহূর্ত্তেই অতল জলে ঝাঁপ দিল। কোথায় ঝাঁপ দিতেছি, এখানে কত জল, মরিব কি বাঁচিব এ চিন্তা একবারও মনের মধ্যে উদয় হইল না।

এই বিরাজ অসামান্য সুন্দরী ছিল, কিন্তু তবু সে তাহার রূপকে কোনদিন বড় করিয়া দেখে নাই। বলিয়াছিল, "রূপ রূপ, রূপ। শুনে শুনে আমার কাণ ভোঁতা হয়ে গেল। * * এইটেই কি আমার সব চেয়ে বড় বস্তু?" রূপটাই যে বিরাজের বড় বস্তু নয় গ্রন্থকার তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

তাহার পর ছোট বৌ এর কথা। এমন একটি মধুর চরিত্র কদাচিৎ চোখে পড়ে। একদিনের যে মার বিরাজ সহ্য করিতে পারিল না সেই মার প্রত্যহ তাহার ভাগ্যে জুটিত। কোনদিন তজ্জন্য সে তাহার স্বামীকে দোষ দেয় নাই। বরঞ্চ যেদিন বিরাজ এই মারের কথা জানিতে পারিয়াছিল সেদিন পাছে সে কোনরূপ শাপ সম্পাত করে এই ভয়ে স্বামীর হইয়া সে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'যে দেবতা ওর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন তিনিই মাপ করবেন।'

এই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজা বিরাজকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত! গ্রন্থকার একটি লাইনে তাহার চরিত্রের চাবি উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন, 'চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।' ছোট বৌ এর স্বভাবে বিনয় বস্তুটি আশ্চর্য্য রকমের পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বিরাজের সঙ্গে সে নিজেকে কোনদিন তুলনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। বলিয়াছিল, 'কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কই নি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই।' কিন্তু প্রত্যেকটি বিপদের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে এবং সে তাহার যথাসাধ্য করিয়াছে—ফল হয়ত সব ক্ষেত্রে হয় নাই। কিন্তু এই যে কোমল প্রকৃতির মাটীর মানুষ, কর্ত্তব্যক্ষেত্রে এও ইস্পাতের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজকে একদিন কথা দিয়াছিল, দুই ভাইয়ে মিল করিয়া দিবে। বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া যেই শুনিল, দিদি নাই অমনি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। ভাসুরের ভার সে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিল। পীতাম্বর কহিয়াছিল, 'দাদার সঙ্গে কথা কও শুনলে লোকে নিন্দে করবে যে।' উত্তরে স্বল্পভাষিণী বলিয়াছিল, 'লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি লোকের নিন্দা আমি মাথায় পেতে নেব।'

বিরাজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল অচলা—এই বিশ্বাস তাহার নারায়ণ। ইহারই জোরে বিরাজ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ ধাঁধাঁর জড়িমা ছিল না। তাই যখন

সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইল ছোট বৌ যাইতে চাহিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারবো না, বাবা। * * * স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরার বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিস্ফল হতে পারে না। সতী লক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব -আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না, বাবা।' এইখানে ছোট বৌ ভালবাসায় নীলাম্বরকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

আজকাল আমরা সকল সৃষ্টির মধ্যেই moral খুঁজিয়া বেড়াই। শরৎচন্দ্রের অবদান এদিক দিয়াও সামান্য নহে। মাতৃপিতৃহীনা ছোট বোন পুঁটির উপর নীলাম্বরের যে স্নেহ বর্ষার অফুরন্ত ধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়াছে, নিঃসন্তান বিরাজ-বৌ নিজের বুকের সমস্ত মাতৃস্নেহ দিয়া যেরূপ সন্তর্পণে তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, এই সমস্ত উপাখ্যান যদি আমাদের দুঃখ দৈন্য পীড়িত পারিবারিক জীবনকে মধুর করিয়া তুলিতে না পারে তবে যে আর কিসে পারিবে তাহা আমার জানা নাই। পরিশেষে ছোট ভাই পীতাম্বর যখন সর্পদষ্ট হইয়া নীলাম্বরের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কোন ঔষধপত্র চাই না, দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচতেও চাইনে" সেইদিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল। এই ভ্রাতৃস্নেহ-পূত অশ্রু যদি আমাদেরও চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরাইতে সমর্থ না হয় তবে আর কিসে পারিবে?

শরৎচন্দ্রের গল্প বা উপন্যাস যে সকলকে মুগ্ধ করে না তাহার কারণ আমার মনে হয় তাঁহার লেখার আবেদন পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির (intellect) কাছে নয়, তাহার রসবোধের কাছে। যাঁহারা অতিমাত্রায় intellectual, তাঁহাদের খোরাক হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে শরৎ-সাহিত্যে মিলে না, কিন্তু যাঁহারা জীবনে দুঃখের এবং নিরাশার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া সোনা হইয়াছেন তাঁহারা এই সাহিত্যে এমন এক রসস্রোতের সন্ধান পাইবেন যাহা সত্য সত্যই অভিনব এবং অমূল্য।

শরৎচন্দ্রের ভাষার এবং ভাবের সংযম অসামান্য একথা সকলেই জানেন। এখানে তাঁহার একটা লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, 'সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো এক মুহূর্ত্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোট বৌ তেমনি করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল।' সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই অভিব্যক্তি, এতটুকু আতিশয্য ইহাতে নাই। এই সংযম বা সংহত শক্তি ব্যতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অসম্ভব। ইহাকেই ম্যাথু আর্নল্ড austerity বলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রকে যদি কেহ দুষ্কৃতিপ্রচারক বলিয়া মনে করেন তবে তিনি ভুল করিবেন। অপরপক্ষে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র খুব বড় taskmaster. বিরাজ বৌ-এর ঐ পদস্খলনের জন্য তিনি তাহাকে বড় কম সাজা দেন নাই। তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল—সুন্দর মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া যদি বা নীলাম্বরের সাক্ষাৎ মিলিল ত সে কেবল তাহার পায়ের তলায় মরিবার জন্যই—তখন আর বড় বাকি নাই। এই রকম করিয়া হতভাগীর এ জন্মের সব সাধ ফুরাইল—দাবী রহিল কেবল জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবার। এই বিষয়ে শরৎচন্দ্র Victor Hugoএর সহিত তুলনীয়। তিনিও Jean Valjeanএর এক টুকরা রুটি চুরি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—Esmeraldaএর মায়ের পতিত জীবন ক্ষমা করিতে পারেন নাই, যদিও সে বেচারী দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর অনুতাপ করিয়া কাটাইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' গল্পোপন্যাস পাঠ করিবার পর এবং আমার এত কথা বলিবার পরও যদি কাহারো মনে সন্দেহ বিদ্যমান থাকে যে বিরাজবৌ সতী কিনা, তবে তাঁহাকে একটা কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। হিন্দুর বিবাহ এক জন্মের নহে—তাহা যুগ-যুগান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের। বিরাজ বৌএর বিচার দুটো দিনের ব্যবহারের উপর করা চলে না। তাহার বিচার কল্পান্তের কালমেখলার তরফ হইতে, ভগবানের বুকের নিকষমণির তরফ হইতে!

—:০:—

তুমি কাঁদো-আর-আমি কাঁদি

শ্রীকুমুদভট্টাচার্য্য

তুমি কাঁদো সখি, কেন কাঁদো তাহা বুঝিতে কতক পারি,
তোমার কাঁদনে শুকালো সহসা শিশির-শীতল-বারি !
অকাল গ্রীষ্ম দিলো এসে দেখা,
সহিছো সে জ্বালা শুধু একা একা ;
উদ্গত নব পল্লবদল তরুণ তরুর কোলে—
না ফুটিতে ফুল—না ধরিতে ফল—ঝরিয়া পড়িলো তলে !

মাগো তুমি কাঁদো, কেন কাঁদো জানি, না কেঁদে উপায় কী বা ?
জীবনে তোমার এলো বিভাবরী শেষ না হইতে দিবা !
নয়নের আলো, আলোকের খনি,
সুখভরা বুক, বুক-চেরা মণি—
একে একে সব—কেমনে কে জানে—আঁধারে লুকালো গিয়া,
কী যে হোয়ে গেলো নিমেষের মাঝে—কিছু না বুঝিতে দিয়া !

বন্ধু তোমার বেদনার কথা কী আর কহিবে মোরে ?
জানি, জানি সখা, কী অসহ দুখে নয়নে অশ্রু ঝরে !
যাহা চেয়েছিলে, পাও নাই তাহা—
দুখে কেহ তব বলে নাই, আহা !—
হেসেছিলো সবে সুখের আসরে—দুখের বাসরে কেহ
আসে নাই কাছে, জ্বালায়নি বাতি—সঙ্গীবিহীন গেহ !

আমি কাঁদি সখি, আমি কাঁদি মাগো, কাঁদি হে বন্ধু মোর !—
নাহি জানি, কেন !—কেন যে নয়নে বহে এ অশ্রুলোর !
কেন কাঁদি—পাছে বলিবারে নারি
লুকাইয়া তাই কাঁদি অনিবারই,
আপন কাঁদনে ভয় পাই—কেহ সান্ত্বনা দায় পাছে,
কারণ-বিহীন কান্না যে তা'র সান্ত্বনা কোথা আছে ?

তবু-অকারণ কান্নার মোর কারণ জানাতে নারি—
দুঃসহ হোয়ে এই ব্যাথা মোর বক্ষে বাজিছে ভারি।
তোমার বেদনা আমি বুঝি—জেনো,
তাই মনে কোরে সান্ত্বনা মেনো,
আমার বেদনা বুঝিবেনা কেহ—সহজ তো তাহা নয় !
হাজার বেদনা জড়ায়ে কোরেছি বক্ষ গ্রন্থিময় !

দিব্‌ আন-ই-হাফিজ

(মূল ফার্সী হইতে অনূদিত)

মৌঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, এম, এ,

১। হে সাকী, শরাবের ঔজ্জ্বল্যে আমার পেয়ালা উজ্জ্বল কর, ওগো গায়ক পৃথিবীর কার্য্য আমাদের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয়!

২। আমরা যে পেয়ালার মধ্যে প্রিয়তমের আননের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি, ওগো আমাদের শরাব-সুধা-বঞ্চিত বেখবর বন্ধুদল।

৩। সুন্দরী রমণীর আঁখি ইসারা ও লাস্যলীলা কতইনা রহস্য করিয়াছিল,—দেবদারু তুল্য সুঠাম দেহ-বান আনন্দ পরায়ণা নৃত্যশীলা না হওয়া পর্য্যন্ত।

৪। কখনই সে ব্যক্তি মরে না যাহার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ রহিয়াছে। চিরতরে আমাদের নাম 'লউহমাহ্‌ফুজে' লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

৫। আমাদের হৃদয় হরা হৃদয়রাণীর নিকট মত্ততা আনন্দোৎপাদক, এইজন্য আমাদের হাত হইতে মত্ততার রশ্মি ছাড়িয়া দিয়াছি।

৬। আমাদের ভয়, রোজ কিয়ামতের দিন সাধুর হালাল শুষ্করুটী আমাদের হারাম পানির (মদের) উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

৭। ওগো বাতাস, যদি তুমি বন্ধুর বাগানের পাশ দিয়া গমন কর, তবে নিশ্চয়ই আমাদের কথা আমাদের প্রিয়তমের নিকট পৌঁছাইয়া দিও।

৮। যদি আমাদের নাম সুন্দরই হয় তবে ভুলিয়া গিয়াছ কেন? সেইদিন আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে যেদিন তুমি আমার কথা ভুলিয়া যাইবে।

৯। লালা ফুলের হৃদয় সর্ব্বদা দেবদারু তরুর ছায়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে; হে অদৃষ্ট পাখী কোন সময় তুমি আমার প্রেমের জালে বন্দী হইবে?

১০। আকাশের সবুজ সাগর ও রাকাচন্দ্রিমা-তরী, হাজী কায়ুমের সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

১১। হাফিজ আঁখি হইতে অশ্রুদানা নিক্ষেপ করিতেছে (ক্রন্দন করিতেছে) হয়ত সৌভাগ্যক্রমে মিলন-পাখী আমাদের জালে বন্দী হইতে পারে।

রক্ত করবী

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

হে কবি নমি বার বার।
তোমার পিণাক-মন্দ্রে যে রুদ্র সঙ্গীত আজি
করিলে টঙ্কার;
তারে নমস্কার।
মিথ্যা, দম্ভ, সঞ্চয়ের কলুষতা মাঝে
তোমার মুক্তির সুর যুগে যুগে গেহে গেহে বাজে।
তারই মাঝে ফুটিয়াছে বিজয়-গরবী
মুক্তির আনন্দ-গানে জয়ধ্বজা রূপে
এ 'রক্ত-করবী'।

চক্রের ঘর্ঘর রবে, সঞ্চয়ের সৌধকারায়
এ জগৎ যবে মুহ্যমান,
তোমার 'রঞ্জন', 'বিশু', 'নন্দিনী', 'কিশোর'
গাহে শুধু করবীর গান।
নহে শ্বেত, প্রস্ফুটিত শান্তির প্রতীক—
নহে সেত কবি
বিদ্রোহের পথে পথে বিজয়ের রথে
ফুটে ওঠে যুগে যুগে এ রক্ত করবী।
মনে পড়ে ঃ—

সঞ্চয়ের বন্ধন মাঝে
মমতারে করি খান খান
কোন সে রাজার ছেলে এনেছে নির্ব্বাণ
কবে কোন অতীত গুহায়
হর্ম্ম্য-গাত্রে প্রস্তরের স্তূপে,
তোমার রঞ্জন-বিত্ত রাজর্ষির রূপে
চুপে চুপে রেখে গেছে এ রক্ত করবী।
হে কবি
আজও বুঝি ভুলে নাই
রঙ্গভরা এবঙ্গ দেশ
মৃদঙ্গ, মন্দুরা-রবে যে সুরের রেশ
কাঁপাইয়া পঙ্গুজড়ে অন্দর প্রাঙ্গন
এনেছিল তোমার 'রঞ্জন'।

হে 'চন্দ্রা', 'মোড়ল', 'গোকুল'
নির্ব্বিদ্রোহ, পঙ্গুজড় হে মানব কুল,
দৈত্যরূপী হে যন্ত্ররাজ
তোমার দম্ভের লীলা মনিময় তাজ
শেষ কর আজ।
আকাশ আজিকে ক্ষুব্ধ
বেদনার অস্ফুট চীৎকারে
বন্ধনের অন্ধ কারাগারে
উঁকি কিগো দেবেনাক রবি?
হাসে কবি,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলে—
ঐ দেখ বিজয়-গরবী
বিমুক্ত আকাশতলে সদ্য ফোটা একখানি
আরক্ত করবী।

কুলীর প্রাণ

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

সারাদিন খাটুনীর পর দুখুয়া তার কুটীর দুয়ারের তালা খুলিয়া ডাকিল "লছমী।" ছোট একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা কুটীরের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার কালো নিটোল শরীরটি সর্ব্বাঙ্গ কাদায় লিপ্ত, কোঁকড়া চুলগুলি যত্নাভাবে জট্ পাকাইয়া গিয়াছে। চোখদুটী আনন্দে বিস্ফারিত করিয়া একগাল হাসিয়া সে বাপের কোলে লাফাইয়া পড়িল। দুখুয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কন্যাকে কোলে টানিয়া লইল, খানিক পরে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। লছমী বলিয়া উঠিল "বাপজান, তুই এইখেনে বোস্, আমি তোর জন্য ডাল ভাত বানিয়ে রেখেছি আনি "বলিয়াই দৌড়িয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দুখুয়াও কন্যার অনুসরণ করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুটীরের অবস্থা দেখিয়া চোখ দু'টী ছল ছল করিতে লাগিল। সে দেখে চারিদিকে মাটী, জল, বালু, ইট পড়িয়া আছে, এক কোণে একরাশ জঞ্জাল, বিছানাটা কাদাময়। লছমী এই সকল সরঞ্জাম দিয়াই বাপজানের জন্য ডাল ভাত বানাইয়া রাখিয়াছে।

মোটে মাস দেড়েক হইয়াছে লছমীর মা তাহাকে ছাড়িয়া কোন অজানা দেশে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে দুখুয়ার কুটীরের উজ্জ্বল দীপটী চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে। ছোট মেয়েটীকে লইয়া সে যে কত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তা সেই জানে। চা বাগানের কুলী সে, রোজ সকাল আটটার সময় কামজারীতে যাইতে হয়। তারপর সারাদিন কাজের পর ছুটী হয় বিকাল পাঁচটায়। ভোরে উঠিয়া দুখুয়া চারটী চাল সিদ্ধ করিয়া নিজে খায় ও ঘুমন্ত লছমীর জন্য কিছু ঢাকা দিয়া রাখিয়া দরজায় চাবি মারিয়া কাজে চলিয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া তালা খুলিয়া সে রাঁধে, বাড়ে; তারপরে লছমীকে বুকে লইয়া গান গায়, গল্প করে, বাঁশী বাজায়। এই রকমে এই দেড়টী মাস তাহার কাটিয়াছে। হায়রে!

লছমীর মা থাকিতে তো তাহাকে কোন বিষয়ে ভাবিতে হইত না। যত জ্বালা, যন্ত্রণা দুঃখ সে তাহার কোমল হাত দিয়া কাড়িয়া লইত। কত সুখী ছিল সে তখন।

সেইদিন তার বাস্তবিক অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। সে কোনমতে চখের জল ধরিয়া রাখিয়া লছমীর কাদা বালি ধোয়াইয়া দিল। সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার করিয়া উনুন জ্বালিল। ততক্ষণে লছমী সারাদিনের পর ছুটি পাইয়া বাহিরে খেলিতে গিয়াছে, আর জ্বলন্ত আগুনের উপর ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দুখুয়া একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, আর কতদিন এমন ভাবে চলিবে? কি করিলে তাহার এ দুরবস্থা দূর হয়? তবে কি রামলালের বালবিধবা কন্যা মনিয়াকে লছমীর মায়ের পদে আনিয়া বসাইবে? তাহলে একটা সুরাহা হয় বটে। কিন্তু বাপ্‌রে! সে যদি লছমীকে অযত্ন করে। সে দিন আর তার মনে কোন কাজ বসিল না। ভাত খাইয়া লছমীকে লইয়া যখন বসিল, তখন সে বাঁশী, গান বা গল্প কিছুই জমাইতে পারিল না। লছমী আপন মনে বকিতে বকিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কয়েকদিন পরে কামজারীতে দুখুয়া দেখিল মণিয়াকে। তার যেন ভরা যৌবন, সারা অঙ্গে লাবণ্য খেলিয়া যাইতেছে। রামলালের অবস্থা কুলী লাইনের ভিতর ভালই ছিল; সেইজন্য একমাত্র কন্যাকে সে সৌখিনী করিবার বহু জিনিস দিত। মণিয়ার হাতে, পায়ে, গলায় রূপার গহনার রুনু ঝুনু বাজিত। পরিষ্কার কাপড়টাও পরিত। শোনা যায় সন্ধ্যার সময় অদূরে ছোট নদীতে সুগন্ধি সাবান লইয়া স্নান করিতে যাইত, আর চুলেও তার সর্ব্বদা সুগন্ধি তেলের সন্ধান মিলিত। এহেন মণিয়াকে তার বাপ দুখুয়ার সহিত বিবাহ দিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি সে স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া কিছু দোমনা করিতেছিল। কামজারীতে মণিয়ার সঙ্গে দুখুয়ার দেখা হইলেও দুখুয়া এতদিন তাহাকে প্রাণের ভিতর আনে নাই। আজ কিন্তু একবার দেখিয়া বার বার দেখিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তাই সে কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে মণিয়ার দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। মণিয়া একবার আড় চোখে দুখুয়াকে দেখিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। এবং অদূরে চাঘরের ছোটবাবু দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে কটাক্ষ হানিয়া, টুক্‌রী লইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রে রামলাল তার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল "দেখ, মণিয়া বড় হয়ে গেছে, তার তো আর একটা সাদি দিতে হয়।"

মণিয়ার মা ঝঙ্কার দিয়া বলিল "মর মিন্সে, এতদিন পর বুঝি তোর চোখ ফুটেছে? আমি তো কতদিন থেকে তোকে বলছি, তা আমার কথা কি আর শুনিস?"

এইবারে সত্যি আমার চোখ ফুটেছেরে" বলিয়া রামলাল একটু স্বর নিচু করিয়া বলিল "আর দেখ্‌ছিস তো, ছোটবাবুর নজর বড় ভাল না; আর মণিয়াটাও দেখছি ছোটবাবুর কাছে কাছে থাকতে চায়—হ্যাঁ, আর এক কথা; সেদিন মণিয়া বাঙ্গালী বড় বাবুদের গায়ে দিবার সাবুন একবাক্স কোত্থেকে এনেছেরে?"

মণিয়ার মা একটু ভাবিয়া বলিল, "ছুঁড়িটে ভারি পাজি হয়েছে। সে বল্লো, তার হাজিরার পয়সা থেকে কিনে এনেছে, তা আমার তা মনে হয় না। সে তো সব সময় তেল সাবান, ভাল ভাল পানে খাবার খইনি নিয়ে আসে।"

রামলাল বিরক্ত হইয়া বলিল "হুঁ, কালকেই আমি দুখুয়ার কাছে যাবো। ছেলেটা দেখতেও ভাল যোয়ানও আছে, তুই কি বলিস্? ওরই সঙ্গে সাদির কথাটা ঠিক করে আসি।"

মণিয়ার মা সানন্দে বলিল "দুখুয়াকে আমি আমার ছেলের মত ভালবাসি। তার মার সঙ্গে আমার কত সইয়ালি ছিল। বেশ তো, ঐখানে গিয়েই কাল মণিয়ার সাদি ঠিক করে আয়, সে বোধহয় অরাজি হবে না।"

এর পরে কয়েক দিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রামলাল বিবাহের প্রস্তাব লইয়া দুখুয়ার কাছে যাইতে পারিল না। এই অবসরে দুখুয়া মণিয়াকে রোজই দেখিত ও প্রশংসান্তরে তার দিকে চাহিয়া থাকিত। মণিয়ার হাসি, মণিয়ার কাজ মণিয়ার হাঁটা সবই তার চোখে ভাল লাগিত। মণিয়া কিন্তু দুখুয়ার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রুপ করিয়া হাসিত ও ছোটবাবুকে ইসারায় তাহা জানাইয়া দিত।

চা বাগানের বড় ছোট টিলা, তাঁর উপর সারি সারি চা গাছ। টিলার নীচে মাইল জুড়িয়া চল অর্থাৎ সমতল ভূমি

সেখানেও রাশি রাশি চাগাছ। কুলীরা সকলে কাজে ব্যস্ত। কেহবা কোদালী করিতে করিতে, কেহ বা পাতি তুলিতে তুলিতে আপন মনে গান গাহিতেছে, কেহ বা এতটুকু বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছে, আর মাঝে মাঝে সর্দার ও বাবুদের শাসনের চোটে চমকিয়া যে যাহার কাজে মন দিতেছে। মণিয়ার কাজ যেমন তেমন হউক সে প্রমোশন পাইয়া এখন ভাল পাতিওয়ালীদের ভিতর স্থান পাইয়াছে, তার হাজরীও বাড়িয়াছে।

এমন সময় একদিন ছোটবাবু দূর হইতে ইসারা করিয়া একটা বড় গাছের আড়ালে লুকাইলেন। মণিয়া তার টুক্রী তাড়াতাড়ি ভরিয়া ওজন দিবার ছলে চা-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সে গাছের পাশে যাইতেই তার আঁচল টানিয়া ধরিয়া ছোটবাবু তাহাকে থামাইতে, মণিয়া হাসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া টুক্রীটা নামাইয়া রাখিল। অন্যান্য কথার পর ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যাঁরে ও ছোক্‌রা তোর দিকে চেয়ে থাকে কেন?' মণিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'জানেন না বাবু, ওর সঙ্গে বাবা আকার সাদি দিতে চায়।"

বাবু উত্তর শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, 'সত্যি না তামাসা করছিস্? না, তুই ওটার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা চালিয়েছিস্?"

মণিয়া সরলতার ভান করিয়া বলিল, "না বাবু আমি হাসি ঠাট্টা করব কেন? আমি আপনারই সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করি, তাতেই আমার বাপ মা কত রাগ করে।"

বাবু বলিল, "তাহলে সত্যি বিয়ে হবে?"

মণিয়া দুঃখের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাতো হবে বাবু, বিয়ে একটা হওয়া ভাল কিন্তু।'

ছোটবাবু গদ গদ হইয়া স্থান কাল ভুলিয়া মণিয়ার একটী হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কিরে মণিয়া?"

মণিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আপনাকে ভুলতে পারব না বাবু। আর ওটা একটা জানোয়ার, ওর চোখে ধুলা দিয়ে আমি এখন যেমন দেখা করি সেই রকম সাদির পরেও রোজ দেখা করবো—ঐ কে এদিকে আসছে, আমি যাই।' বলিয়া মণিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ছোটবাবু তখন অত্যন্ত গভীর প্রেমে নিমজ্জিত। মণিয়ার রূপ ধ্যান করিতে করিতে নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

সেদিন কুটীরে ফিরিয়া দুখুয়া নিত্য নৈমিত্তিক যেমন চাবি খোলে তেমনি চাবি খুলিয়া লছমীকে ডাকিল, কিন্তু আজ ছোট সুন্দর মুখটী তুলিয়া মেয়েটা আসিয়া বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল না তো। অমঙ্গল আশংকায় দুখুয়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে একনিশ্বাসে ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া দেখে মাটির উপর লছমী পড়িয়া আছে, কপালে হাত দিয়া দেখিল আগুনের মত গরম। দুখুয়া বুঝিল খুব বেশী জ্বরে লছমী বেহুঁস হইয়া গিয়াছে। দুখুয়ার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে দুইহাতে লছমীকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে তুলিয়া নিল। নাঃ মেয়েটীর কষ্ট আর দেখা যায় না। দুখুয়া সঙ্কল্প করিল আজই সে রামলালের কাছে মণিয়াকে ভিক্ষা করিতে যাইবে।

দুখুয়াকে আর যাইতে হইল না, রামলাল নিজেই কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাজির হইল। ইহার সাতদিন পরে একদিন দুখুয়ার সহিত মণিয়ার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে রামলাল বেশ খরচ করিয়াছিল, মেয়ে জামাইকে দিবার বেলায় কিছু কার্পণ্য করে নাই।

বিবাহের পর কয়েকদিন মণিয়া বেশ সংসার চালাইল। সে লছমীকে যত্ন করিত, রান্না করিত, খাওয়াইত, দুখুয়ার সঙ্গেও ব্যবহার নেহাৎ খারাপ করিত না। যাহোক, দুখুয়া সরল ভাবে মণিয়াকে খুব ভাল বাসিয়া ফেলিল। এমন কি সে আস্তে আস্তে লছমীর মায়ের স্মৃতিটাও ভুলিতে বসিল বুঝি! মণিয়ার ঘর সংসারে মনোযোগী হবার কারণও ছিল বেশ, কারণ ছোটবাবু কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা আদিষ্ট হইয়া মাস খানেকের জন্য স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল। একথা সে মণিয়াকে গোপনে জানাইয়া গিয়াছিল। মণিয়া কিন্তু ছোটবাবুর আগমনের তারিখ ভুলিয়া যায় নাই, ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে সে ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে টুক্‌রীটি তুলিয়া লইয়া কামজারিতে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া দুখুয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুই কোথায় যাবি?"

মণিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "কামজারীতে যাবো। দুইজনে রোজগার করলে কতটা পয়সা হয় বলতো?"

দুখুয়ার কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল, "নারে মণিয়া, তোর খাটুনির পয়সা আমি চাই না। তুই ঘরে বসে থাক্ তোকে আর লছমীকে আমি আমার জান দিয়েও খাওয়াবো।"

মণিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"না না ঘরে ব'সে আমার ভাল লাগে না"—তারপর মোলায়েম স্বরে হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া সারাদিনটা তোকে না দেখে প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে, তবু সেখানে গেলে তোকে তো দেখ্‌তে পাবো।"

দুখুয়া এবারে বলিল, "তবে লছমী?" মণিয়া লছমীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ওকে গাছের নীচে বসিয়ে রাখবো। সারাদিন ঘরে বন্দ হয়ে থাকে, ওখানে আর পাঁচ-জনের ছেলেদের সঙ্গে খেলবে এখন।"

দুখুয়া আর আপত্তি করিল না। সেইদিন হইতেই দুর্ভাগ্য সাথী হইল। দুখুয়া ঘরে ফিরিয়া আসে কিন্তু মণিয়ার ফিরিতে দুই এক ঘণ্টা দেরী হয় রোজ। কোনদিন মাঠে মণিয়া লছমীকে দুখুয়ার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বলে 'তার কাজ এখনো শেষ হয় নাই, তার ফিরিতে দেরী হইবে।'

দুখুয়া মনে মনে বিরক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল! মণিয়া আজকাল প্রায় অন্যমনস্ক থাকে এবং সে লক্ষ্য করিয়াছে আজকাল প্রায় মণিয়ার গায়ে ও মাথায় সুগন্ধ ও পরণে দেশী সাড়ী থাকে। দুখুয়া যদি জিজ্ঞাসা করে "এসব কোথায় পেলিরে মণিয়া?"

মণিয়া মুখ ভার করিয়া বলে, "কেন? আমার কি পাবার কোন জায়গা নেই?"

এমনি করিয়া কিছুদিন চলিয়া গেল। দুখুয়ার মনে সন্দেহের রেখাপাত হইল। সে নজর দিয়া দেখিয়াছে ছোটবাবুর চোখের চাউনি আর মণিয়ার হাসি। সে দেখিয়াছে মণিয়া পরিপাটি করিয়া পান সাজিয়া লইয়া যায়। সে আরো দেখিয়াছে ছোটবাবুকে অনুসরণ করিয়া মণিয়াকে গাছের আড়ালে লুকাইতে। সে ঠিক করিয়া রাখিল, একদিন ধরিবে তারপরে অবস্থা বুঝিয়া ব্যাবস্থা করিবে।

ইদানিং মণিয়ার চরিত্রে উন্নতি দেখা দিয়াছে। এক-দিন রাত্রে হঠাৎ দুখুয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, পাশে চাহিয়া দেখে মণিয়ার স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। দুখুয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর বাহির খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু মণিয়ার সাড়া পাইল না। সে বাহিরে আসিয়া হঠাৎ কিছুদূরে অন্ধকারের ভিতর একটি চলতি আলোর গোলা দেখিতে পাইয়া কুটীরের দরজাটা ভেজাইয়া আলো লক্ষ্য করিয়া যেমন ছুটিতে যাইবে এমন সময় লছমী "বাপজান"—বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুখুয়া তার উদ্যত গতির উদ্যোগ থামাইয়া খানিক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, আলোর গোলার সঙ্গে একটা লম্বা লোক ও তার পাশেই একটা স্ত্রী মূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে।

দুখুয়ার দুই চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, সে বুঝিল ঐ দুই মূর্ত্তি একটা ছোটবাবুর বাসার চৌকিদার ও আর—আর একটা তারই স্ত্রী মণিয়া আস্তে আস্তে তাহারা ছোটবাবুর বাসার দিকে চলিয়া গেল।

দুখুয়ার চোখ দুইটা রাগে জল জল করিয়া উঠিল। সে নিরুপায় ভাবে দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। লছমীর বিছানার কাছে গিয়া লছমীকে বুকে টানিয়া লইল, যেনো জ্বলিয়া ওঠা বুকটা ঐ এক ফোঁটা জল বিন্দুতে ঠাণ্ডা করিতে চায়।

লছমী বাপের এ রকম ভাবের উচ্ছাস দেখিয়া অবাক হইয়াছিল। সে বলিল, "বাপজান, আমি মার কাছে যাবো।"

দুখুয়া চাপা আর্ত্তনাদে বলিল, "তোর মা নাই রে লছমী।"

লছমী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন বাপজান, ঐ তো মা আছে!"

দুখুয়া উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল। সত্যি তো সে তাকে লছমীর মা হইতেই আনিয়াছে, আর—আর সেও তো একটু ভালও বাসিয়াছে। তবে এ কি হইল, তার এত বড় সুখের স্বপ্ন কেন এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল সে মায়াবিনী। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কিন্তু লছমী তাহাকে যে মা বলিয়াছে। লছমীর মা, যে একদিনের জন্যও হইয়াছে, সে শত দোষ করিলেও লছমীর মা।

তাহার স্ত্রী বলিয়া নহে, তাহার ভালবাসার পাত্রী বলিয়া নহে, সে যে লছমীর মা! তাকে কি শাস্তি দিবে সে? যে কোনও শাস্তি শতগুণ হইয়া বাজিবে ছোট লছমীর বুকটীতে। এমন করিয়া কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে সে বুঝ্‌তে পারে নাই। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল দরজা খোলার সঙ্গে। সে

দেখিল, নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে কলঙ্কিনী মণিয়া। দুখুয়া বুঝিল লছমী এখনো ঘুমায় নাই তাই সে মণিয়াকে কোন কথা বলিল না। খানিক পরেই দেখিল, মণিয়া কাছে আসিয়া লছমীকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের অপর পার্শ্বের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

দুখুয়া কিন্তু সেইদিন হইতে মণিয়ার সঙ্গে বাক্যালাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সে আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যায় আর লছমীকে লইয়া গল্প করে। মণিয়াও গায়ে পড়িয়া কথা বলিতে আসে নাই; সেও আপন মনে গম্ভীর ভাবে নিজের কাজ করিয়া যায়।

সেদিন সারাটা দিন মেঘ করিয়াছে। মণিয়া সকাল সকাল রান্না করিয়া দুখুয়া ও লছমীকে খাওয়াইল। দুখুয়া কাজে চলিয়া যাবার সময় দেখিল, মণিয়ার সেদিন কাজে যাইবার ইচ্ছা নাই। সে তাহাকে কোন কথা না বলিয়া লছমীকে তাহার সঙ্গে যাইতে ডাকিতে লছমী তাহার ছোট কুর্ত্তাটী গায়ে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মণিয়া দাওয়ার এক প্রান্তে বসিয়া কতকগুলি ছেঁড়া কাপড় চোপড় সেলাই করিতে ব্যস্ত।

লছমী জিজ্ঞাসা করিল "মা তুই আজ কামজারীতে যাবি না?"

মণিয়া লছমীকে কাছে টানিয়া কপালে একটী চুম্বন করিয়া বলিল, "না—মা আমার শরীরটা ভাল নাই রে, তোরা যা।"

দুখুয়া অবাক হইয়া দেখিতেছিল, শয়তানীটার ভিতরে আর কারো জন্ম না হউক লছমীর জন্ম মায়া আছে।

তাহারা চলিয়া যাইবার পর মণিয়া তাড়াতাড়ি সেলাই-গুলি শেষ করিল। তারপর তাহার যা কিছু সৌখীন জিনিষ পত্র ছিল সব এক সঙ্গে একটী বাক্সে রাখিয়া বাক্সটী বন্ধ করিল। কয়েকখানি কাপড় গোছাইয়া পোঁটলা বাঁধিয়া এক পাশে রাখিল। তারপরে রান্না শেষ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বিকাল বেলা দুখুয়া লছমীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে মণিয়া উঠিয়া লছমীকে আদর করিয়া খাওয়াইল এবং দুখুয়াকেও খাবার দিল। দুখুয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল সেদিন মণিয়া বেশ পরিপাটি করিয়া দু-তিনটী তরকারী রান্না করিয়াছে।

সেদিন গভীর রাত্রে কিসের একটী আওয়াজে দুখুয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে সন্দেহ করিল হয় তো বা মণিয়া আজও ছোটবাবুর বাসার দিকে চলিয়াছে। দুখুয়া ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই মণিয়ার বিছানা খালি। সে সজোরে দরজা ঠেলিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িল, চারিদিকে অন্ধকার ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে, কোনদিকে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার নিজের কুটীরের পিছন দিক হইতে চাপা গলার ফিস্ ফিস্ আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছে মণিয়া আর তার পাশে একটী পোঁট্লা হাতে দাঁড়াইয়া আছে ছোটবাবু নিজে।

দুখুয়ার তখন রাগে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। সে ছোট-বাবুকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া মণিয়ার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল, "বটেরে শয়তানী, আজ তোকে ধরেছি, তোকে খুন করে তবে এখান থেকে সরবো। বাবু! আপনি কি রকম ভদ্দর লোক—কুলীর স্ত্রীর সঙ্গে আশনাই করতে আসেন?"

ছোটবাবু হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা তুলিতেই মণিয়া হাত দিয়া থামাইল।

মণিয়া জানিত দুখুয়ার প্রাণ খুব কোমল। সে যদি ধীর ভাবে সত্য কথা স্বীকার করে তাহা হইলে দুখুয়া হয়তো ক্ষমা করিতে পারে, নহিলে জোর জবর দস্তিতে দুখুয়ার কাছে জিতিয়া যাওয়া শক্ত ব্যাপার। তাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোকে আমি বরাবর ফাঁকি দিয়েছিরে। আমি কোনদিন পেয়ার করতুম না, কিন্তু অনেক দিন থেকে এই বাবুকেই পেয়ার করতুম, তুই আমাকে মাপ কর। আজকে আমরা পালিয়ে যাবার মতলব করে ছিলুম, তুই আমাদের ছেড়ে দে।"

দুখুয়া মণিয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু দুখুয়াকে শান্ত হইতে দেখিয়া, সাহসে ভর করিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "শোন্ দুখুয়া, মণিয়ার আর আমার কথা কেমন করে কি জানি ম্যানেজারবাবুর কানে উঠেছে। কাল আমাদের কৈফিয়ৎ তলব হবে ও এরজন্ম হয় তো শাস্তিও পেতে হবে। তুই তার চেয়ে মণিয়াকে ছেড়ে দে, আমি আমার দেশে নিয়ে যাই।"

দুখুয়া যেন অন্য কি ভাবিতেছিল, সে মণিয়ার দিকে ফিরিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস্, আর লছমীকেও তোর মিছে মায়া দেখিয়ে ভুলিয়েছিস্ না?"

মণিয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "না রে না, আমি লছমীকে ফাঁকী দেই নাই, তাকে সত্যি আমি আমার পেটের বাচ্চার মত মায়া করেছি, তুই ঘরে গিয়ে দেখবি আমার জিনিস পত্র যা কিছু ছিল সব তার জন্য গুছিয়ে রেখে এসেছি। আর—আর আমি চলে গেলে তাকে বলিস্ যে আমি মরে গেছি, ছেলে মানুষ হয়তো ঠিক মেনে নেবে।"

দুখুয়ার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। সে বলিল 'যা আর তোকে আটকাব না। তোর যখন আমার উপর মায়া নাই তখন জোর ক'রে তোকে আমার ঘরে নিয়েও যাবনা তুই যেখানে খুসী যা। তোকে আজ এখানে খুন করতাম কিন্তু তুই লছমীকে মায়া করেছিস্, খাইয়েছিস্, পেয়ার করেছিস্, আর লছমী তোকে মা বলে পেয়ার করে—যা দূর হ? কাল সকালে যেন তোদের এখানে দেখতে না পাই। দেখলে যেমন ক'রে হোক দুজনের জান নেব।'

দুখুয়া আর পিছন না ফিরিয়া ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করিল, দেখিল লছমী অঘোরে ঘুমাইতেছে। পরদিন খুব ভোরে লছমী জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল'বাপজান,মা কৈ?'

দুখুয়া কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কাল রাতে মারা গেছেরে লছমীয়া—তাকে কাল ঐখানে মাটী দিয়ে এসেছি।"

লছমী ম্লান মুখখানি বাপের কোলে লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল আর দুখুয়ার চোখ দুটাও জলে ভরিয়া আসিয়াছিল বুঝি!

স্মরণ

শ্রীপ্রণব রায়

কোন্ এক বিদায়-লগনে
এই মধু-মিলনের বাসন্তী-বাসর
একদা ফুরায়ে যাবে!
আজিকার মাধবী-পূর্ণিমা
নিঃশেষে মিলায়ে যাবে বিস্মৃতির অমা-অন্ধকারে!
তোমার জগৎ হ'তে অনাদৃত স্মৃতি মোর প'ড়ে যাবে খসি'
নিশান্তের গন্ধ-হারা ছিন্ন-মালা সম!
হৃদয়ের পান্থ শালে তব
কবে কোন্ দূরান্তের মুস'ফের বেঁধেছিলো বাসা,
প্রণয়ের সুরাপাত্র পূর্ণ করি' ক'রেছিলো পান—
আর তাহা পড়িবে না মনে!
আবার আসিবে কতো নবীন অতিথি,
আবার চলিবে সেথা উৎসবের প্রমত্ত বিলাস,

তুমি মোরে ভুলে যাবে প্রিয়া ।
তব হৃদি-উপকূল হ'তে
মোর ম্লান স্মৃতি-লেখা
নিঃশেষে মুছিয়া যাবে বিস্মৃতির লহরী-লীলায় ;
মোরে তবু ভুলিবে না এক প্রিয়জন
—ধরণী সে !
ধরণীর শ্যাম-বুকে নিজেরে বিলায়ে যাব আমি
বর্ণে, গন্ধে, আলোয়, সঙ্গীতে—
মুঞ্জরিত তৃণদলে রেখে যাব মৃত্যুহীন প্রাণ-সমারোহ ।

প্রফুল্ল ফাল্গুন-দিনে
মধুপ মাতিবে যবে নবাগত বসন্তের স্ফুটন-উৎসবে,
তখন বিধুর বায়ু নিকুঞ্জের পথে পথে আমার সন্ধানে
ফেলি' সুরভি-নিশ্বাস,
পল্লব-মর্ম্মর সুরে ক'য়ে যাবে ধীরে
—দূর-গত কোন্ এক পথিকের কথা,
ধরণীর করে যে-ই ভালোবেসে বেঁধেছিলো মিলনের রাখী!
বিরহিণী বন-বধূ প্রস্ফুট প্রসূনদলে
বিরচিবে মোর তরে স্মৃতির অঞ্জলি ।
আবার ঘণাবে যবে আষাঢ়ের পুঞ্জ পুঞ্জ বিরহ-বেদনা—
নব-ঘন-নীল নভে উঠিবে ফুটিয়া
মোর কৃষ্ণ নয়নের অশ্রু-আর্দ্র প্রতিবিম্ব হায়,
নিশীথের নীহারিকা মাঝে
সুদূরের স্বপ্নসম মোর মুখ-ভাতি
অনাদি কালের তরে রহিবে জাগিয়া ।

মোরে তুমি ভুলে যাবে প্রিয়া !
আবার মাতিবে নব-মিলন-বিলাসে
পূর্ণ করি' প্রণয়ের সুরা-পাত্রখানি !
তবু জানি, মোর লাগি বিধবা-বসুধা
অহরহ রাখিবে জ্বালায়ে
অম্লান বিরহ এক অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা সম ।
আমার বিদায় স্মরি' বিনিদ্র যামিনী জাগি'
নয়নের কূলে তা'র উথলিবে অশ্রুর শিশির
—সেই মোর অমর স্মরণ !

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(২৮)

সেদিন সকালে শ্যামা অনেকক্ষণ ধরিয়া গান করিতেছিল। দীপক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শ্যামা তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না। দীপক ধীরে ধীরে একখানি আসন লইয়া অতি নিঃশব্দে বসিল। গান শেষ হইলে শ্যামা দীপকের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার চোখের পাতাগুলি তখন ভিজা।

দীপক বলিল, শ্যামা, তোমার গান আমার জীবনের অদৃশ্য চিরকালটাকে যেন একেবারে কাছে এনে দেয়; আর তোমার কালোচোখের ভিজাপাতার উপর ঐ চোখের জল যেন আমার সকল ব্যথাকে যুগযুগান্তের অসীম এক ব্যথার সমুদ্রে সমর্পণ করে—আমি মুক্তি পাই।

শ্যামা হাসিয়া বলিল, তুমি তা হলে ব্যথাকে ভয়ানক ভয় কর?

দীপকও হাসিয়া বলিল, করিনা আবার? খুব করি।—রোগজীর্ণ আতুর ব্যথাকে যখন সামনে করে' বসে দিনের পর দিন তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতে হয় তখন তার জন্ত একটা ভয় থাকে বই কি! কিন্তু যে ব্যথা আমাকে ক্লান্তির বিলাসে গা ঢেলে দিতে দেয় না, আঘাত দিয়ে দিয়ে কেবলই সজীব, কেবলই সচেতন করে রাখে সে ব্যথাকে আমি ভয় করিনা, ভালবাসি।

শ্যামা আবার হাসিয়া বলিল, তা হলে বল, তোমার কাছে আমার গানের একটা বিশেষ মূল্য আছে?

আছে শ্যামা, সে কথাই আজ স্বীকার করবার অবসর পেয়েছি। এখানে এসে অবধি অলক্ষ্যে তোমার গান শুনেছি আর কৃতার্থ অন্তরে গোপনে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছি।

শ্যামা বলিল, কিন্তু কখনও কি ভেবেছ, যে অমন করে' গায় তারও একটা মন আছে, আর সে মন সবাইকারই মত—তার দুঃখও আছে সুখও আছে?

দীপক উত্তর করিল, না, সে কথা তেমন করে কিছু ভাবি নি, তবে আজ তোমায় গান শুনে মনে হচ্ছিল, বেদনা তোমার আছে এবং তুমি সে বেদনাকে লোকান্তরের এক দেবতার কাছে অকাতরে সমর্পণ করে দিয়েছ, তার বদলে এক কণাও কিছু ফিরে চাও নি।

শ্যামা যেন অকারণে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, না, আমার সম্বন্ধে ঠিক তা নয়। আমি নিজের দুঃখকে কারুর হাতেই সমর্পণ করতে পারি না; দেবতার কাছেও নয়। সে আমার নিতান্ত আপনার, একান্ত নিজস্ব। আমার বিশ্বাস, হয়ত দেবতাও আমার মত করে' আমার বেদনা বুঝ্‌তে পারবেন না।

দীপক যেন একটু আশাভরেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু শ্যামা, দেবতা না বুঝুক মানুষও কি বুঝ্‌তে পারেনা?—আমাকেও তুমি বিশ্বাস করতে পারনা?

শ্যামা একটা মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, বড় দুঃখ হচ্ছে বলতে, তোমাকে হয় ত আমি সব দিতে পারি, কেবল নিজের ব্যথাটুকু বোধ হয় তোমার হাতেও তুলে দিতে পারব না। গরীবের ঘরের বহু লজ্জার মত ও একান্ত আমারই থাক্, অপরের সহানুভূতির এক টুক্‌রো দানের বস্ত্র দিয়ে ওকে আমি ঢাকৃতে চাই না।

আজ শ্যামার মত মেয়ের মুখে এত সব কথা শুনিয়া দীপক সত্যই একটু আশ্চর্য্য হইল। শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় অবনত হইল। শ্যামা তখন মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল,

তাহার দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল, কতদিনের কত প্রচ্ছন্ন কাহিনীগুলি খুলিয়া সে যেন দেখিতে বসিয়া গিয়াছে।

দীপক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এ অবস্থায় তুমি কি করবে ভেবেছ?

শ্যামাও হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়া চাহিয়া বলিল, কোন অবস্থা? স্বামী আমার রাগ করে চলে গেছেন সেই অবস্থা? ও সব আমি বিশ্বাস করি না। আমার স্বামীকে আমি আমার উপর রাগ করে থাকৃতে দিতে পারি না। তার অনেকখানি ভার আমার উপর, তাই আমি তাঁর স্ত্রী। আমাকে ত্যাগ করার কথা তিনি ভাব্‌তে পারেন, আমি সে কথা ভাব্‌তেও পারি না। আমার যদি কোনও সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা' অপরকে কষ্ট দিয়ে কখনই পেতে চাই না। আমার দুঃখ তাই আমারই থাকৃবে, তাঁকে তার জন্য দুঃখ দেব না। তিনি আমার ওপর রাগ করে থাকৃতে পারবেন না, আমি তা' থাকৃতে দেব না।

দীপক একটু কুণ্ঠাভরে বলিল, কিন্তু আমার কথা নিয়ে ডাক্তারের মনে একটা খোঁচা লেগেছে, তাতে হয় ত তার রক্তক্ষয়ও হচ্ছে।

সত্যিই তাঁর রক্তক্ষয় হয়েছে, সে কথা আমিও বুঝি, কিন্তু তার কোনও উপায় নেই, ভুল বুঝ্‌লে একটু রক্তক্ষয় হবেই। আমি গৃহিনী, অপরের গৃহও শান্তিময় হোক্ এও আমার কর্ত্তব্য। আমি তোমার কাছে এসে শুধু সেইটুকুই করেছি। এই সঙ্গে এ কথাও বলে' রাখি তোমাকে যে আমি কাছে কাছে চাই সে কথাও মিথ্যা নয়।

দীপক বলিল, কিন্তু এই কাছে আসার ভিতরেও ত একটা ভয় আছে।

শ্যামা নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, না, সে ভয় তোমাকে দিয়ে নেই। তা' থাকৃলে তোমার কাছে আমি আসতামই না। তুমি নিজে দুঃখী তাই পরের দুঃখেরও সম্মান রাখ্‌তে জান এই আমার বিশ্বাস। তা নইলে তুমি যদি চাও, যে কোনও মেয়েকে তুমি নিঃশেষে চূর্ণ করে' দিতে পার, এও আমি জানি।

দীপক হঠাৎ যেন কেমন হইয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, শ্যামা, ওসব ভুল, তোমার সব ভুল। দুঃখ আমার কোথাও নেই, কিছু নেই। সারা জীবনের আকাঙ্খা আমার প্রায় সবই পূর্ণ হয়েছে।

কথাগুলি শুনিয়া শ্যামা একটু এমন করিয়া হাসিল যেন সে হাসির বদলে বলিতে পারিত, তোমার ও কথা মোটেই তোমার মনের কথা নয়, জানি গো আমি সব জানি।

এ হাসির পর দীপক যেন ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিল। যেন এ রকম করিয়া একজনের কাছে ধরা দিতে পারিলেও আজ তাহার অনেকটা আরাম হয়। দীপক কহিল, দুঃখ যে তোমার আছে সে কথাও যতখানি সত্য, আমারও দুঃখ আছে সে কথাও ততখানি সত্য এবং পৃথিবীর সবারই যথেষ্ট দুঃখ আছে সে কথাও সত্য। কিন্তু তা বলে' ঐ দুঃখের বোঝা আগ্‌লে বসে থাকা দুঃখের চাইতেও বড় দুঃখ। তা তুমি মান ত' শ্যামা?

বাইরে একটা লেবু গাছ ঝাঁপিয়া লেবু ফুল ফুটিয়াছে। তাহার সুগন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল। দেহ মন সে সুগন্ধে তৃপ্ত হয় না, কেমন যেন একটা অতৃপ্তির চঞ্চলতা মনের ভিতর জাগিয়া ওঠে, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে আকাঙ্খা ক্ষেপিয়া ওঠে।

শ্যামা দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট কামড়াইয়া কি যেন একটা কথা গিলিয়া ফেলিল। হঠাৎ বলিয়া বসিল, আমি তা হলে এখন উঠি, সব কাজ পড়ে আছে।

দীপক হাসিয়া কহিল, আমার কাছ থেকে চলে গিয়েই কি নিস্তার পাবে?' পৃথিবীর কোথাও গিয়েও কি এর হাত এড়াতে পারবে?—পুষ্পর কথা মনে পড়ছে, পুষ্পও এ রকম করত। সে সবই চেপে রাখ্‌তে চাইত, লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইত। তার সে লজ্জা আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকত।

শ্যামা তাড়াতাড়ি বলিল, ও সব কিছু জানি না। আমি চল্‌লাম।

শ্যামা সামনের বাগানে নামিয়া গেল। বাড়ীর একটা বিড়াল তাহার দিকে চাহিয়া পরিচয় দিবার জন্য ম্যাও করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'দূর লক্ষ্মীছাড়া' বলিয়া শ্যামা তাহাকে তাড়া করিল। হাতের কাছে যে কয়টা গাছ পড়িল শ্যামা পাতা ছিঁড়িয়া গাছগুলিকে তচ্‌নচ্‌ করিয়া তুলিল। একটা গানের সুর ধরিয়া গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দেহ ও মনের যে অবস্থা ভুলিতে চাহিতেছে, শ্যামার পক্ষে আজ যেন তা তাহার বড় কঠিন হইয়া উঠিল। দীপক দেখিল, সঙ্গে ডাক্তার,

শ্যামার স্বামী। উভয়ে আসিয়া বারান্দায় উঠিল। আগেই বোধ হয় কথা হইতেছিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা শুধু সেই কথা বল ?

শ্যামা মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি না আমাকে চাও না ?

ডাক্তার তখনও রাগের সুরেই বলিল, তখন মনে হয়েছিল চাই না, কিন্তু এখন তোমাকে ছাড়া আমার ঘর শূন্য মনে হয়, আমার নূতন বাড়ী, সাজান গোছান সব বৃথা! বল, তুমি যাবে ?

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, কবে ?

ডাক্তার বলিল, এখুনি, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

শ্যামা একটু কি ভাবিল। কহিল, আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নি।

আর যায় কোথা! ডাক্তার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, তোমার বাবা, মা সকলকেই আমি বলে এসেছি, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আর কারও মতামতের দরকার মনে করি না।

শ্যামা বলিল, চুপ কর, অমন চেঁচিয়ে কথা কয়োনা। ও ঘরে উনি আছেন, শরীর খুব খারাপ।

ডাক্তার আরও ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, ইস্, ওঁকে ভয় করে কথা কইতে হবে নাকি ? উনি কে যে ওঁকে ভয় ডর করে চল্‌ব ? যে লোক এতখানি ইতর তাকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল যে তাকে আমরা চিনেছি।—তুমি যাচ্ছ কিনা বল ?

শ্যামা সংক্ষেপে উত্তর করিল, না।

ডাক্তার চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, কি, যাবে না ? আমি তোমাকে জোর করে' নিয়ে যাব, দেখি কে ঠেকায় ?

শ্যামা শান্তভাবে বলিল, ঠেকাতে ইচ্ছে করলে, একজন আছেন, তিনি একলাই পারবেন। কিন্তু তুমি অমন করে কথা কয়োনা। যা বলেছ, তার জন্য আমি তোমার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।

ডাক্তার তাহার জুতার গোড়ালী মাটিতে ঠুকিল। রাগে তাহার কথা আটকাইয়া গেল। বলিতে লাগিল, ক্ষমা ? ওই লম্পটের কাছে ক্ষমা ? ভাল কাজ করার ছুতো করে' যে কেবল মেয়েদের নিয়ে চড়িয়ে বেড়ায় তার কাছে ক্ষমা! তাকে সামনে পেলে চাবকে দিতাম।

দীপক অসুস্থ। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বলিল, ডাক্তার, আমাকে চাব্‌কে না হয় দিও, কিন্তু আমাকে ছোট করতে গিয়ে ঘরের মেয়েদের ছোট করে তুলছ সে কথাটা ভুলে যেওনা, এইটে তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি।

দীর্ঘকায়, রোগপাণ্ডুর মুখ, কোটরের ভিতর হইতে দুইটা বড় বড় চোখ জ্বলিতেছে। ডাক্তার দীপকের চোখের উপর হইতে আর চোখ নামাইতে পারিল না।

শ্যামা মাঝে পড়িয়া বলিল, ওঁর শরীর ভাল না, ওঁকে আর উত্তেজিত করো না। চল আমরা ও বাড়ীতে যাই।

ডাক্তার শ্যামার হাত ধরিয়া জোরে টান্ দিয়া বলিল, একবার চল, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি।

শ্যামা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যাও, আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।

ডাক্তার বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করিল, শ্যামা আর উত্তরও করিল না। যাইবার সময় ডাক্তার শাসাইয়া গেল, আমি তোমার বাবা মাকে একবার বলে যাব, ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের ঘরের মেয়ে বিয়ে দেওয়া কতখানি নীচতা হয়েছে।

ডাক্তার বাহিরে নামিয়া গিয়াছিল। শ্যামা চেঁচাইয়া বলিল, আপনাকে নিষেধ করছি, আমার বাবা মাকে আপনি একটি কথাও বলতে চেষ্টা করবেন না।

ডাক্তার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

ঝড় থামিয়া হঠাৎ যেন সমস্ত দিক্ শান্ত হইয়া গেল। শ্যামা একটা থাম্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠোঁট চাপিয়া চাপিয়া কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছিল। চোখ দুইটা কোকিলের চোখের মত রক্তবর্ণ। দীপক তাহাকে ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল। নিজে ভিতরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে একা ভুতিই ডিস্পেনসারীর কাজ চালায়। সঙ্গে প্রসাদ ও মাক সাহায্য করে; এইভাবেই কিছুদিন হইতে চলিতেছে। ইলিয়াস্ও একটু আধটু ডাক্তারী শিখিয়া ফেলিয়াছে;

ছোটখাটো রোগীকে সেই ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় করে। নূতন কেবল আজকাল একজন কম্পাউণ্ডার আসিয়াছে।

ইলিয়াস্ আর বীরেশ্বরের এখন খুব বন্ধুত্ব। প্রায় রোজই ইলিয়াস্ সন্ধ্যার সময় বীরেশ্বরকে বই পড়িয়া শোনায়।

ডাক্তার শ্যামার সহিত ঝগড়া করিয়া চলিয়া যাইবার পর সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ইলিয়াস্ প্রতিদিনের মত বীরেশ্বরের কাছে আসিয়াছিল। বীরেশ্বর কিছু চুপ্‌চাপ্। অন্যদিনের মত আনন্দ উদ্বেল নয়। ইলিয়াস্ ইহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বীরেশ্বর নিজেই বলিলেন, আচ্ছা ইলিয়াস্, জুডির বিয়ের কি করবে?

এ পর্য্যন্ত যতদিন ধরিয়া ইলিয়াসের সহিত বীরেশ্বরের পরিচয় হইয়াছে, কখনও তিনি জুডির বিবাহের কথা ইলিয়াসকে কথাচ্ছলেও বলেন নাই।

কিন্তু আজ এ ছোট প্রশ্নটুকুর ভিতর বেশ অনেকখানি আন্তরিকতা ছিল।

ইলিয়াস্ একবার বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল। বীরেশ্বরের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষুর তারা দুইটির আশে পাশে সূক্ষ্ম শিরাগুলি লাল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে কি ভাবিয়া আপন মনেই যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অথচ সেই হাসিটুকু যেন তাঁহার হৃদয়ের গুরু চিন্তার পক্ষে অতি অপ্রচুর। নিমেষে সে হাসি ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি বিন্দুর মতই ঝরিয়া ঠোঁটের কাছে মিলাইয়া যাইতেছে। হাত পা একটু চঞ্চল। বিনা কারণে হাতের আঙুলগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে। বীরেশ্বর উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইলিয়াস্ বলিল, আমি ওর বিবাহের কথা একেবারেই ভাবি না বন্ধু। জুডি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে চায়না, আমি সেই কথাই মেনে নিয়েছি। মেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ের কথা খানিকটা তাদের হাতে থাকাই ভাল। বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া দেখিল শ্যামা আসিয়াছে।

তখন বীরেশ্বর ইলিয়াসের কথায় সায় দিয়া বলিতেছিলেন বোধহয় তাই ভাল।

শ্যামা কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বাবা?

বৃদ্ধের মুখ চোখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্যামাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, শেষকালটা আমার জন্য তুই বড় কষ্ট পেলি, না মা?

শ্যামা আদর করিয়া বলিল, আমি ভাবছি তোমার কষ্টের কথা বাবা। তোমাকে বড় ব্যথা দিয়েছি।

বীরেশ্বরের চোখের পাতা দুইটি উপরের দিকে খুলিয়া গেল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বাবাজী ওরকম করে চলে যাবার পর থেকে তোমার মা কেবলই কাঁদছেন। এতদিন পরে যদি বা জ্ঞান ফিরে এল, প্রথম ধীরেনকে ফিরে পাওয়া ছাড়া আর সবই পর পর যেন কেমন হতে লাগল। ঠিক্ সুখের, আনন্দের কিছু যেন আর হোল না।

শ্যামা আর কথা না বাড়াইয়া বলিল, আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি বাবা, আমি ওঁর কাছে নিজেই যাব।

বীরেশ্বর হঠাৎ মাথা নাড়িয়া উঠিলেন। বলিলেন, না, না, তুমি যেও না, আমার বড় ভয় করে। তোমার সঙ্গে যদি আবার খারাপ ব্যবহার করে।

ইলিয়াস্ এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। হঠাৎ উঠিতে চেষ্টা করিতে বীরেশ্বর বাধা দিয়া বলিলেন, বোস 'অ্যাস।' তুমি যেন দিন দিন একটি আস্ত 'অ্যাস' হয়ে উঠ্‌ছ। তোমার কাছে আমাদের আবার কি লুকোন আছে বল ত?

ইলিয়াস্ নিজেই একটু লজ্জিত হইল। আম্‌তা আম্‌তা করিতেই বীরেশ্বর পূর্ব্ববৎ সরল কৌতুকভরে বলিলেন, দে'ত মা দুটো বড় 'বুলেট্' এনে ওর মুখে পুরে। বাবাজী ত রাগ করে না খেয়েই গেলেন। এক নির্ব্বোধের বদলে আরেক নির্ব্বোধ থাক্।

কোথায় ভাসিয়া গেল ঐ অতবড় দুশ্চিন্তা। স্বভাব সুলভ আনন্দ প্রফুল্লতায় বীরেশ্বরের মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্যামার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, যা' সত্যি ওঠ্, ইলিয়াস্‌কে কটা 'বুলেট্' এনে দে। অনেকগুলো আছে। মালা, প্রসাদ জুডি আরও কারা সব আছে তাদের সব কুলোয় যেন।

শ্যামা চলিয়া গেলে ইলিয়াস্ বলিল, বন্ধু তুমি আশ্চর্য্য লোক।

বীরেশ্বর বলিলেন, কেবল আমি নই, আমরা সকলেই। একজনের অবস্থা দেখে আরেকজনের আশ্চর্য্য হওয়াটা খুব

অসম্ভব ব্যাপার নয়। যদিও আমি অন্ধ কিন্তু আমাদের সকলের দৃষ্টিই প্রায় সমান।

ইলিয়াস্ অতটা বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, শ্যামা যখন যেতে চাইছে ওকে যেতে দেওয়াই ভাল!

বীরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, তোমার পরামর্শের জন্য অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু ও যে ফিরে যাবে, ওর এই উদারতার কথা বুঝ্‌বে কে?

ইলিয়াস্ তবু বলিল, তা যাইহোক, শ্যামার যাওয়াই উচিত। তা হলেও স্বামী আর স্ত্রী।

বীরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, খুব মানি সে কথা। কিন্তু তার জন্য অশান্তি বাড়াবার দরকার মনে হচ্ছে না। স্বামী হোক্, কিন্তু তার ব্যবহার অন্তত সাধারণ ভদ্রলোকের মত হবে এটাও সব ভদ্রকন্যাই চাইবে!

শ্যামা মিষ্টি লইয়া ফিরিয়া আসিল। শ্যামা বলিল, তা হলে কি করব বাবা?

বীরেশ্বর বলিলেন, আমার ত মনে হয় আজ না গিয়ে আর দুই একদিন সবুর করে যাও।

শ্যামা উত্তর করিল, উনি বোধ হয় কাল আর এখানে থাক্‌বেন না।

বীরেশ্বর চিন্তিত হইয়া বলিলেন, কোথায় সে যাবে?

শ্যামা অকাতরে উত্তর করিল, জানি না।

বীরেশ্বর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হুঁ,।' তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই বলিলেন, একবার ওকে খবর পাঠাতে পার শ্যামা—এখুনি যেন আসে।

এতক্ষণে শ্যামার কণ্ঠস্বরে যেন কেমন একটু ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল। বলিল, তাঁকে আমি খুব অসুস্থ দেখে এসেছি। জুডিকে তাঁর কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি।

বীরেশ্বর চিন্তিত ভাবে বলিলেন, তা হলে—? একটু থামিয়া থাকিয়া বলিলেন, সে যা হোক্, তার অসুখটা সারুক তারপর যেও শ্যামা।

শ্যামা একটু নূতন স্বরে কথা কহিল। বলিল, তাঁর অসুখের জন্য ত আর আমি বসে থাকতে পারি না।

প্রায় মিনিটখানিক কাটিয়া গেল। হঠাৎ বীরেশ্বর বলিলেন, তাহলে যাবার বন্দোবস্ত কর। ইলিয়াস্ না হয় সঙ্গে যাক্।

শ্যামা বলিল, সঙ্গে কারুরই যাবার দরকার নাই। একটা দরোয়ান্ পেলেই হবে। যেমন করেই হোক্ আমি সেখানে থাক্‌বই।

ইলিয়াস্ বলিল, আজ না হয় থাক, কাল সকালেই যেও দিদিমণি।

তাই ঠিক হইল। ইলিয়াস্ বাড়ী যাইবে বলিয়া উঠিল, শ্যামা কি ভাবিয়া বলিল, একটু দাঁড়াও সাহেব কাকা, একটা জিনিষ দেব।

ছুটিয়া গিয়া খানিকটা গরম দুধ লইয়া আসিয়া ইলিয়াসের হাতে দিয়া বলিল, এটা জুডিকে দিও। প্রত্যেক-বারে যেন ঐ ওষুধটাও পাঁচ ফোঁটা করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

রাত্রিটা কাটিয়া গেল। ভোর না হইতেই দীপকের ঘুম ভাঙ্গিল। তখনও চোখে কেমন একটা ঘোর লাগিয়া আছে। পা টা নাড়িতেই কি একটা পায়ের কাছে ঠেকিল। দীপক পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া মালা বলিল, আমাকে ডাক্‌ছেন?

দীপকের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ডাকিল, মালা, আমার কাছে এস।

পায়ের উপর কাপড়খানা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া মালা দীপকের মাথার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীপক তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, সারারাত বুঝি তুমি জেগে বসে ছিলে?

মালা অপরাধির মত সুরে বলিল, না, জাগ্‌তে পারিনি, শেষ রাত্রের দিকে ভয়ানক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, মালা, রাত্রি—ভোর হতে আর কতক্ষণ?

মালা ঘড়ির দিকে চাহিল। বলিল, আরও প্রায় দুই ঘণ্টা।—কিছু খাবেন? গরম করে দেব?

দীপক মাথা নাড়িল। বলিল না, খাবার এখন থাক।

আমাকে খুব ভাল করে' একটু মুখ ধুইয়ে দাও। আর একখানা পরিষ্কার কাপড় আর একটা জামা আমায় এনে দাও।

মুখ ধুইতে কাপড় ছাড়িতে ভোর হইয়া গেল।

দীপক স্থির হইয়া কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া বলিল, বড় ইচ্ছা করছে কেউ এখন গান গায়!—মালা, তুমি গাইতে পার? —না থাক্, গেও না।

মালা চুপ করিয়া বিছানার পাশে বসিয়া রহিল। ঘরের ভিতর তখনও ভাল করিয়া আলো আসিতে পারে নাই।

হঠাৎ কোথা হইতে জয়াপিসি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দীপকের মাথায় খানিকটা সিঁদুর লেপিয়া দিলেন।

দীপক বলিল, কে পিসিমা? হাতের ছোঁয়াতেই আমি বুঝেছি তুমি এসেছ।—কিন্তু কি করে তুমি টের পাও বলত? তুমি ত আমার কেউ না পিসিমা।

পিসিমা চোখের কোণ মুছিয়া শীর্ণ শীতল দুইখানি হাত দিয়া দীপকের চোখে মুখে বুলাইয়া দিলেন। বলিলেন, ফেরার পথে শেষের ক' দিন পথ যেন আর ফুরোয় না। তোর জন্ম মনটা বড় কেমন ক'রছিল।—কিন্তু পুষ্প কোথায়? এখনও ওঠে নি?

—ইটি কে বাবা?

দীপক বলিল, আমাদের সেই মালা, প্রসাদের মেয়ে।

পিসিমা খুব খুশী হইয়া বলিলেন, প্রসাদ এসেছে বুঝি? না এসে পারে! বেশ হয়েছে।—চারিদিক চাহিয়া তারপর বলিলেন, ঘর দোরের এমন দশা হয়েছে কেন বলত? পুষ্পটা যেন কেমন? দেখি মেয়েটা কি করছে। বলিয়া ব্রস্তে জয়াপিসি ভিতরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ঘরের পর ঘর দেখিয়া, রান্নাঘর খুঁজিয়া, শেষ কালে খিড়কীর পুকুরের ঘাট পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, পুষ্প!

দীপক ধীরে ধীরে বলিল, পুষ্প অনেক দিন চলে গেছে পিসিমা। তার বিয়ে হয়ে গেছে, খুব ভাল বর হয়েছে।

তারপরই দীপক আবার নিজ হইতেই বলিল, আমিই তাকে বলেছিলাম পিসিমা। তুমি এখন বাড়ী য পুজো আর্চ্চা সেরে আবার এস তখন অনেক গল্প করা যাবে।

পিসিমা মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। হঠাৎ বলিলেন, না, শ্যামার কাছে একবার যাই; কেমন যেন কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

পিসিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া দীপক বলিল, বোধ হয় শ্যামা নেই। তার স্বামী এখন অন্য বাড়ী নিয়েছেন, কাল রাত্রে সে সেখানে গেছে।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, সে তোর অসুখ দেখে গেছে?

দীপক বলিল, হ্যাঁ দেখেছে। থাকতে চেয়েছিল আমি তাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছি।

পিসিমা রাগিয়া গিয়া বলিলেন, তুই মানুষ খুন্ করতে পারিস্ হতভাগা ছেলে।

দীপক মৃদু হাসিয়া বলিল, পারি পিসিমা কিন্তু সুবিধা পেলাম কই! এ যাত্রা আর হোল না।

পিসিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া দীপকের কপালে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন, যাত্রা কি—যাত্রা কি? যাত্রা ত' আমাদের। বালাই যাট।

ধপ্ করিয়া পিসিমা আবার বসিয়া পড়িলেন।

একটু বেলা হইয়াছে। সকাল বেলাকার ডাক্।

চেনা হাতের লেখা একখানা চিঠি দীপকের নামে জুড়ির হাতে পড়িল। সকালে উঠিয়াই জুড়ি স্নান সারিয়া, কাপড় পরিয়া কিছু খাইয়া লইত। একটু বেলা হইতেই রোগী আসিতে সুরু হইত—আর সেই বেলা একটা পর্য্যন্ত।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া জুড়ি দীপকের ঘরে আসিল। পিসিমা বসিয়া আছেন। জুড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিল। পিসিমা শুধু তাহার পিঠে হাতটি একবার বুলাইয়া দিয়া জড়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জুড়ি এখন পুরোদস্তুর ডাক্তার। এরই মধ্যে নিজের চেষ্টায় একটা কি পরীক্ষা দিয়া খেতাবও জুটাইয়াছে। হাতে নল আছেই। ডাক্তারী স্বভাব। দীপকের নাড়ী, জিভ, চোখ সবই পরীক্ষা হইল। কিন্তু কোন ওষুধ দিল না।

দীপক চিঠিগুলি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ একখানা দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার হাত আরও বেশী কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে চিঠিখানা জুড়ির হাতে দিয়া বড় ক্লান্তভাবে সে চোখ বুজিল।

পিসিমা এবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠিরে জুড়ি?

প্রায় চুপি চুপিই জুড়ি বলিল, পুষ্পদির।

পিসিমা যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। ঐ চিঠি! আবার চিঠি কেন?—চিঠি ত নয়, মানুষ খুন করার কাঠি!—দে চুলোয় ফেলে।

দীপক আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, পিসিমা, তোমরা কেবল আমার কথাই ভাব। কিন্তু জুড়ি একটি অসহায়া মেয়ে তার কথা কেউ ভাবছ না। ওর কি হবে বল ত?

জুড়ি নিজেই উত্তর করিল। আমার কথা কারুকে ভাব্‌তে হবে না। আমি নিজে এ পথ বেছে নিয়েছি আর এ পথ দেখিয়ে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দীপক। এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি যে কোথায় ভেসে যেতাম, আজও ভাবলে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে।

দীপক বাধা দিয়া বলিল, সে কথা যাক্ কিন্তু তোমার কি মনে হয় তুমি এ ভাবেই কাটাবে?

জুড়িও জোর করিয়া বলিল, শুধু কাটান নয়, সুখেই কাটাব। দীপক তখন বলিতে লাগিল, তবে আজ আমাকে বিদায় দাও তোমরা। নূতন স্বাস্থ্য, নূতন জীবন, নূতন উদ্দেশ্যের জন্য আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি। আমার সব আশাই পূর্ণ হয়েছে। পোড়াবস্তী আজ নূতন শ্রী লাভ করেছে, এখানকার সব কাজ জুড়ির নিষ্ঠায়, পরিশ্রমে নূতন রূপ নিয়েছে। তার ওপর প্রসাদ এসেছে, মালা এসেছে, তোমার সব এখানেই থাক, আমাকে আবার কিছুদিনের জন্য বিদায় দাও। তোমাদের প্রত্যেকজনের দয়া ও স্নেহের স্পর্শ আমার দরিদ্র জীবনের ঐশ্বর্য্যের মত হয়ে রইল।—আমি আজই যেতে চাই।

জয়াপিসি অবাক হইয়া বলিলেন, এই শরীর নিয়ে তুই কোথায় যাবি আবার দীপক?

দীপক একটু হাসিল। বলিল, পিসিমা, আমার ওপর বিধাতার বিশেষ করুণা যে, যখন কেউ আমার থাকে না কিছু আমার থাকে না তখন মনে আমার অশেষ শক্তি থাকে। তাই আজ আমি তোমার স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে যেতেও ভরসা পাচ্ছি।

জয়াপিসি কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমার চিরকালই ভয় ছিল তোকে আমি ধরে রাখ্‌তে পারব না।

দীপক যেন একটু বিচলিত হইল। বলিল, আমার মাকে হারাবার পর একমাত্র তোমার কাছেই আমার মায়ের সেই উদারতা, সেই স্নেহ পেয়েছিলাম পিসিমা; তোমরা কি ভাব আমি ইচ্ছে করে সে সৌভাগ্য ছেড়ে চলে যাই? আমার অত সুখ সয়না পিসিমা, এই যা।

সকলকে অবাক করিয়া সদ্যস্নাতা শ্যামা আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে ইলিয়াস্।

জয়াপিসিকে প্রণাম করিয়া শ্যামা দীপককেও প্রণাম করিল।

জয়াপিসি উঠিয়া শ্যামাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, তুইও নাকি দীপককে ছেড়ে চলে গিয়েছিলি মা?

শ্যামা আর থাকিতে পারিল না। লজ্জা গেল, অভিমান ভাসিয়া গেল, মান অপমান সব কোথায় মিলাইয়া গেল। শ্যামা আবেগ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, অন্ততঃ তুমি এ কথা বিশ্বাস করোনা পিসি।

তবে কেন তুই চলে গিয়েছিলি?

শ্যামা তখনও কাঁদিতেছিল, বলিল, যাইনি পিসিমা, কাল রাত্রেই যাবার কথা ছিল, তবু মনে হোল কাল অসুখ দেখে গেছি, আজ সকালে একবার দেখে তবে যাব। আর ফিরে আসব না এই কথাই মনে ছিল।

জয়াপিসি বালিকার মত বলিয়া উঠিলেন, তুই দীপককে ধরে রাখ্। আমি জামাইকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসি।

শ্যামা নিষেধ করিল, যেওনা পিসিমা, সে তোমাকে অপমান করবে।

পিসিমা নিষেধ শুনিলেন না। মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া গেলেন, আমি না ফেরা পর্য্যন্ত তোরা কেউ কোথাও যাস্ নি।—চল সাহেব ঠাকুরপো, আমাকে নিয়ে চল।

পিসিমা চলিয়া গেলেন।

দীপক সামান্য কিছু জিনিষ পত্র বাঁধিয়া লইতেছিল। শ্যামা তাহার কাছে গিয়া দীপকের হাত চাপিয়া ধরিল। দীপক ফিরিয়া চাহিল। শ্যামা কাতর কণ্ঠে বলিল, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।

জুডি নিজের মনেই যেন বলিল, এ কথা ত আমি ভাবি নি!

দীপক পুষ্পর চিঠিখানা চাহিয়া লইয়া শ্যামাকে পড়িতে বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, বোধ হয় আমাকে যেতে লিখেছে, তাই না?

শ্যামার পড়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামা নতমুখে বলিল, হাঁ, তাই। লিখেছে—সে বিয়ে করেছে—সত্য, কিন্তু তারপর আর কিছু তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মৃত্যুর চাইতেও ভীষণ বিভীষিকা তার মনে। একবার তোমাকে যেতে লিখেছে, এ সময়ে তুমি ছাড়া তার বন্ধু কেউ নাই।

দীপক কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল, তুমি আমার হ'য়ে তাকে লিখে দিও, বিবাহের পর তার মনে যে সমস্যা এসেছে—তার মিমাংসা তারই হাতে, সময়ের হাতে, আমার হাতে নয়।—আজ তোমাদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বিদায় হচ্ছি। তোমাদের ভালবাসার ঋণ আমার সারা জীবনেও যেন শোধ করতে না পারি এই আমার সব বড় কামনা। মনের বহুদিনের একটা আকাঙ্খা আছে, দেখি, এই শ্রান্ত জীবনকে আবার একবার জাগিয়ে তুলতে পারি কি না।

দীপক ছোট একটা পুঁটুলী লইয়া দরজার বাহির হইতে চলিল। জুডি আসিয়া তাহাকে সমস্ত শক্তি দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্যামা অনেক কষ্টে শুধু একটি কথা বলিতে পারিল, তুমি সত্যাই যাবে?

আর তাহার দাঁড়াইয়া থাকাও সম্ভব হইল না। সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। দুই চক্ষুতে এক বিন্দু অশ্রু নাই। মুখের উপর হইতে সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে; সাদা পাংশুটে সেই সুন্দর মুখখানি!

দীপক জুডিকে ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া বলিল, আমার মত এত বড় নৃশংসতা, এত বড় অকৃতজ্ঞতার কাজ বোধ হয় কেউ করেনি। কিন্তু তবু আমাকে তোমরা যেতে দাও। বিধাতার অভিশাপ আমার মাথায়। আমি নিরুপায়, নিরাশ্রয়, সঙ্গীহীন।

নিঃশব্দে দীপক কখন চলিয়া গেল।

মালা রান্নাঘরের খুঁটি ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি রহিল। কাছে আসিয়া সত্যাই দীপক চলিয়া যাইতেছে—এই ঘটনা দেখিতেও যেন তাহার ছোট বুকটির সাহসে কুলায় নাই।

প্রসাদ ক্ষেতে গিয়াছিল, আসিয়া একথা শুনিল। মুখে একটি আপত্তির কথা বা দুঃখের কথা উচ্চারণ করিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল আর শুধু বলিল, আবার উনি আস্‌বেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর ডাক্তার, ইলিয়াস্ আর জয়াপিসি ফিরিলেন। ভিতরে আসিয়া দেখিলেন সবাই আছে—

শুধু একটি লোক নাই!

দীপক ট্রেণে বসিয়া ভাবিতেছিল, ক্ষুদ্র জীবনের এতখানি পরিপূর্ণতা, এত কোলাহলের মধ্যেও অন্তরের এক অনতিগম্য নিভৃত স্থানে বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে একটি কামনার প্রদীপ আজও জ্বলিতেছে; এত ঝড়, এত বাতাসে আজও তাহা নিভিল না। সমাপ্ত

প্রিয়-সন্দর্শনে

শ্রীকণকলতা ঘোষ

বহুদিন পরে আসিয়াছ প্রিয়
আবার আমার পাশে,
পশ্চাৎ হ'তে বেঁধেছিলে চোখ
বুঝি কিনা সেই আশে।
নিমেষে চিনেছি ও কর-পরশ
শুনেছি চরণধ্বনি,
অন্তর মম মুখর হইয়া
বলিয়াছে চিনি চিনি।
তোমারে না যদি চিনিতাম তবে
মিছা হ'ত ভালবাসা,
ব্যর্থ হইত রমণী হৃদয়,
বৃথা হ'ত তব আসা।
কতদিন প্রিয় দেখি নাই তোমা
গুমরিয়া অভিমানে,
ভেবেছিনু আর ফিরাব না আঁখি
সেই নিঠুরের প্রাণে।
খেলাচ্ছলে যেবা রমণীর হিয়া
অনায়াসে দলি যায়,
সে জন যে অতি কপট নিঠুর
আর ভাবিবনা তায়—
এইকথা মনে ভেবে কতদিন
নয়ন মুদেছি যাই,
অমনি সহাস মুরতি তোমার
হৃদয়ে দেখিতে পাই।

কত রাগ মান জমা ছিল হৃদে
আজি কতদিন হ'তে,
ফিরে দেখিবনা ভেবেছিনু যেই
এসেছ নয়ন পথে—
অমনি অবাধ্য আঁখিতারা মম
তোমার মুখের পরে—
হয়ে গেল স্থির, গত কথা ভুলি
আর কে ফিরায় তারে।
হে প্রিয় তোমার স্পর্শ লভিয়া
সকলি ভুলিয়া গেনু,
রহিল না আর রাগ অভিমান
তোমারে যে কাছে পেনু।
বুঝিনু তোমারে না দেখিয়া ছিল
ব্যথিত আমার প্রাণ,
রাগ সে মিথ্যা, অনুরাগ আজো
রয়েছে অপরিম্লান।
দূরে থাক আর কাছে থাক তুমি
আমার হৃদয় পুরে—
হে প্রিয় নেছ যে শ্রেষ্ঠ আসন
তা হ'তে রবেনা দূরে।
যাপিয়াছি কত দিবস রাত্রি
তোমার আশার আশে,
সকল বেদনা ভুলায়ে আজিকে
এসেছ আমার পাশে।

ভবিতব্য

শ্রীহরিহর চন্দ্র

কিছুদিন ধ'রে কোর্টের কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আমাদের দোতলায় বস্‌বার ঘরের দৈনন্দিন মজলিসে পর্য্যন্ত যোগ দেবার অবসর আমার একেবারেই হ'ত না। এ আড্ডাটা ঠিক যে পর-নিন্দা বা পর-চর্চ্চা কর্‌বার জন্যেই বসত তা নয়। পাড়ার পাঁচজন এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে হাস্য গল্প গুজব থেকে আরম্ভ ক'রে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি কোনও বিষয়ের চর্চ্চাই এখানে বাদ যেত না। এক কথায় পাহাড়ী-য়ারা যেমন পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ লোকলৌকিকতা সবই যেমন 'হাটিয়া'র দিনে হাটের মধ্যেই সেরে নেয়, আমাদেরও তেমনই খবরা-খবর দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি সব কাজই এই খান থেকে সারা হ'ত ; আর এখানে অনুপস্থিত-হওয়া মানে ছুনিয়ার হালচালের সঙ্গে সমান তালে-পা-ফেলে চল্‌তে না-পারা। কাজেই যে একমাস আমি এখানে উপস্থিত থাক্‌তে পারি নি, ঠিক সেই একমাসের খবর কিছুই আমি পাই নি।

তাই সেদিন ভোর বেলায় হঠাৎ একটু দূরে পাড়ার একটা কোণের বাড়ী থেকে যখন সানাইয়ের মধুর আলাপ কাণে এল, তখন বেশ একটু আশ্চর্য্য হ'লাম। এখনও যে একমাস হয় নি, ঐ বাড়ী থেকেই আকাশের অন্ধকার বুক চিরে সদ্যঃ সন্তান-হারা মায়ের বুক-ফাটা কান্না উঠেছিল! মৃত্যুর কালো ছায়া তো আজও তার আসপাশ থেকে নেমে যায় নি,—তবে নহবতের এই প্রভাতী আলাপে আজ আবার এ কিসের সূচনা ?—

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে বৈঠকখানায় এসে বস্‌লাম—যদি কারও কাছ থেকে কোনও খবর পাই এই আশা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। একটু পরেই পাড়ার মহিমবাবু ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন—মামাবাবু, কাল এসে আপনার দেখা পাই নি, কিন্তু আজতো আপনাকে না হ'লে আমাদের চল্‌বেই না। আজ আমার মেয়ের বিয়ে। হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল, তাই আগে জানাতে পারি নি।—বেশী কাকেও বলা হয় নি, তবু যে ক'জন বরযাত্র আসবে, তাদের আদর-অভ্যর্থনা আপনাকেই কর্‌তে হবে। মীরার মৃত্যুর দিন থেকে দাদা সেই যে বিছানা নিয়েছেন, এখনও সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেন নি। আপনি না হ'লে তো আর কেউ আমাদের এই দায় থেকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না।

আমি অবাক্ হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কানে কথাগুলো গেল বটে, কিন্তু সবটা যেন ঠিক বুঝতে পার্‌লাম না। জিজ্ঞেষ কর্‌লাম—কবে ? কার বিয়ে ? কোথায় হ'ল ?

তিনি বল্‌লেন—দুঃখের কথা আর কাকে বলি ? আজ দু'বছর ধরে রেবার জন্যে পাত্র খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়্‌রান হ'য়ে গেছি—ঘর মেলে তো বর মেলে না, বর জোটে তো ঘর পছন্দ হয় না। এ দিকে মেয়েও তো সতেরো পেরিয়ে আঠারয় পড়ল, আর তো অপেক্ষা করা যায় না। কাজেই বাড়ীর সবাই দাদার জামাই, অনুকূলের সঙ্গে রেবার বিয়ের ঠিক কর্‌লেন,—তার নতুন-পাতানো সংসার ভেসে না যায়, আর আমাদের ঘর-বর দুই-ই বজায় থাকে—এই আশায়। দেখেছেন তো অনুকূল ছেলেটি বেশ,—তবে হতভাগী মীরার ভাগ্যে একবছরও সইল না, এই যা

এতক্ষণে যেন একটু একটু বুঝ্‌তে পার্‌লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মানুষ কি এত অন্ধ হ'তে পারে ? শুধু ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটাই কি সন্তানের প্রতি বাপ-মায়ের কর্ত্তব্যের চরম ? তাদের স্নেহ-ভালবাসা, তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছার কি কোনও মূল্য নেই ? তিক্ততায় মন ভ'রে উঠ্‌ল, জিজ্ঞেষ কর্‌লাম—রেবার এতে মত আছে কিনা

কিছু জানেন? না, সেটুকুরও কোনও দরকার আছে বলে মনে করেন না?

তিনি বল্‌লেন—মত আছে বই কি। আমি স্ত্রীর কাছে শুনেছি মীরার মতো অত কান্নাকাটি বা আপত্তি সে কিছুই করে নি। তবে সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর থেকেই একটু উন্মনা হ'য়ে আছে।

আমি বল্‌লাম—মুখে অমত জানায়নি বটে, কিন্তু তাতেই যে তার মত আছে—এ আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন? আর আপত্তি করবেই বা কার কাছে? সে কি নিজের চোখে দেখেনি যে বাপ-মায়ের কত আদরের মেয়ে হ'য়েও তার দিদি চোখের জলে দিনের পর দিন মাটী ভিজিয়েছে, তবু আপনাদের মন একতিল গলাতে পারে নি? একটা প্রাণহীন যুক্তিশূন্য প্রথার ওপর আপনাদের অপরিসীম অনুরাগ কি ক'রে মীরার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল—সে এরই মধ্যে কেমন ক'রে তা ভুলবে?

তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—তার মানে?

—কেন, আপনি কি কিছুই জানেন না, মীরা কেন তার বিয়েতে এত আপত্তি করেছিল? অমন লক্ষ্মী মেয়ে, যার স্বভাবের সৌন্দর্য্যে এক রত্তি খুঁত, অতিবড় নিন্দুকেও খুঁজে পেত না,—সে যে প্রত্যহ আপনাদের পা ধুয়ে দিত তার চোখের জল দিয়ে,—সেটা যে তার শুধু ছেলেমানুষী খেয়াল নাও হ'তে পারে, এটা কি কোনও দিন আপনারা ভেবে দেখেন নি?

—না। আমরা বুঝেছিলাম আজন্ম পরিচিত স্নেহ-ক্রোড় ছেড়ে অজানা যায়গায় অচেনা লোকের মাঝে যেতে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক আশঙ্কা হয়—এ বুঝি তাই। কিন্তু, আপনি যদি অন্য কারণ জান্‌তেন, তবে প্রকাশ করেন নি কেন?

—না। তখন আমি এর কিছুই জান্‌তাম না। সে আজ প্রায় ছ'মাস আগেকার কথা,—মীরা যখন অসুখ নিয়ে আপনাদের এখানে ফিরে এল, তার তখনকার চেহারা দেখে আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। খুব শক্ত ব্যায়রাম না হ'লে এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের এত ভয়ানক পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না। কিন্তু যখন জান্‌লাম সামান্য জ্বর ছাড়া সে রকম কিছু হয়নি, তখনই আমার সন্দেহ হয়—অসুখ বুঝি শুধু তার শরীরের নয়,—তার মনেরও।

কোনও কিছুই যে আধা-আধি আপোষ ক'রে সুফল প্রসব করতে পারে না, মীরা তার ছোট্ট জীবনে সেইটুকুই দেখিয়ে দিয়ে গেছে। নব নব শিক্ষার মধ্য দিয়ে সন্তানের ধারণ নতুন ভাবে গ'ড়ে তুলে, তাদের সে পথে চল্‌তে না দেওয়ার মধ্যে কৃতীত্ব যথেষ্ট থাক্‌লেও যে সে পথে কোনও ইষ্ট থাক্‌তে পারে না—এতো সহজ সত্য। শরীর ও মনের অত্যন্ত শিশু এবং জড় অবস্থায় মৃত সমাজের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তার এক শ' হাত দূরে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার যে সনাতন পদ্ধতি ছিল এবং এখনও যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত, তা কি এর চেয়ে ঢের ভাল নয়? তাতে আর যাই থাক্, ব্যর্থ নিরাশার মর্ম্মান্তিক জ্বালা নাই।—

কেন যে একটা ফুল ফোটবার আগেই ঝ'রে প'ড়ে গেল,—আশ্চর্য্য, সে বিষয়ে আপনারা কোনও খোঁজই করেন নি! জানেনই তো, আপনাদের "মামা-বলার সুবাদে সে আমায় 'দাদামশায়' বলে ডাকৃত। আর সত্যিই, সে আমায় শ্রদ্ধা করৃত দাদামশায়েরই মতো, ভালবাসৃত সহোদর ভায়ের মতো, আর বিশ্বাস করৃত যথার্থ বন্ধুর মতো। একদিন তাকে আমার সন্দেহের কথা খুলে বলায় সে আর কোনও কথাই গোপন রাখ্‌তে পারল না। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার ব্যর্থ জীবনের অকালে সমাপ্ত ছোট্ট ইতিহাসের সব ক'খানা পাতাই আমার সাম্‌নে মেলে দিল। তাতে কি লেখা ছিল জানেন?—

প্রায় দু'বছর আগেকার কথা সে বৎসর শ্রীপঞ্চমী, মাঘের শেষাশেষি হ'লেও তখনই বসন্তের আমেজ লতাপাতা থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের বুকেও এসে লেগেছিল। শীতের দিনের নিদ্রালসা প্রকৃতি যেন তখনই ঘুম থেকে উঠে তার এলিয়ে-পড়া নব কিশলয়ের আঁচলখানা বুকের ওপর দিতে দিতে মানুষকে জাগ্‌বার ইঙ্গিত করৃছিল।

আপনি সেবার দেশে ছিলেন। মনে আছে কিনা জানি না—আপনাদের বাড়ী সেবার সরস্বতী পূজার প্রয়োজন হ'য়েছিল। ইন্দুবাবু আপনাদের বেশ গান লিখ্‌তে এবং গাইতে পারৃতেন। তাঁর হঠাৎ খেয়াল হ'ল—বৃদ্ধেরা যা করে করুক, তরুণের দল এবার পুষ্পাঞ্জলির

বদলে গানের অঞ্জলি দিয়ে বীণাপাণির পূজা করবে।

জানেন তো বয়েস অনেক হ'লেও সরল স্বভাব আর অমায়িক ব্যবহারে ইন্দুবাবু সবারই বড় প্রিয় ছিলেন। বাড়ীর সব ছেলেমেয়েই সাগ্রহে তাঁর প্রস্তাবে আন্তরিক অনুমোদন জানিয়ে সেটাকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করবার জন্যে সবান্ধবে মেতে উঠ্‌ল। ইন্দুবাবু ছেলে মেয়েদের দুটো ভাগ ক'রে দিয়ে নিজেই সমস্ত তত্ত্বাবধান করতেন। পাড়া থেকেই একজন হারমোনিয়ম, দু'জন বাঁশী, তিনজন এস্‌রাজ এবং একজন বেহালা বাদক জুটে গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনাদের বৈঠকখানা ঘরে সঙ্গত বস্‌ত,—একখানা বেহালা নিয়ে ইন্দুবাবু তাদের পরিচালনা করতেন। মেয়েরা এক এক চরণ গাইবে, আর ছেলেরা ধুয়া ধরবে, এবং কোথাও কোথাও বা দুই দলেই একই সঙ্গে গাইবে,—এম্‌নি ব্যবস্থা হ'ল। সকলের সমবেত চেষ্টায় সেবার বাগ্‌দেবীর পূজা গীতবাদ্যে বেশ পরিপাটী সম্পন্ন হ'য়েছিল।

মহিমবাবু এতক্ষণ বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনছিলেন। আমাকে থাম্‌তে দেখে বল্‌লেন—বয়েসের দিক্ দিয়ে ইন্দু-মামা জীবনের পথে অনেকটা এগিয়ে গেলেও শেষ দিন পর্য্যন্ত শরীর বা মনের কোথায় তাঁর একটুও জড়তা স্পর্শ করে নি। চির তরুণ তাঁর মন নিত্য নতুন সৃষ্টির জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকত। তারপর?

তার পরের কথা তার ভাষাতেই বলি।—

"কিন্তু একটি বাঁশীর সুর যে দেবতার উদ্বোধন গেয়ে আমার সুপ্ত হৃদয়ের গোপন মন্দিরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করল, বিসর্জ্জনের পরও সেই প্রতিমার করুণ স্মৃতিটুকু এখনও তেম্‌নি উজ্জ্বল, তেম্‌নি মধুরই রয়েছে!

আমাদের এই সঙ্গতের উদ্যোগেই তাকে প্রথম দেখি। সে ভারী মিষ্টি ক'রে বাঁশী বাজাতে পারত। ইন্দুদাদামশায় তাকে বড় ভাল বাসতেন।

রোজই গানের সময় তাকে দেখ্‌তাম। চোখে ধাঁধা লাগাবার মত রূপের চটক্ তার ছিল না; কিন্তু তার চেহারা এবং স্বভাবের মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। তাকে দেখে যৌবনের মূর্ত্ত বিকাশ বলে মনে হ'ত। সে-যেন যৌবন-সুলভ চপলতা আর আত্মবিশ্বাস, উদ্দাম কৃপণতা আর উদাসীনতার অদ্ভুত সমাবেশ। কোনও কাজেই যেন তার আনন্দ ও আগ্রহের অভাব নেই, অথচ কোনও কিছুর জন্যে তার বিশেষ একটু দরদ আছে বলে কেউ কোনও দিন সন্দেহ করবার অবকাশ পায় নি।

মুখের কথা তার সঙ্গে আমার একটি দিনের জন্যেও হয় নি; কেবল মাঝে মাঝে তার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি যখন মিলে যেত, তখন মনে হ'ত,—বুকের রক্ত দিয়ে আমার সীমন্তের লাল টীকা এঁকে দিতেও যেন সে প্রস্তুত!

তবে প্রতিদিন নিশীথ রাত্রে আর প্রত্যুষে সে যখন তার হৃদয়ের ব্যথাটুকু ঢেলে দিয়ে বাঁশীর শূন্য বুকে তার অন্তরের আকুল ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুল্‌ত, তখন তার প্রতি মমতায় আমার বুকটা ভ'রে উঠ্‌ত,—মনে হ'ত আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি ওর এক ফোঁটা চোখের জল মোছাতে পারতাম!

তার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতির এই ছোট্ট ঝরণাটি যে কবে দুঃখের বর্ষার অবিশ্রান্ত গোপন বর্ষণে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে, ধীরে ধীরে কোন্ অজানার দিকে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা জানতে পারি নি!

তারপর মাস কয়েকের জন্যে আমাকে একবার মামার বাড়ী যেতে হয়। ফিরে এসে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম! মনে হ'ল পৃথিবীর একটা দিক যেন উৎকট ভূমিকম্পে সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেছে!

আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড একতালা খোলার চালওয়ালা বস্তি, তারপর বিস্তৃত সদর রাস্তা, তার অপর ফুটপাথে তাদের বাড়ী। ব্যবধান যথেষ্ট থাক্‌লেও দুটী বাড়ীর মধ্যে দেখ্‌বার বাধা কিছু ছিল না।

মামার বাড়ী থেকে যখন ফিরলাম, তখন অনেক রাত। কেন জানি না, ঘরে ঢুকেই নিজের অজ্ঞাতে সব প্রথম আমি দক্ষিণ দিকের সেই জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যেখান থেকে প্রতিদিন, প্রতিটি রাতে আমার নীরব পূজারীর ব্যথার অর্ঘ্য, যা সে বাঁশীর সুরে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিত, তাই গ্রহণ করতাম। কিন্তু সেদিন আর কেউ সুরের নৈবেদ্য সাজিয়ে আকুল প্রতীক্ষায় আমার আশাপথ চেয়ে বসে ছিল না!

মনটা দমে গেল। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম

হয় তো সে আমার ফিরে আসার খবর পায় নি। তারপর তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্নে দেখলাম যেন তার এতদিনের নীরব আত্ম-নিবেদন আজ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে! আমার একটা হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে প্রাণের আবেগে সে বল্‌ছে—কোনও যোগ্যতার অধিকারে আপনাকে নিজস্ব করে চাইবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে যদি আপনার স্বভাব কমনীয়তায় আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে ওঠে, তবেই আমি কৃতার্থ আর আমার জীবন ধন্য মনে করি।—

কতদিনের পথ-চাওয়া এই অপ্রত্যাশিত সুখসৌভাগ্যের হঠাৎ আবির্ভাবে আমি যখন বিহ্বল ভাবে আমার আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজ্‌ছি, তখন হঠাৎ একটি বাঁশীর সুরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আনন্দে আমার বুক ভ'রে উঠল—তবে তো এক অন্তরের কথা আর এক অন্তরের জানতে মুখের ভাষা বা চোখের ইঙ্গিতের অপেক্ষা রাখে না, তা না হ'লে সে কেমন ক'রে জানতে পারলে যে আমি কাল এসেছি।

ছুটে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম—ছাদে বসে সেই বাঁশী বাজাচ্ছে বটে, আমার সেই পরিচিত সুর! কিন্তু এর যেন সবই নতুন! ভাষা নতুন, কথা নতুন, লয় নতুন।

সুরের পর সুরের ঢেউ উঠ্‌ছিল কিন্তু এবার আমার বুকের কূলে খেলা কর্‌তে একটি সুরও আর পথ ভুলে আসছিল না। ঘুরে একটি ছাদের ওপর যেখানে একটি সুন্দরী কিশোরী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার পায়ের কাছে সুরগুলি আছড়ে লুটিয়ে পড়্‌ছিল।

লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল! জানলা থেকে সরে এসে বালিসে মুখ লুকিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। এই বিনা মেঘের বজ্রাঘাতে আমার শরীর মন সব যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেল। সে ধাক্কা আমি এখনও সাম্‌লাতে পারি নি, আর কখনও যে পার্‌ব—তাও শরীরের এ অবস্থা থেকে মনে হয় না।—

তারপর ডাক্তারের যথাসাধ্য চেষ্টা আর আপনাদের প্রাণপণ যত্ন কেমন করে পণ্ড হয়েছিল, তাতো আর আপনার অজ্ঞাত নেই। ব্যর্থতার প্রথম ধাক্কা সাম্‌লে ওঠ্‌বার আগেই যে আপনারা তার স্কন্ধে বিবাহিত জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যের দায়ীত্ব চাপিয়ে দিলেন, নিজের প্রাণ দিয়ে সে সেই দায় থেকে মুক্ত হ'ল।

* * * *

ব্যথিত হিয়ার করুণ কাহিনী এতক্ষণ আমাকে অভিভূত করে রেখেছিল। হঠাৎ মহিমবাবুর দিকে চোখ পড়ায় দেখ্‌লাম তিনি অতিকষ্টে ভদ্রতা বাঁচিয়ে আমার কথা শুনছেন। আমাকে একটু থাম্‌তে দেখে তিনি বলে উঠ্‌লেন সবই ভবিতব্য মামা, সবই ভবিতব্য। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এত আর মানুষের হাতগড়া নয়।—অনেক কাজ বাকি রয়েছে, আজ তা হলে উঠি। দয়া করে সন্ধ্যে নাগাদ একবার আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়ে আমার এ দায় থেকে উদ্ধার কর্‌তে যেন ভুল্‌বেন না?

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ২৩শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। অমায়িক মণিলাল তাঁহার ভদ্রব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ আমাদের মাত্র কয়েক বৎসরের কিন্তু প্রথম পরিচয় দিবস হইতে শেষ সাক্ষাতের দিন অবধি মার্জ্জিতরুচি অমায়িক বন্ধুরই পরিচয় পাইয়াছি। মণিলাল প্রসিদ্ধ "কান্তিক প্রেসের" মালিক ছিলেন। ঐ কান্তিক প্রেসের বাড়ীর উপরের তালায় একটি বৈঠক বসিত। সাহিত্যিক ও অপরাপর শিল্পী সেখানে সমবেত হইতেন। মণিলালের সান্নিধ্য ও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার উহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

ছোটগল্প লিখিয়া মণিলালবাবু যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক লেখায় অপূর্ব্ব সতর্কতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের পর কিছুকাল তিনি লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেমন গল্প লেখক ছিলেন তেমনি সুরসিক সমালোচকও ছিলেন। নৃত্য-গীতেও তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। সুন্দরকেই তিনি যে ভাল বাসিতেন তাহা তাঁহার বেশভূষায় কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝা যাইত। অনেক সময় তিনি নিজের সময় নষ্ট করিয়া বহু পরিশ্রমে অনেককে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়াছেন। আজ নাট্যালয়ের নৃত্যগুলিতে যে অনাবিল ভঙ্গী ও প্রকাশ নিপুনতা দেখা যায় তাহার অনেক খানি মনিলালের দান।

মণিলাল কোথাও কোনও প্রকারে নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন না। নিজেকে লুকাইয়া লইয়া ফেরাই যেন তাঁহার স্বভাব ছিল।

তাঁহার জীবিতকালেই সাহিত্যের পথে যখন ছোটবড় প্রায় সকলেই রথী সাজিয়া বিপুল ধূলা ও ধ্বনি তুলিয়াছে তখনও মণিলাল 'ভারতীর' দলের লোক বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহার স্বাভাবিক উদার ও নির্ভীক চিত্তের সতর্ক ও সংযত মন্তব্য দ্বারা নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

বহুকাল তিনি ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনা কালেই বহু অল্পবয়স্ক লেখক তাঁহার সহানুভূতিতে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল।

শেষকালে মাত্র কয়েকদিনের নিউমোনিয়ারোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয় শোভন লাল ও মোহন লাল অতি অল্প বয়স হইতেই ছোট গল্প লিখিয়া পাঠক সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন।

মণিলাল সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা ছিলেন।

মণিলালের আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙালি একজন সুরসিক সাহিত্য স্রষ্টা হারাইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ একজন অকৃত্রিম অবিচলিত বন্ধু বিয়োগে আজ মর্ম্মাহত।

বর্ষশেষের নিবেদন

ছয় বৎসর শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে কল্লোলের সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইবে। বার্ষিক মূল্য পূর্ব্বানুরূপ ডাক মাশুল সমেত সাড়ে তিনটাকাই থাকিবে।

গতবর্ষে কল্লোল সম্বন্ধে যে সকল ত্রুটী হইয়াছে তাহা আমরা জানি। জানিয়াও বহু চেষ্টায় তাহার কোনও প্রতিকার করিতে পারি নাই! এ বৎসর অন্ততঃ কাগজ যাহাতে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর নিশ্চয় বাহির হয় ছাপাখানার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমরা জানি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাগজ হাতে না পাইলে গ্রাহকদের কতদূর অসুবিধা হয়;—এরূপ জানিয়াও কোনও ব্যবস্থা করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত।

এ পর্য্যন্ত বৎসরের পর বৎসর পাঠক ও বন্ধুবর্গের যে সাহায্য আন্তরিকতা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি তাহার জন্য আমি নিজে বিশেষভাবে সকলের নিকট আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি সকলেই আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতা ও ত্রুটীকে উপেক্ষা করিয়া কল্লোলের সহিত তাঁহাদের প্রীতির সম্বন্ধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন।

ছয় বৎসর পরে কল্লোল সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এখন ইহার আরও অনেক নূতন গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে ইহার উৎপত্তি ও অপর অপর অনেক ব্যবস্থার কথা হয় ত জানেন না। এইজন্য প্রকাশভাবে তাঁহাদের জন্য এবং ভবিষ্যতে আরও যাঁহারা কল্লোলের আত্মীয়-স্থানীয় হইবেন তাঁহাদের জন্য এই দুই একটি কথা জানান প্রয়োজন বোধ করিতেছি! ইহাতে কোথাও যদি আমার নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় আশা করি পাঠকবর্গ ও বন্ধুগণ আমার সে ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

বহু লেখক ও পাঠকবর্গের পূর্ণ সহানুভূতি, আন্তরিক চেষ্টা, ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার প্রথম হইতে এখনও পর্য্যন্ত কল্লোলের জীবনধারায় গতি ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। কেবলমাত্র আমার নিজের চেষ্টায় কল্লোল এভাবে চলিত না। সুতরাং ইহা আমার নিজের সম্পত্তি বলিয়া কখনও মনে করি নাই। প্রথম উদ্যোক্তা বলিয়া আমার যে ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা আমি 'কল্লোল'কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই করিয়াছি। কল্লোলের উন্নতিতে নিজে স্বত্বাধিকারী হিসাবে লাভবান হইব এরূপ মনে করিয়া কখন কিছু করি নাই। তাই আজ বলিতে চাহি কল্লোল যদি সম্পদে ও প্রতিষ্ঠায় আরও সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলে ইহার সমস্ত আয় কল্লোলের লেখকবর্গ এবং কল্লোলেরই উপকারার্থে ব্যবহৃত হইবে। যতদিন সকলে মিলিয়া কল্লোলের সেবা করিবেন, ততদিন কল্লোল সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে।

কল্লোলে যাঁহারা যে সময়ে যেরূপভাবে সেবা করিয়াছেন কল্লোল তাঁহাদের সকলের সেরূপ অধিকার। অনেক নূতন লোক আসিয়াছেন, পুনরায় ভবিষ্যতে হয়ত আরও আসিবেন তাঁহারা সকলেই কল্লোলের আত্মীয়, কল্লোলের শুভ ও অশুভের অংশীদার।

আগামী বৎসরের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কল্লোল আরও সুপরিচালিত হইবে এবং বিষয় নির্ব্বাচনেও ইহার মূল আদর্শ রক্ষা করিবার চেষ্টা হইবে।

পরিশেষে গ্রাহক অনুগ্রাহক ও লেখকবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা কল্লোলের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সাহায্য করিবেন। এজন্য সকল অপরিচিতকে ও পরিচিতকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

আশা করি পূর্ব্ববৎসরের সকল গ্রাহকই নূতন বৎসরেও গ্রাহক থাকিবেন। যদি কেহ নিতান্তই গ্রাহক থাকিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে চৈত্র মাসের কাগজ পাইলেই পত্রদ্বারা পুরাতন গ্রাহক নম্বর দিয়া জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

আমরা জানি, আমাদের গ্রাহকবর্গ সকলেই ইচ্ছা করিলে আগামী বৎসরের বার্ষিক মূল্য চৈত্র মাসের কাগজ

পাইলেই মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারেন। সেজন্য আমাদের সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা কৃপা করিয়া কল্লোলের কথা একটু মনে রাখিবেন এবং যাহাতে ইহার নূতন বৎসরের মূল্য ১লা বৈশাখের ভিতর আমাদের নিকট পৌঁছায় এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন।

সকলেই জানেন ভিঃ পিঃ তে প্রথম সংখ্যা পাঠাইলেও খরচ বেশী পড়ে এবং ভিঃ পিঃ তে টাকা আমাদের নিকট বিলম্বে পৌঁছানর দরুণ পরবর্ত্তী-সংখ্যাগুলি পাইতে গ্রাহকগণের দেরী হয়। গ্রাহকবর্গ একটু অবহিত হইলেই আমাদের উভয় পক্ষেরই অনেক অসুবিধা দূর হয়। গ্রাহকদের একটু মনোযোগ অভাবে প্রায় সকল পত্রিকারই এরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে। পত্রিকা সংশ্রবে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা এরূপ অসুবিধা প্রচলিত ধারা বলিয়াই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের আশা হয় গ্রাহকদের বারম্বার এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের পত্রিকাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাহায্য দ্বারা নিশ্চই উপকৃত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আজ এই বর্ষশেষে কল্লোলের অন্যতম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র নাগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবিনত স্মৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করি এবং তাঁহারই স্মৃতিকল্পে 'কল্লোল' উৎসর্গ করিতেছি।

বিনীত

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সম্পাদক

কল্লোল

বর্ষ-সূচী

১৩৩৫ সাল।

চিত্র-সূচী

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10/2 Patuatola Lane, and printed by same at the Calcutta Printing Works, 29, Ramkanta Mistri Lane, Calcutta.